ভলিউম ১৪

কুয়াশা

৪০, ৪১, ৪২

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সাতাশ টাকা

ISBN 984 - 16 - 1104 - X

প্রকাশক ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকর ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম ঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 14
KUASHA SERIES: 40, 41, 42
By: Qazi Anwar Husain

সূচি

কুয়াশা ৪০	৫–৫০
কুয়াশা ৪১	৫১–১০৬
কুয়াশা ৪২	১০৭–১৫২

কুয়াশা ৪০

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৭৩

এক

ঘুরে বসেছে রোম। পায়ের বাঁধন খোলার কথা ভুলে গেছে কিশোর ছেলেটা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। বিপুল বেগে ঘোড়সওয়ার হাহারা ছুটে আসছে।

রাসেল নেই। চোরাবালি তাকে গ্রাস করেছে।

রোম তাকাল ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে। আনন্দে চকচক করে উঠল আবার তার চোখ জোড়া। বনভূমির দিক থেকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। ঘোড়সওয়ারদের চেহারা পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে না। বালির উপর দিয়ে ছুটে আসছে ঘোড়াগুলো। বালি উড়ছে ঘোড়ার পায়ের সাথে সাথে। বালির মেঘ উঠছে যেন নিচ থেকে উপরের দিকে। দেখতে দেখতে ঘোড়সওয়াররা কাছে এসে পড়ল। লাগাম টেনে ধরে ঘোড়াগুলোকে দাঁড় করাল তারা। এবার চিনতে পারল রোম।

ড. কুয়াশা।

রোম আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

কুয়াশার সাথে চারজন জংলী ঘোড়সওয়ারও এসেছে।

ঘোড়া থামার আগেই লাফ দিয়ে নিচে নেমে রোমের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল কুয়াশা। ছোট ছুরিটা তার হাতেই ছিল। সেটা দিয়ে পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে রোমকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল ও।

জংলীরা ঘোড়া থেকে নামল। কুয়াশা রোমকে তুলে নিয়ে দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল একটি ঘোড়ার পিঠে। বলল, 'বনভূমির দিকে চলে যাও। খবরদার, পিছন ফিরে একবারও তাকাবে না।'

রোম ঘোড়ার পাঁজরে খোঁচা মারল পা দিয়ে। দ্রুত ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। হাহাদের হাত থেকে বাঁচল এ যাত্রা রোম। কিন্তু মৃত্যুর দিকেই ছুটল সে।

ঘোড়ার জিনের সাথে ঝুলন্ত ব্যাগ থেকে দ্রুত কয়েকটা জিনিস বের করল কুয়াশা। লম্বা এক খণ্ড দড়ি বের করে নিজের বাঁ হাতের সাথে বাঁধল। দড়ির অপর প্রান্তটা দিল একজন জংলীর হাতে।

চোরাবালির দিকে তাকাল কুয়াশা। তার মত অসম সাহসী বীরের বুকটাও

কেঁপে উঠল। দূর থেকে দেখেছে সে রাসেলের সর্বনাশ। চোরাবালি ছেলেটাকে হজম করে ফেলেছে। হারিয়ে গেছে রাসেল। চিরতরে। ওকে কি আর ফিরিয়ে আনা যাবে না এ পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে।

এরকম অবস্থায় রাসেলকে উদ্ধার করা অসম্ভব জেনেও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না কুয়াশা। তার চোখের সামনে এমন অসহায় ভাবে মারা যাবে ছেলেটা? কোন সাহায্যই সে করতে পারবে না?

যা হবার হয়ে গেছে। যে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে নিয়ে আসার উপায় নেই। কিন্তু শেষ চেষ্টা বলে একটা কথা আছে। কুয়াশার কথা হলো আশা কখনও হারাতে নেই। শেষ চেষ্টা সে করবে।

পকেট থেকে ছোট ছোট দুটো স্বআবিষ্কৃত বোমা বের করল কুয়াশা।

জংলীরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। হাহারা কাছাকাছি এসে পড়েছে। জংলীরা হঠাৎ কুয়াশার ধরিয়ে দেয়া দড়ির প্রান্তটা ছেড়ে লাফ দিয়ে যে যার ঘোড়ায় চেপে বসল। তিনটে ঘোড়ায় চারজন উঠে বসেই ঘোড়াগুলোর পেটে লাথি মারতে শুরু করল।

বজ্রকণ্ঠে গর্জন করে উঠল কুয়াশা, 'দাঁড়াও! আমি থাকতে তোমাদের কোন ভয় নেই।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। হাহারা আসছে। ওরা জংলীদের পরম শত্রু। চিরকাল হাহারা জংলীদেরকে ধরে ধরে আগুনে পুড়িয়ে খেয়েছে। সেই হাহারা শ'য়ে শ'য়ে ছুটে আসছে। ভয় পাবে না তারা?

বোমা দুটো চোরাবালির দু'দিকে ছুঁড়ে মারল কুয়াশা। চোখের পলকে ফট্ ফট্ শব্দে বোমা দুটো ফাটল। কান ফাটানো কোন শব্দ নয়। যেন পটকা ফাটল। পরমুহূর্তে দেখা গেল ক্ষুদ্র বোমা দুটো বিস্ফোরিত হওয়ায় কালো ধোঁয়ায় চারদিক ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে ধোঁয়া গাঢ় হচ্ছে এবং আশেপাশের বিরাট একটা এলাকা নিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে।

ব্যাগ থেকে চশমাসহ দুটো প্লাস্টিকের মুখোশ বের করল কুয়াশা। অনেক কৌশলে ঘোড়ার মুখে পরিয়ে দিল একটা মুখোশ।

গাঢ় কালো ধোঁয়া কুয়াশা, চোরাবালি এবং কুয়াশার ঘোড়াটাকে ঢেকে ফেলেছে।

মুখোশ পরে নিয়ে দড়ির শেষ প্রান্তটা ঘোড়ার গলার সাথে বাঁধল কুয়াশা। ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে একমুহূর্ত আদর করল ও। বলল, 'ভয় পাসনে, বাবা। আমি থাকতে তোর কোন ভয় নেই। আমাকে না দেখতে পেলেও এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি। দড়িটা নাড়ব আমি, তখন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি। খবরদার, চোরাবালির দিকে পা বাড়াসনে।

অবলা জানোয়ার কি বুঝল কে জানে। নিষ্পলক চোখ মেলে সে কেবল

তাকিয়ে রইল কুয়াশার দিকে।

কুয়াশা চোরাবালির দিকে তাকাল। কালো ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। কিন্তু বিশেষ একধরনের চশমা পরে থাকায় কুয়াশা সবই দেখতে পাচ্ছে।

রাসেল যেখানে ডুবে গেছে সেখানকার বালি বেশ একটু জায়গা নিয়ে নেমে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করল কুয়াশা। একটা প্রশ্ন জাগল মনে। ফিরে আসতে পারবে তো সে বালির নিচ থেকে?

লাফ দিয়ে পড়ল কুয়াশা চোরাবালিতে। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে বালির নিচে।

ঘোড়া ছুটিয়ে তীরবেগে প্রায় মাইল খানেক চলে আসার পর কুয়াশার নিষেধসত্ত্বেও রোম কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে পিছন ফিরে তাকাল। বহুদূরে দেখা গেল কুয়াশা এবং জংলী চারজনকে। জংলী চারজন ঘোড়ায় উঠে বসেছে দেখে অবাক হলো রোম। পালিয়ে আসছে নাকি ওরাও। কিন্তু ড. কুয়াশা তো ঘোড়ায় চড়েননি।

খানিকপর আবার পিছন ফিরে তাকাল রোম। জংলীরা সত্যি পালিয়ে আসছে। ড. কুয়াশাকে দেখতে না পেয়ে বিমূঢ় হলো সে। কালো ধোঁয়া দেখে কেঁপে উঠল তার বুক। ড. কুয়াশা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছেন।

জংলীদের সর্দারকে সংবাদ দেয়া দরকার। নাকি সে ড. কুয়াশাকে সাহায্য করার জন্যে ফিরে যাবে?

ফিরে যেতে সাহস পেল না রোম। আরও জোরে ছুটতে শুরু করল ও ঘোড়া নিয়ে। বনভূমির কাছাকাছি চলে এসেছে সে ইতিমধ্যে।

বনভূমিতে প্রবেশ করেই রোম ঘোড়া থামাল। দশ পনেরো জন জংলী গাছের উপর বসে তাকিয়ে আছে মরুভূমির দিকে। গাছ থেকে নেমে এল স্বয়ং সর্দার।

রোম সংক্ষেপে সব কথা জানাল। সর্দার জিজ্ঞেস করল কুয়াশার সঙ্গে যে চারজন গ্রামবাসী ছিল তারা ফিরে আসছে কেন? ভয়ে?

রোম জানাল, 'ঠিক জানি না। তবে ভয়েই হয়তো।'

নির্মম হয়ে উঠল সর্দারের মুখের চেহারা। ব্যাপারটা বুঝতে পারল না রোম। হাহাদেরকে সবাই ভয় করে। ভয় পাওয়াটা অপরাধ নয়। সর্দার স্বয়ং হাহাদেরকে যমের চেয়েও বেশি ভয় করে।

সর্দার হঠাৎ জানাল, 'তুমি ছেলে মানুষ, চলে যাও। এখানে থাকা তোমার উচিৎ নয়।'

সর্দারের চোখমুখ দেখে কেন যেন ভয় লাগল রোমের। কথা না বাড়িয়ে গ্রামের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে।

গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে পথে দেখা হলো ফোমের সাথে। ঘোড়া থামিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল রোম, 'দিদি! ড. কুয়াশা আমাকে বাঁচিয়েছেন, দিদি!

মরেই গিয়েছিলাম…!'

'রোম!'

ছুটে আসছে ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে ফোম। ওর গায়ে এখনও রাসেলের সেই শার্টটা।

ঘোড়া থেকে নেমে একটা গাছের সাথে লাগাম বাঁধতে বাঁধতে রোম ভারি গলায় বলে উঠল, 'তোর জন্যে খুব একটা খারাপ খবর আছে, দিদি!'

'রোম!'

ছুটে আসছে ফোম।

রোমের সামনে এসে দাঁড়াল ফোম। হাঁপাচ্ছে সে। আশঙ্কায় দুলছে ওর বুক।

'কি হয়েছে, রোম? জোনজা কি…'

'না, জোনজার কিছু হয়নি। কিন্তু তুই জোনজাকে এখন আর আগের মত ভালবাসিস না দিদি, বাসিস? আমার কাছে মিথ্যে বলে লাভ নেই দিদি, আমি সব বুঝতে পারি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—তুই সব বুঝতে পারিস, বুড়ো দাদা আমার! এখন বল কি হয়েছে… ।'

'রাসেল ভাই আমাকে হাহাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে দিদি। হাহারা আমাকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছিল। রাসেল ভাই গুলি করে একজন হাহাকে মেরে ফেলে। তারপর… ।'

রোম আর কথা বলে না।

আতঙ্ক ফুটে ওঠে ফোমের দু'চোখে, 'তারপর? চুপ করে গেলি কেন, রোম?'

'রাসেল ভাই চোরাবালিতে ডুবে গেছে… ।'

'রো-ও-ও-ও-ম!' আর্তনাদ করে উঠল ফোম। রোমকে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল ও।

বড় বোনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কেঁদে ফেলল রোম। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে বলল, 'আমি জানি তোরা বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলি। রাসেল ভাইয়ের মত ছেলে খুব কম হয়। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি প্রাণ দিয়েছেন—দিদি?'

'বল্।'

'চল, গ্রামে যাই। গ্রামের মাঝখানে আমরা একটা ইউকেলিপটাস গাছের চারা পুঁতব। আজই। সেই গাছের পাশে একটা বড় শ্বেত পাথর রাখব। তাতে লিখব রাসেল ভাইয়ের কথা… ।'

গ্রামের দিক থেকে ভেসে এল ড. মূরকোটের চিৎকার। 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

পরমুহূর্তে শোনা গেল জোনজার বিকট গর্জন।

পাথরের মূর্তির মত ফোম এবং রোম দুজন দুজনের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

রোম নিজের কাঁধ থেকে ফোমের হাত নামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'বাবা বিপদে পড়েছেন, ফোম!'

ছুটল রোম।

ফোম অনুসরণ করল রোমকে। পিছন থেকে সাবধান করে দিচ্ছে ও, 'খুব সাবধানে, রোম। জোনজার সাথে আমরা পারব না। ওকে ঘাঁটানো উচিত হবে না মোটেই। দূর থেকে যা করার করতে হবে··· ।'

গ্রামে ঢুকে বিমূঢ় হয়ে পড়ল ওরা।

উঠানের মাঝখানে বারো-তেরোটা শূকর রক্তের নদীতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে ডি. কস্টা। শূকরগুলোর ধড় থেকে মাথাগুলো আলাদা করা হয়েছে। জোনজাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ডি.কস্টাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তেরোজন মেয়ে। ডি.কস্টার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রোম। পিছু পিছু চঞ্চল পায়ে এল ফোম।

'ব্যাপার কি, মি. ডি. কস্টা?' রোম প্রশ্ন করল।

'বেপার ইজ ভেরী ভেরী গুড।'

ডি.কস্টা সোৎসাহে বলে চলল, 'হামার কাজ হামি করিটেছিলাম, আই মীন হামি টেরোটা শূয়োরের বাচ্চাকে কোরবানি ডিটে টৈয়ার হইটেছিলাম। ইন দ্য মীন টাইম মি. দৈত্য আই মীন, মি. জোনজা ছুটিয়া আসিয়া হামাকে টাড়া করিল। ছোরা ফেলিয়ে ডিয়া হামি পলাইলাম, বাট হামার ওয়াইফরা ঢরিয়া ফেলিল। মি. জোনজা হামার ছোরা টুলিয়া নিয়া শূয়ারের বাচ্চাগুলাকে কোরবানি ডিয়া ডিল··· ।'

এমন সময় ড. মূরকোটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ল্যাবরেটরির ভিতর থেকে, 'হেলপ মি! ফর গডস্ শেক, হেলপ্ মি··· ।'

ছুটল রোম।

'ছোকরা মরিটে চলিল···'

ডি.কস্টা চিৎকার করে উঠল। ফোম হঠাৎ বুঝতে পারল জোনজা তার বাবার ল্যাবরেটরির ভিতরই আছে। ছুটল ও রোমকে ধরার জন্যে, 'রোম, দাঁড়া। রোম শোন! রোম যাসনে···!'

রোম ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল তার বাবার ল্যাবরেটরির ভিতর।

ভিতরে ঢুকে রোম স্তম্ভিত হয়ে পড়ল।

জোনজার হাতে প্রকাণ্ড একটা লোহার রড। রড দিয়ে ল্যাবরেটরির যাবতীয় যন্ত্রপাতি এমনকি ট্র্যান্সমিশন যন্ত্রটাও ভেঙে তছনছ করছে। রোমের বাবা ড. মুরকোট আহত অবস্থায় পড়ে আছেন মেঝেতে। মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে তাঁর।

রোম পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোনজার উপর।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জোনজা।

আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফোম দরজার বাইরে থেকে।

জোনজার সারা গায়ে তাজা রক্ত। চোখ দুটো ধিকি ধিকি জ্বলছে তার। সে চোখের দৃষ্টিতে খুনের নেশা।

হাতের রড ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জোনজা।

'জোনজা! জোনজা আমার দিকে তাকাও।'

কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠল ফোম! ছোট ভাইয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপছে ও।

জোনজা তাকাল ফোমের দিকে। তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অবিশ্বাস, সন্দেহ আর ঘৃণা।

ঘোঁৎ করে শব্দ করল জোনজা সক্রোধে। দাঁতে দাঁত চাপছে সে। ঘুসি পাকাচ্ছে।

রোম এলোপাতাড়ি ঘুসি মেরে চলেছে জোনজার বুকে, পেটে। জোনজা অনড়। তেলাপোকার লাথি খেলে পাথরের মূর্তির যেমন কোন ক্ষতি হয় না, তেমনি রোমের ঘুসি খেয়ে জোনজার কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

জোনজা চোখ সরিয়ে নিল ফোমের দিক থেকে। রোমের দিকে তাকাল সে। পরমুহূর্তে চারদিক কেঁপে উঠল তার গর্জনে।

রোমকে দু'হাত দিয়ে ধরল জোনজা।

ড. মূরকোট উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে কি যেন বলছেন।

ল্যাবরেটরির ভিতর ঢুকছে উন্মাদিনীর মত ফোম। চিৎকার করছে সে, 'জোনজা, রোমকে ছেড়ে দাও! জোনজা, আমার দিকে তাকাও...!'

রোমের দুটো উরু ধরল জোনজা দুহাত দিয়ে। শূন্যে তুলল সে রোমকে।

রোমের মাথা মাটির দিকে। হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেছে। ছটফট করছে রোম।

ফোম পাগলিনীর মত চিৎকার করছে। ভয়ে অনড় হয়ে গেছে যেন ওর হাত-পা। ল্যাবরেটরির ভিতর ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। নড়াচড়ার শক্তি নেই শরীরে আর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফোম, 'জোনজা!'

রোমের দুই উরু ধরে দু'দিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জোনজা।

ফোমের চোখ জোড়া বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। বুঝতে পারছে ও জোনজার ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য। অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ওর চোখ জোড়া।

অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করছে রোম।

জোনজার উপর লাফ দিয়ে পড়ল ফোম। জোনজার বিশাল কাঁধে দু'হাতের দশটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে ঝুলে পড়ল ফোম।

রোমের গলা দিয়ে আর শব্দ বের হচ্ছে না। জোনজা দুই উরু ধরে ফেড়ে ফেলছে তাকে।

রোমের শরীরের হাড় মাংস ত্বক দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

সাপের মত মোচড় খাচ্ছে রোমের অসহায় দেহটা। কলকল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে রোমের দুই উরুর সংযোগস্থল ছিঁড়ে যাওয়ায়। ক্রমে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে কচি দেহটা।

প্রচণ্ড জোরে দু'দিকে আকর্ষণ করল জোনজা রোমের দুই উরু ধরে।

বিদঘুটে শব্দে দু'ভাগ হয়ে গেল রোমের শরীর। জীবন্ত কিশোরের শরীরটা চোখের পলকে ফেড়ে ফেলল জোনজা।

ঝুপ করে মেঝেতে পড়ল ফোম। জ্ঞান হারিয়েছে ও।

দ্বিখণ্ডিত রোমের শরীরটা দরজার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জোনজা। দরজার বাইরে উঠানে গিয়ে পড়ল দেহের দুটো ভাগ।

এক পা এগিয়ে ফোমের দিকে ঝুঁকে পড়ল জোনজা। দাঁতে দাঁত চাপল সে। পাঁচ-মণ ওজনের একটা পা তুলে দিল হঠাৎ ফোমের বুকে। তারপর কি মনে করে পা-টা নামিয়ে নিল। নুয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে ধরল ফোমের দুই উরু। শূন্যে তুলল ফোমের অজ্ঞান দেহটা।

রোমকে এভাবেই ধরেছিল জোনজা।

দুই

অবলা ঘোড়াটা বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখোশ পরিয়ে দেয়ায় অস্বস্তি হবার কথা। কিন্তু ভাষাহীন জানোয়ারটা ভুলেই গেছে বুঝি মুখোশের কথাটা। তাকিয়ে আছে সে চোরাবালির দিকে। যেখানে খানিক আগে কুয়াশা লাফ দিয়ে পড়েছিল।

কুয়াশা চোরাবালির নিচে তলিয়ে গেছে।

ঘোড়াটার চোখে পলক পড়ছে না। কেমন যেন বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

চারদিকে গাঢ় ধোঁয়া।

চোরাবালির উপর পড়ে আছে শুধু লম্বা দড়িটা। দড়ির একটি প্রান্ত ঘোড়াটার গলার সাথে বাঁধা। অপর প্রান্তটি বাঁধা আছে কুয়াশার বাঁ হাতের কব্জির সাথে।

দড়িটা ধীরে ধীরে আরও নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। বালির গভীরে চলে যাচ্ছে কুয়াশা। সেই সাথে দড়িটাও যাচ্ছে।

হঠাৎ স্থির হলো দড়িটা।

কথা বলতে না জানলেও অবোধ পশুদের বোধশক্তি আছে বৈকি। দড়িটার স্থির হয়ে যাওয়া লক্ষ করল সে। এদিক ওদিক তাকাল চঞ্চল ভাবে। আনন্দের সংবাদটা জানাবার জন্যে একজনকে দরকার। ধোঁয়ার বাইরে, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে শ'দুয়েক হাহা পাথরের মূর্তির মত বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। হাহারা বা হাহাদের ঘোড়াগুলো ধোঁয়ার ভিতরের দৃশ্য কিছুই দেখতে না পেলেও কুয়াশার ঘোড়াটা

ধোঁয়ার ভিতর বাইরের, সব দৃশ্যই দেখতে পাচ্ছে বিশেষ চশমা পরে থাকায়। হাহারা এবং হাহাদের ঘোড়াগুলো যে শত্রুপক্ষ তা বুঝতে পারল ঘোড়াটা। আকাশের দিকে মুখ তুলে চিঁহি চিঁহি করে দু'বার ডেকে উঠে আনন্দ প্রকাশ করল সে। বালিতে পা ঠুকল একবার।

চোরাবালির নিচ থেকে কুয়াশা দড়িটা একবার টানছে তারপর আবার ছেড়ে দিচ্ছে। ঘোড়াটা সকৌতুকে তাকিয়ে রইল দড়িটার দিকে। দড়িটা একবার নড়ে উঠছে, পরক্ষণে স্থির হয়ে যাচ্ছে।

আর একবার ডেকে উঠল ঘোড়াটা। দড়িটার দিকে তাকিয়ে আর একবার পা ঠুকল সে বালিতে। এমন সময় গলায় টান পড়ল ঘোড়াটার।

একপা এগিয়ে গেল ঘোড়াটা। ঢিলে হলো গলার বাঁধন। আবার টান পড়ল গলার বাঁধনে।

গম্ভীর হয়ে উঠল ঘোড়াটা। আবার কি সে সামনে পা বাড়াবে? নাকি পিছিয়ে যাবে?

কিভাবে কি করা উচিত কুয়াশা বলে গেলেও অবোধ জানোয়ারটা তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু কাজের সময় সে কুয়াশার নির্দেশ মতই কাজ করল।

প্রথমবার দড়িতে টান পড়ায় সামনে পা বাড়ালেও এবার ঘোড়াটা সামনে পা না বাড়িয়ে পিছিয়ে আসতে শুরু করল।

সর্বশক্তি দিয়ে পিছিয়ে আসছে ঘোড়াটা এক পা এক পা করে।

চোরাবালির নিচ থেকে উঠে আসছে দড়িটা।

মিনিট খানেক পর কুয়াশার বাঁ হাতটা উঠে এল চোরাবালির নিচ থেকে। ঘোড়াটা আরও জোরে পিছিয়ে আসতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে চোরাবালির নিচে থেকে উঠে এল কুয়াশার মাথা, গলা, বুক।

কুয়াশা ডান হাত দিয়ে ধরে রেখেছে রাসেলের কাঁধ। রাসেলের বগলের ভিতর হাত দিয়ে গলিয়ে নিজের শরীরের সাথে জড়িয়ে ধরে রেখেছে কুয়াশা তাকে।

চোরাবালির উপর উঠে এল ওরা। ঘোড়াটা ডেকে উঠল আবার চিঁহি রবে। পিছিয়ে গেল সে আরও কয়েক পা।

চোরাবালির সীমানা পেরিয়ে এপারে পৌঁছেই উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। মাথার বালি ঝেড়ে ফেলে রাসেলকে নিয়ে পড়ল সে।

ঘোড়াটা অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতবড় উপকারটা করল। অথচ এতটুকু আদর পেল না সে লোকটার কাছ থেকে।

রাসেলের পালস্ পরীক্ষা করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কুয়াশার চোখ দুটো। বেঁচে আছে এখনও।

কিন্তু শেষ অবধি বাঁচবে তো?

রাসেলের নাক-মুখ থেকে বালি বের করতে শুরু করল দ্রুত। নাক-মুখ পরিষ্কার

করা শেষ হলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করাবার পদ্ধতি অনুসরণ করে ঝাড়া পনেরো মিনিট পরিশ্রম করল কুয়াশা গভীর যত্নের সাথে।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করল রাসেল।

মুখ তুলে সোজা ঘোড়াটির দিকে তাকাল কুয়াশা। ঘোড়াটা তাকিয়েছিল ছলছল চোখে এতক্ষণ কুয়াশারই দিকে। কুয়াশা তাকাতেই আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

হেসে উঠল কুয়াশা। ঘোড়ার অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরেছে সে।

ধোঁয়া সরে যেতে শুরু করেছে।

ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। আলতোভাবে হাত রাখল মাথায়। নুয়ে পড়ে চুমু খেল কুয়াশা জানোয়ারটার গালে। ফিসফিস করে তার কানে কানে বলল, 'তুমি আমার পরম বন্ধুর মত কাজ করেছ। আমাদের দুজনকে নতুন জীবন দান করেছ বন্ধু।'

আদরে গলে গেল ঘোড়াটা। অভিমান ভুলে বালিতে পা ঠুকল সে। ঘাড়টা সরিয়ে আনল কুয়াশার গায়ের কাছে। কুয়াশার গায়ের সাথে গলা ঘষতে ঘষতে ডেকে উঠল চিঁহি চিঁহি রবে।

ধোঁয়ার বাইরে হাহারা বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। গভীর মনোযোগের সাথে সেদিকে তাকিয়ে রইল কুয়াশা। হাহারা তাজ্জব বনে গেছে।

প্রায় শ'দুয়েক হাহা বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। কারও চোখে পলক পড়ছে না। এতটুকু নড়ছে না তারা। জীবন্ত না যেন ওরা। যেন পাথরের মূর্তি বসানো রয়েছে ঘোড়াগুলোর পিঠে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে পাথরের মূর্তিগুলো ধোঁয়ার দিকে।

রাসেলকে ধীরে ধীরে তুলে ঘোড়ার উপর উপুড় করে শুইয়ে দিল কুয়াশা। ঘোড়ার পিঠে না চড়ে ব্যাগ থেকে বের করল একটা তিন ফুট লম্বা সরু কাঠের টুকরো।

টুকরোটার এক দিক চ্যাপ্টা অন্যদিক গোল। চ্যাপ্টা দিকটা তীক্ষ্ণ। টুকরোটার গোল দিকটা ডান হাতের দু'আঙুল দিয়ে ধরে হাহাদের সবচেয়ে লম্বা লোকটার মাথার একটু নিচে আঘাত করার উদ্দেশে ছুঁড়ে মারল সেটা।

বাতাস কেটে তীর বেগে ছুটে গেল কাঠের টুকরোটা। টুকরোটা কিন্তু সরাসরি লোকটার কপালে গিয়ে আঘাত করল না। বালিতে ড্রপ খেল প্রথমে। ড্রপ খেয়ে আবার উপরে উঠল। দশ গজ দূরে গিয়ে আবার ড্রপ খেল সেটা। উপরের দিকে উঠতে শুরু করল আবার।

লম্বা কাঠের টুকরোটা দু'বার ড্রপ খেয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে আঘাত করল সবচেয়ে লম্বা হাহার কপালে।

লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল উত্তপ্ত বালিতে মুখ থুবড়ে। প্রচণ্ড

আঘাতে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে তার নিঃশব্দে।

লোকটার কপালে কাঠের টুকরোটা আঘাত করেই নিজেকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে খেতে সবেগে ফিরে আসতে শুরু করেছে কুয়াশার দিকে। চোখের পলকে সেটা লুফে নিল কুয়াশা শূন্য থেকে।

বুমেরাং।

অস্ট্রেলিয়ার জংলীদের নিজস্ব অস্ত্র এই বুমেরাং। বড় ভয়ঙ্কর অস্ত্র। নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসাই বুমেরাংয়ের বৈশিষ্ট্য। এই বুমেরাং দিয়ে ৪০০ ফুট দূরের মানুষ বা জন্তুকে হত্যা করা যায়। সাধারণত বুমেরাং দু'ধরনের হয়। পিছন দিকে না তাকিয়ে কেবল শব্দ এবং অনুমানের উপর নির্ভর করে ছোঁড়া যায় বুমেরাং। পিছন দিকে নিক্ষেপ করলে বুমেরাং ফিরে আসে না।

পর পর পাঁচবার বুমেরাং ছুঁড়ে মারল কুয়াশা। প্রথম বার বুমেরাং ছুঁড়ে একজন হাহাকে হত্যা করার পিছনে বিশেষ কারণ ছিল কুয়াশার। হাহাদেরকে ভয় দেখানোটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এরপর অপর চারজন হাহাকে বুমেরাং ছুঁড়ে সে কেবল আহত করল।

লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে পিছন ফিরে তাকাল কুয়াশা।

হাহারা পিছিয়ে যাচ্ছে। ভীত হয়ে পড়েছে তারা। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কুয়াশা।

ধোঁয়া ভেদ করে প্রায় একশো গজের মত এগিয়ে এসে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল কুয়াশা। না, হাহারা সত্যি ভয় পেয়েছে। অনুসরণ করছে না তারা। অবাক বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে আছে শুধু।

মরুভূমি ছেড়ে জঙ্গলে প্রবেশ করার কয়েক মিনিট পরই হঠাৎ লাগাম টেনে ধরে ঘোড়া দাঁড় করাল কুয়াশা।

উঁচু একটা গাছের মাথায় ঝুলছে একটা জংলীর লাশ। জংলীটার মুণ্ডু নেই। শুধু ধড়টা ঝুলছে। টপটপ করে রক্ত পড়ছে নিচে এখনও।

এদিক ওদিক তাকাল কুয়াশা। নির্জন বনভূমি। কোথাও কোন শব্দ নেই। ব্যাপার কি?

চিন্তিত দেখাল কুয়াশাকে। এ কিসের চিহ্ন? কারা এমন বীভৎস কাণ্ড করল?

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আবার কুয়াশা। গ্রামে না ফেরা অবধি এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না।

কিন্তু পঞ্চাশ গজ দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই আবার দাঁড় করাতে বাধ্য হলো কুয়াশা ঘোড়া। আরও একটা লাশ ঝুলছে গাছের উপরে। এটারও সেই একই অবস্থা। ধড়টা ঝুলছে শুধু, মুণ্ডু নেই।

গম্ভীর হয়ে উঠল কুয়াশা। লক্ষণ শুভ নয়। কারা এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করতে পারে? সামনে কি আরও জংলীর লাশ ঝুলছে? ধড়গুলো ঝুলছে, মুণ্ডুগুলো কোথায়?

তবে কি বনভূমির অন্যান্য জংলী জাতিরা আক্রমণ করে এই এলাকার সব

জংলীকে হত্যা করে গেছে?

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আবার কুয়াশা। আরও লাশ দেখল ও। এবার কিন্তু থামল না। কেবল ঝুলন্ত ধড়গুলো গুণতে শুরু করল।

মোট চারটে ধড় দেখল কুয়াশা। আরও খানিক দূরে যাবার পর একটি গাছের গোড়ায় পাশাপাশি সাজানো রয়েছে দেখতে পেল চারটে মুণ্ডু। এখানেও দাঁড়াল না কুয়াশা।

আরও পঁচিশ গজ এগোবার পর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল ও।

আশপাশের গাছের উপর জংলীরা দাঁড়িয়ে আছে। সতর্ক হয়ে উঠল কুয়াশা। আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারল না সে।

জংলী সর্দারকে দেখতে পেল কুয়াশা। তর তর করে প্রায় কাঠ বিড়ালীর মত দ্রুত নামছে সে একটা গাছ থেকে।

গাছ থেকে নেমে সর্দার কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়াল। সর্দারের চোখ মুখ ভয়ানক থমথম করছে লক্ষ করল কুয়াশা।

'লাশ কেন গাছের ওপর?' ইঙ্গিতে ইশারায় প্রশ্ন করল কুয়াশা।

সর্দার বলল, 'আকুলা আঙকা চাকুলা চিপি হিল-খিল। সোনাকা মোনাকা চানকি-মানকি হিবলু, তান তানাক্কা বায় বানাক্কা ধা ধা ধা। ইকড়ি মিকড়ি···।'

অনর্গল বলে চলল সর্দার। কুয়াশা সব কথা বুঝতে না পারলেও কয়েকটা শব্দের অর্থ ও শিখে নিয়েছিল বলে সর্দারের বক্তব্যের সারমর্ম সে ঠিকই বুঝতে পারল। সর্দারের বক্তব্য হলো এই যে কুয়াশা তাদের দেবতা, দেবতা তাদের চারজন জংলীকে নিয়ে হাহাদের এলাকায় গিয়েছিল, কিন্তু জংলীরা দেবতার আদেশ পালন না করে পালিয়ে আসায় সর্দার তাদেরকে আইন অনুযায়ী চরম শাস্তি দিয়েছে।

কুয়াশা রীতিমত বিরক্ত হলো সর্দারের উপর। সর্দারের বক্তব্য শেষ হতে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে সে জংলীদের ভাষায় জানাল যে এই হত্যাকাণ্ডে সে বিরূপ হয়েছে। এরপর থেকে জংলীদের কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন। মৃত্যুদণ্ড মানবতা বিরোধী, নির্মম। আজ থেকে এর প্রচলন উঠে গেল। সর্দারের মতামত কি?

কুয়াশার কথা শুনে আলকাতরার মত কালো হয়ে গেল সর্দারের মুখ। বোবা-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

অবাক হলো কুয়াশা। ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা পাচ্ছে সর্দার বুঝতে পারল কুয়াশা। কিন্তু কারণ কি? মৃত্যুদণ্ড ওঠাতে রাজি নয়? সেক্ষেত্রে এত দুশ্চিন্তার কি আছে? তার মতামত গ্রহণ না করলেই পারে।

ঠোঁট জোড়া কাঁপছে সর্দারের। কি যেন বলার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পারছে না। কুয়াশা লক্ষ করল সর্দারের দু'চোখের কোণে পানি। বিস্ময়ের সীমা রইল না

তার। অবশেষে সর্দার বলল, 'ইগলু-হিগলু, আমপা, শিগলু-মিগলু রামপা।

কুয়াশার হুকুম বিনা তর্কে মেনে নিল সর্দার। কুয়াশা লক্ষ করল সর্দারের আশেপাশে দাঁড়ানো জংলীদের চোখে মুখে ফুটে উঠল আতঙ্ক এবং বিস্ময়। কারণটা বুঝতে পারল না কুয়াশা। জংলীদের সকলকে নিয়ে গ্রামের দিকে ফেরার নির্দেশ দিয়ে ঘোড়া ছোটাল সে।

গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে কুয়াশা ডি.কস্টার আর্তচিৎকার শুনতে পেল।

ডি.কস্টাকে খানিকপর দেখতে পেল কুয়াশা। একেবেঁকে ছুটে আসছে সে তীরবেগে। তাকে ধাওয়া করেছে তার তেরোজন স্ত্রী।

কুয়াশাকে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল যেন ডি.কস্টা। সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ঠকঠক করে কাঁপছে সে। হাঁটু দুটো পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে।

'জোনজা, স্যার···।' হাঁপাতে হাঁপাতে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল ডি.কস্টা।

কুয়াশা বলল, 'শান্ত হোন। জোনজা কোথায়? আপনাকে তো তাড়া করে আসছে আপনার স্ত্রীরা।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ডি.কস্টা। ঢোক গিলল। বলল, 'উহারাও স্যার হামার মটো ভয়ে ডরে কাঁপিটে কাঁপিটে পালাইয়া আসিটেছে জোনজার ভয়ে···!'

'কোথায় সে?' কুয়াশা জিজ্ঞেস করল।

'প্রফেসর মূরকোটের ল্যাবরেটরিটে স্যার। রোমকে মারিয়া ফেলিটেছে ডেকিয়া আসিলাম···।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কুয়াশা।

গ্রামে ঢুকে একজন জংলীকেও আশপাশে দেখতে পেল না কুয়াশা। উঠানে রক্তাক্ত মৃত শূকরগুলো চোখে পড়ল তার।

ঘোড়া থামাল কুয়াশা মঁসিয়ে মূরকোটের ঘরের পাশে। ঘরটার দরজার সামনে একটি দ্বিখণ্ডিত দেহ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দরজার দিকে ছুটল পরমুহূর্তে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কুয়াশা দেখল ফোমকে শূন্যে তুলে ধরেছে জোনজা, ফোমের মাথাটা মাটির দিকে, জ্ঞান নেই।

'জোনজা!' বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠল কুয়াশা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জোনজা। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে কুয়াশা।

'ফোমকে ছেড়ে দাও!' গম্ভীর গলায় আদেশ করল কুয়াশা।

ঘাড় ফিরিয়ে নিল জোনজা। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল সে। ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশার মুখোমুখি। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ক্রোধ বর্ষণ করল সে কুয়াশার উপর।

কুয়াশা স্থির, অচঞ্চল গলায় আবার বলে উঠল, 'ভাল চাও তো ফোমকে নামিয়ে রাখো মেঝেতে।'

হঠাৎ ফোমকে ছুঁড়ে দিল জোনজা কুয়াশার দিকে। তৈরি না থাকলেও বিদ্যুৎবেগে দুহাত তুলে শূন্য থেকেই ফোমকে লুফে নিল কুয়াশা। সেই মুহূর্তে কুয়াশাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল জোনজা।

লাফ দিয়ে চোখের পলকে একপাশে সরে গেল কুয়াশা। জোনজা তাল সামলাবার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে গেল। ল্যাবরেটরির ভিতর থেকে উঠানে বেরিয়ে এসেছে সে।

আস্তে করে ফোমের অচেতন দেহটা নামিয়ে দিল কুয়াশা মাটিতে। জোনজা ঘুরে দাঁড়িয়ে দমাদম ঘুসি মারছে নিজের বুকে।

কুয়াশা সোজা হয়ে দাঁড়াল। বিকট গর্জন করছে জোনজা দুর্বোধ্য স্বরে। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে সে।

কুয়াশা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। জোনজার লাফ দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে সে।

তিন হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল জোনজা। লাফ দেবার কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে। গর্জন করছে, দাঁতে দাঁত পিষছে, বুকে সশব্দে ঘুসি মারছে। সে চাইছে কুয়াশা তাকে আক্রমণ করুক।

হঠাৎ জোনজার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কুয়াশার ঘোড়ার উপর শায়িত রাসেলের উপর। গর্জে উঠল সে। পা বাড়াল সেদিকে।

লাফ দিয়ে পড়ল কুয়াশা জোনজার সামনে। বাধা পেয়ে সক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোনজা।

কুয়াশার মাথা লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল জোনজা। সরে গেল কুয়াশা। সরে যেতে যেতেই ডান হাত দিয়ে জোনজার কপালের বাঁ পাশের রগে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিল।

কুয়াশার ঘুসি খেয়ে বহু শক্তিশালী মানুষ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এমন ঘটনা ঘটেছে অতীতে অনেক। কিন্তু জোনজার চোখ মুখ ব্যথায় কুঁচকে উঠলেও তেমন বিশেষ কোন ক্ষতি তার হয়েছে বলে মনে হলো না। ঘুসি খেয়ে আবার সে লাফ দিল কুয়াশাকে লক্ষ্য করে। কুয়াশা জোনজার হাত হতে মুক্ত থেকে তার বগলের নিচে একটি নার্ভে প্রচণ্ড আঘাত হানল ডান হাতের আঙুলগুলো পাশাপাশি একত্রিত করে।

জোনজার বাঁ হাতের বগলের নিচে অবস্থিত নার্ভটা অকেজো হয়ে গেল আঘাত লাগার ফলে। গোটা বাহুটাই অসাড় হয়ে গেল জোনজার।

তৃতীয়বার লাফ দেবার কোন লক্ষণ জোনজার মধ্যে দেখা গেল না। ভয় ফুটে উঠেছে তার দু চোখে। বাঁ হাতটার দিকে তাকাচ্ছে ঘনঘন।

কুয়াশা বিপুল বিক্রমে জোনজার ডান উরুর সংযোগ স্থলে সর্বশক্তি দিয়ে একটা লাথি মারল।

কঁকিয়ে উঠল জোনজা দুর্বোধ্য স্বরে। কিন্তু পরমুহূর্তে মরিয়া হয়ে লাফ দিল সে।

কুয়াশা জোনজার এই আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিল না। জোনজা ডান হাত দিয়ে কুয়াশার দেহটা জড়িয়ে ধরে টেনে আনল নিজের কাছে। গায়ের সাথে কুয়াশাকে চেপে ধরল সে।

কুয়াশাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবার সাথে সাথে নিজেও পড়ে গেল জোনজা।

কুয়াশা পড়ল আগে। তার উপর পড়ল জোনজা।

একটি মাত্র হাত জোনজার কাজের। সেই হাত দিয়েই সে কুয়াশার গলা চেপে ধরল।

গলার উপর কেউ পাঁচমণ ওজনের পাথর চাপিয়ে দিয়েছে বলে মনে হলো কুয়াশার। দু'হাত দিয়ে জোনজার হাতটা সরাবার চেষ্টা করল সে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে কুয়াশার। অবশ হয়ে আসছে সর্বশরীর। গোটা দেহের উপর জোনজা নিজের দেহের অস্বাভাবিক ভার চাপিয়ে রেখেছে।

জোনজার হাতের কড়ে আঙুলের নিচে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে সবেগে ধাক্কা দিয়ে সেটাকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করল কুয়াশা। কিন্তু আঙুল ভাঙলেও জোনজার মধ্যে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেল না।

এবার গলা চেপে ধরল কুয়াশা জোনজার।

দুর্বল হয়ে পড়েছে কুয়াশা। জোনজার হাতটা সাঁড়াশীর মত এঁটে বসেছে গলার চারপাশে। এতটুকু ঢিলে হচ্ছে না। দম ফেলতে পারছে না কুয়াশা।

দুর্বল হাতে ধরেছে জোনজার গলাটা কুয়াশা। অবশ হয়ে আসছে। বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ জোড়া। একটু একটু করে শক্তি বাড়িয়ে জোনজার গলার চারদিকে চাপ দিচ্ছে সে।

কিন্তু কোনই ফল হচ্ছে না। জোনজার একটা হাতেই অমানুষিক শক্তি। বড় ভয়ঙ্করভাবে ধরেছে সে কুয়াশার গলা। ছাড়ানো অসম্ভব। এভাবে বেশিক্ষণ চলতে পারে না। চোখে সর্ষেফুল দেখছে কুয়াশা। দম ফেলতে পারছে না। মারা যাচ্ছে সে।

দাঁতে দাঁত চেপে সর্বশক্তি একত্রিত করে জোনজার গলার চারদিকে চাপ দিল কুয়াশা দু'হাতের দশটা আঙুল দিয়ে।

একটু ঢিল হলো জোনজার হাত।

আশায় ভরে উঠল কুয়াশার বুক। মৃত্যুকে তাহলে জয় করা যাবে! আরও শক্তি দরকার। আরও জোরে চেপে ধরা দরকার।

ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করছে কুয়াশা। ফোঁস ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে সে

এখন। জোনজার হাত ঢিলে হয়ে গেছে গলার চারপাশে।

টেনিস বলের মত বড় বড় চোখ দুটো জোনজার গর্ত থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এই সুযোগ। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল কুয়াশা নিচ থেকে।

কুয়াশার ধাক্কায় জোনজা মাটিতে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত দেরি না করে কুয়াশা জোনজার বুকে চেপে বসল।

নতুন শক্তিতে চেপে ধরল কুয়াশা জোনজার গলা। পা দুটো ছুঁড়ছে প্রকাণ্ড দৈত্যটা এলোপাতাড়ি ভাবে। সচেতন ভাবে নয় ঠিক, যন্ত্রণা এবং আতঙ্কে মরিয়া হয়ে চোখ বন্ধ করে প্রাণপণ শক্তিতে চাপ দিয়ে চলেছে কুয়াশা তার চারগুণ বড় শত্রুর গলায়।

ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসছে জোনজার দেহ। পা দুটো ছুঁড়ছে না সে আর। নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না সে এখন। পা দুটো নড়ছে কিন্তু আস্তে আস্তে।

দেখতে দেখতে নিঃসাড় হয়ে গেল জোনজার দেহ। আরও মিনিট খানেক পর ছেড়ে দিল কুয়াশা জোনজার গলা।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। হাঁপরের মত উঠছে আর নামছে আলখাল্লায় ঢাকা তার বিশাল বুকটা।

তিন

বেলা দশটা থেকে একটা অবধি দম ফেলবার ফুরসত পেল না কুয়াশা। দুজন রোগী এবং একজন রোগীনিকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাবার কথা যে-কোন মানুষের। তারমধ্যে রাসেলের মত রোগী থাকলে তো কথাই নেই, ডাক্তার পালাবার পথ খুঁজত।

কুয়াশা কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে তিনজনকে সামলাতে লাগল। রাসেলের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বাঁচে কি না বাঁচে বলা দুষ্কর। কোরামিন দিয়েছে কুয়াশা ড. মূরকোটকে। জ্ঞান ফিরেছে বৃদ্ধের কিন্তু ঘুমাচ্ছেন। ফোমের জ্ঞান ফিরলেও খানিক পর পরই আবার জ্ঞান হারাচ্ছে সে। জ্ঞান ফিরলে চোখ মেলে তাকায় সে, এদিক ওদিক রোমকে খোঁজে তারপর হঠাৎ রোমের নাম ধরে চিৎকার করেই জ্ঞান হারায়।

অক্সিজেন দিচ্ছে কুয়াশা রাসেলকে। কুয়াশার অধিকাংশ সময় এবং মনোযোগ রাসেল একাই নিয়েছে।

বেলা একটার সময় সফল হলো কুয়শার অক্লান্ত পরিশ্রম। চোখ মেলে তাকাল রাসেল।

সাফল্যের অনির্বচনীয় হাসি ফুটে উঠল কুয়াশার মুখে।

রাসেল তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে। ওর চোখের দৃষ্টির মর্ম বোঝা যাচ্ছে

না।

নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল কয়েক মিনিট। আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করল রাসেল। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার চোখ মেলল ও। কুয়াশার চোখে চোখ রেখে হঠাৎ হাসল। বলল, 'এটা স্বর্গ না নরক?'

গভীর মমতায় রাসেলের কপালে একটা হাত রাখল কুয়াশা আলতোভাবে। বলল, 'তোমার কি মনে হচ্ছে, রাসেল?'

সেই পরিচিত হাসি ফুটল রাসেলের ঠোঁটে। হাসিটা একটু বাঁকা, মৃদু ব্যঙ্গাত্মক। ও বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি মহৎ পুরুষ, আপনার স্বর্গে যাবারই কথা। আমি অধম, অর্বাচীন, আমার তো নরকেই স্থান পাবার কথা। কিন্তু এযে দেখছি দুজনেই এক জায়গায় রয়েছি। তবে কি এটা স্বর্গ বা নরক কোনটাই না?'

'না, কোনটাই নয়। এটা পৃথিবী।'

কুয়াশার কথা শেষ হতে অবিশ্বাস ফুটে উঠল রাসেলের চেহারায়।

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আমি কি চোরাবালির নিচে প্রবেশ করিনি? সেটা কি দুঃস্বপ্ন ছিল বলতে চান? না, দুঃস্বপ্ন হতে পারে না। এখন যা দেখছি সেটাকে স্বপ্ন বলে স্বীকার করতে রাজি আছি আমি···।'

প্রাণ খুলে হেসে উঠল কুয়াশা দরাজ গলায় হাঃ হাঃ করে। রাসেল কুয়াশার অজ্ঞাতে নিজের উরুতে চিমটি কাটল।

'উহ্!' ব্যথায় শব্দ করে উঠল রাসেল।

'কি হলো?' হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'না স্বপ্ন দেখছি না। চোরাবালিতে ডুবে যাওয়াটা তাহলে দুঃস্বপ্ন ছিল?'

'না, কোনটাই স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন নয়। চোরাবালিতে ঠিকই ডুবে গিয়েছিলে তুমি, রাসেল। তবে তোমাকে তুলে এনেছি আমি বালির নিচ থেকে। সে ব্যাপারে পরে সব শুনো। কেমন বোধ করছ এখন?'

'ভাল। পরে না, এখুনি আপনি সব বলুন আমাকে···।'

রাসেল উঠে বসার চেষ্টা করল বিছানার উপর।

দু'হাত দিয়ে আলতোভাবে ধরল রাসেলকে কুয়াশা। বলল, 'উঠো না, উঠো না। তুমি অসুস্থ এখনও, শুয়ে থাকো! সবকথা তোমার পরে শুনলেও চলবে, রাসেল। এখন তোমাকে জরুরী কয়েকটা কথা বলে রাখি।'

'বেশ বলুন।'

রাসেল শান্ত ভাবে শুয়েই রইল।

'আমি ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে হাহাদের এলাকায় যাচ্ছি, রাসেল। ওরা খেপে গেছে আমাদের ওপর। আজ রাতেই ওরা আক্রমণ করবে এই গ্রাম।'

'কে বলল?'

'কেউ বলেনি। এটা আমার ধারণা। ওরা যদি আক্রমণ করে তাহলে কেউ প্রাণে বাঁচবে না। সংখ্যায় ওরা কয়েক হাজার। বনভূমির জংলীদের চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র, অনেক বেশি দুঃসাহসী। তার ওপর ওদের সাথে আছে ডেভিড।'

'বনভূমির জংলীদের সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো হাজার।'

'তা ঠিক। কিন্তু পনেরো হাজারকে একত্রিত করা সম্ভব নয়। বনভূমির বিভিন্ন এলাকায় আলাদা আলাদা ভাবে নিজস্ব গ্রামে বাস করে এরা।'

'চেষ্টা করলে হাহাদের বিরুদ্ধে এই পনেরো হাজারকে একত্রিত করা কঠিন কিছুই নয়। আপনি সে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'কিন্তু তাতে সময় লাগবে।'

রাসেল স্বীকার করল, 'তা লাগবে।'

কুয়াশা বলল, 'অত সময় আমাদের হাতে নেই। আজ রাতে যদি হাহারা এই গ্রাম আক্রমণ করে তাহলে ডেভিডও হয়তো সঙ্গে থাকবে। এবং আমার লেসার গানের কথা আমি ভুলিনি, রাসেল। ডেভিডের মত শয়তান লোকের হাতে দুই মারাত্মক অস্ত্র থাকার তাৎপর্য যে কি পরিমাণ মারাত্মক তা একমাত্র আমিই বুঝি। হাহাদের এলাকায় যাবার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো লেসার গানটা উদ্ধার করা।'

'কিন্তু আপনি একা কি করতে পারবেন ওদের? শেষ পর্যন্ত প্রাণটা হারাবেন না তো বিদেশ বিভূঁইয়ে?'

রাসেলের কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল কুয়াশা। হাসি থামতে ও বলল, 'নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা আমার আছে, রাসেল। যে-কোন বিপদেই পড়ি না কেন···।'

'তাহলে আর কি, যান। কেউ বাধা দিচ্ছে না আপনাকে।'

আবারও হেসে ফেলল কুয়াশা। বলল, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যেতাম আমি, রাসেল। যেতে তো আজ হোক কাল হোক হবেই। গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমির নির্দিষ্ট একটা এলাকার বালিতে ইউরেনিয়াম আছে। সে বালি আরও ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। সেখানে যেতে হলে হাহাদের এলাকা পেরিয়েই যেতে হবে। ড. মূরকোটের আবিষ্কৃত যান্ত্রিক ঘোড়াটা যদি থাকত তবে হাহাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া যেত। কিন্তু সেটাও তো ডেভিডের হাতে। আমি কি ভেবেছি জানো, রাসেল?'

'কি?'

'আমি হাহাদের পার্বত্য এলাকায় যাব পিছন দিক দিয়ে। প্রায় পঞ্চাশ মাইল ঘোড়ার পিঠে চড়ে পশ্চিম দিকে যাবার পর উত্তর দিকে রওনা হব আমি। আরও পঞ্চাশ মাইলের মত অনুমান পার্বত্য এলাকার পর হাহাদের পার্বত্য এলাকা পড়বে। সঙ্গে দেড় শো শূকর নিয়ে যাব ভাবছি।

'কেন?'

ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল রাসেল।

রহস্যময় হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে। বলল, 'হাহাদেরকে ভেট দেব। পুড়িয়ে খাবে ওরা।'

গম্ভীর হয়ে উঠল রাসেল। বলল, 'হেঁয়ালি আমি পছন্দ করি না।'

'কিন্তু, আমি হেঁয়ালি করছি না। সত্যি সত্যি শূকরগুলো হাহারা পুড়িয়ে খাবে।'

রাসেল কোন কথা বলল না।

কুয়াশা নিঃশব্দে আর একবার পরীক্ষা করল রাসেলকে। পরীক্ষা শেষ করে সে বলল, 'দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে। চলি, কেমন?'

'এখুনি রওনা হবেন নাকি?'

'হ্যাঁ। দেরি করতে চাই না। হাতে সময় খুব কম।'

'বেশ, যান।'

'বিদায়।'

'বিদায়।'

দরজার কাছে গিয়ে রাসেলের গলা শুনে থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। অদ্ভুত এক হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

রাসেল পিছন থেকে বলল, 'আবার দেখা হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে রাসেলের দিকে তাকাল কুয়াশা। হাসল। বলল, 'আবার দেখা হবে।'

বেরিয়ে গেল কুয়াশা।

রাসেলের ঘর থেকে বেরিয়ে ফোমের ঘরে এসে ঢুকল কুয়াশা। ফোমকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে সে। ফোমকে পরীক্ষা করে ড. মূরকোটের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

রক্ত দেয়া হয়েছে ড. মূরকোটকে। কুয়াশা নিজেই দিয়েছে রক্ত। ঘুমাচ্ছেন বৃদ্ধ। অবশেষে উঠানে বেরিয়ে এল কুয়াশা।

সর্দারের কি যেন হয়েছে। হাসি নেই তার মুখে। কথা বলছে না সে বিশেষ কারও সাথে। তার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন উদাস এবং ভাবলেশহীন।

কুয়াশা বেরিয়ে আসতেই সামনে এসে দাঁড়াল সর্দার। সর্দারের পিছনে গ্রামের প্রায় সব জংলীই জমায়েত হয়েছে।

উঠানের মাঝখানে ডি.কস্টার তেরোজন স্ত্রী গোল হয়ে ঘিরে বসেছে ডি.কস্টাকে। ডি.কস্টার হাড়ভাঙা পরিশ্রম যাচ্ছে আজ। চারটে শূকরের চামড়া ছাড়িয়েছে সে মাত্র। এখনও নয়টা বাকি। কোনদিকে মন নেই তার। বিড় বিড় করে কার উদ্দেশে যেন সে ইংরেজি বাংলা এবং উর্দুতে মেশানো অদ্ভুত এক ভাষায়

গালাগালি করছে।

কুয়াশা সর্দারকে জানাল ড. মূরকোট, ফোম এবং রাসেলের অবস্থা এখন ভাল। বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই।

সর্দারের কাছে একশো শূকর চাইল কুয়াশা। দিতে রাজি হলো সর্দার বিনা বাক্যব্যয়ে। কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করল। কুয়াশা বলল, 'আমি হাহাদের এলাকায় যাব। শূকরগুলো দেব ওদেরকে খেতে।'

একশো শূকরের গলায় দড়ি বেঁধে আনা হলো। বাঁধন পরীক্ষা করল কুয়াশা। বিরাট লম্বা এক খণ্ড দড়ি দিয়ে কৌশলে বাঁধা হয়েছে শূকরগুলোকে। দড়ির একটি প্রান্ত রইল কুয়াশার হাতে।

ঘোড়ায় চড়ল কুয়াশা তার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং ক্ষুদ্র নানারকম অস্ত্রশস্ত্রে ভর্তি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে।

সর্দার অদ্ভুত এক কাণ্ড করল। নিজের হাতের কড়ে আঙুল কেটে কুয়াশার কপালে এক ফোঁটা রক্ত দিয়ে টিপ পরিয়ে দিল সে।

চমকে উঠল কুয়াশা। চিরকালের জন্যে বিদায় নেবার বা দেবার সময় জংলীরা নিজের কড়ে আঙুল কেটে টিপ পরিয়ে দেয়। সর্দার কেন যে তাকে চিরকালের জন্যে বিদায় দিল বা নিল বুঝতে পারল না কুয়াশা। হাহাদের এলাকায় সে যাবে শুনে সর্দার কি ধরে নিয়েছে প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসতে পারবে না?

এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না করে কুয়াশা সর্দারকে বলল, 'আমি চললাম। আমার অনুপস্থিতিতে কোন সমস্যা দেখা দিলে আমার ছোট ভাই রাসেলের সাথে পরামর্শ করো তোমরা। ও তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে।

সর্দার মাথা নাড়ল। কিন্তু মুখ খুলল না।

ঘোড়া পা বাড়াল।

শূকরগুলোর গলায় বাঁধা দড়ির প্রান্তটা কুয়াশার হাতে। টান পড়তে জানোয়ারগুলো ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটতে শুরু করল।

জংলীদের গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল কুয়াশা। সর্দার এবং গ্রামের সব জংলীরা বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুয়াশার গমন পথের দিকে।

ধীর গতিতে ছুটল কুয়াশার ঘোড়া। শূকরগুলো সাথে আছে বলে দ্রুত ঘোড়া ছোটাবার উপায় নেই।

বেলা তিনটের দিকে মোড় নিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চলল কুয়াশা। আধঘণ্টা পরই বনভূমি হালকা হয়ে এল। বিস্মিত হলো কুয়াশা। কম্পাস বের করে দিক নির্ণয় করে নিল আবার। না, দিক ভুল হয়নি। এত অল্প দূরত্ব অতিক্রম করব্যর পরই জঙ্গল শেষ হয় কি করে? আরও মাইলখানেক এগিয়ে গেল কুয়াশা। মাটির সাথে বালি এবং কাঁকরের আধিক্য। গাছপালা দু'একটা দেখা যাচ্ছে। খানিক পর তাও দেখা গেল না। পিছনে বনভূমিকে ফেলে রেখে বালি, কাঁকর, ছোট বড় পাথরের উপর দিয়ে

ছুটে চলল ঘোড়া।

দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়শ্রেণী।

বিকেল চারটের দিকে ছোট দুটো পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথে ঢুকল কুয়াশা।

পনেরো মিনিট পর গিরিপথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে কুয়াশা লাগাম টেনে ধরে দাঁড় করাল ঘোড়াকে।

শূকরগুলো হাঁপিয়ে গেছে। চিৎকার করার শক্তি তাদের নেই।

বিনকিউলার বের করে চোখে লাগাল কুয়াশা।

দুরে উঁচু-নিচু পাহাড়। শক্তিশালী বিনকিউলার দিয়ে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে তাজ্জব বনে গেল কুয়াশা।

হাহারা অসভ্য নরখাদক হলেও তারা যে-কোন সভ্য জাতির চেয়ে পরিশ্রমী বুঝতে পারল কুয়াশা। উঁচু-নিচু প্রতিটি পাহাড়ের গায়ে গুহা বানিয়ে বাস করার ব্যবস্থা করেছে তারা। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পাথর কেটে কেটে চওড়া ধাপ তৈরি করেছে। বিশাল সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে পাহাড়ের বহু উঁচু অবধি। সিঁড়ির পাশে চওড়া সমতল রাস্তা তৈরি করেছে তারা। রাস্তার পাশে গুহা মুখ।

হাহারা জংলীদের মত কোমরবন্ধনীও পরে না। প্রায় সব হাহাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তবে কিছু সংখ্যককে নেকড়ের ছাল পরে থাকতে দেখতে পেল কুয়াশা বিনকিউলার দিয়ে। নেকড়ের ছালগুলো লাল রঙে রঞ্জিত। ওরা সম্ভবত গ্রুপ লীডার।

হাহাদের মেয়েরাও নগ্ন। কোন কোন গুহার ভিতর দৃষ্টি পড়ল কুয়াশার। মেয়েরা বাচ্চাদেরকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে পা মেলে পাথরের উপর বসে। পুরুষরা বর্শার ফলায় শান দিচ্ছে, নেকড়ের ছাল রং করছে, যুবকদের মাথা কামিয়ে দিচ্ছে প্রৌঢ়রা। একদল যুবক প্রশস্ত একটা সমতল জায়গায় বর্শা নিক্ষেপ করা শিখছে। প্রকাণ্ড গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে রাশ রাশ ধোঁয়া। ওখানে পোড়ানো হচ্ছে নেকড়ে, শূকর, ভল্লুক। ছোট একটি পাহাড়ের গুহার ভিতর দৃষ্টি পড়তে চমকে উঠল কুয়াশা।

গুহা মুখটায় দশ বারোজন হাহা বর্শা হাতে নিয়ে অনড় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। গুহার দিকে মুখ করে বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

পাথরের মূর্তি বলে সন্দেহ হলো কুয়াশার। কিন্তু খানিক পর ভুল ভাঙল তার। মূর্তি নয়, মানুষই। গুহার ভিতর বিদেশী শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ বেশ কয়েকজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে। শুয়ে বসে আছে তারা গুহার ভিতর।

ওরা বন্দী, বুঝতে পারল কুয়াশা।

পাহাড়ের উপর থেকে দৃষ্টি নামল কুয়াশার নিচের দিকে। রীতিমত বিস্মিত হলো কুয়াশা। সেই সাথে খুশি হয়ে উঠল সে। পাহাড়ের নিচে দৈত্যাকার তিনটে ট্র্যাক্টর, দুটো ট্রাক, দুটো স্বয়ংক্রিয় ক্রেন, অসংখ্য মোটা পাইপ এবং ভারী আরও কয়েক রকম যন্ত্র ও মেশিন দেখতে পেল কুয়াশা। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগল তার

মনে—এগুলো কোথায় পেল হাহারা?

উত্তরটা অনুমান করে নিল কুয়াশা পরমুহূর্তে। গ্রেট ভিক্টোরিয়া ডেজার্ট সোনা এবং ইউরেনিয়ামে সমৃদ্ধ। দেশী এবং বিদেশী সরকার ইঞ্জিনিয়র দল পাঠিয়ে নানা রকম খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাবার চেষ্টা করেছেন অতীতে। হাহারা সেইসব লোকজনদের বন্দী করে রেখেছে। সেই সাথে রয়ে গেছে ইঞ্জিনিয়রদের যন্ত্রপাতি এবং মেশিন।

কুয়াশা জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারবে ভেবে দারুণ খুশি হয়ে উঠল।

আরও এগিয়ে যেতে হবে। হাহাদের মধ্যে যাবার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করল কুয়াশা। দেড়শো গজ সামনে একটি পাহাড়ের উপর তিনজন হাহা বসে আছে পাথরের উপর। তিনজনের হাতেই বর্শা। পাহারা দিচ্ছে ওরা।

হাহাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ওদের এলাকার যত দূর সম্ভব ভিতরে ঢুকতে চায় কুয়াশা।

জটিল একটা পথ বেছে নিল কুয়াশা। চড়াই ঠেলে প্রথমে বেশ খানিকটা উঠতে হবে উপর দিকে। তারপর উৎরাই। শূকরগুলোকে নিয়ে ওঠানামা কষ্টকর কিন্তু নিরাপদ।

কুয়াশার ঘোড়া পা বাড়াল।

প্রায় বিশ মিনিট পর সমতল পাথরের উপর লাগাম টেনে দাঁড় করাল কুয়াশা আবার ঘোড়াকে। এবার ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সে।

মোট তিনটে পাহারাদানরত দলকে পাশ কাটিয়ে, তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনেকটা ভিতরে চলে এসেছে কুয়াশা।

প্রকাণ্ড একটা পাথরের আড়ালে ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা বাঁধল কুয়াশা ছোট একটা পাথরের সাথে। কাঁধে ব্যাগ এবং হাতে শূকরদের গলায় বাঁধা দড়ির শেষ প্রান্তটা ধরে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিঃশব্দে উপরে উঠতে শুরু করল কুয়াশা। উপরে একটা গুহা।

দূর থেকেই কুয়াশা দেখে নিয়েছে গুহার ভিতরে কেউ নেই।

গুহাটা যেন কুয়াশার জন্যেই হাহারা তৈরি করেছে। গুহা মুখটার সামনে, ডানে, বাঁয়ে বড় বড় পাথর। ফলে অন্য কোন দিক থেকে এই গুহার সামনে বা ভিতরের দৃশ্য দেখা যায় না।

পাঁচ মিনিট লাগল কুয়াশার গুহার ভিতর ঢুকতে। প্রকাণ্ড গুহা! দেখতে অনেকটা বারো নাম্বার ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারের মত। L-এর মত সোজা খানিক দূর গিয়ে মোড় নিয়ে চলে গেছে বেশ অনেক দূর অবধি।

অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে মোড় নিয়ে আরও ভিতরে চলে গেল কুয়াশা শূকরগুলোকে নিয়ে।

কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে ভিতর থেকে বড় একটা বোতল বের করল কুয়াশা।

বোতলের ভিতর তার নিজের আবিষ্কৃত মেডিসিন। বোতলটা বের করে পাশে রাখল। ব্যাগের ভিতর থেকে এরপর সে বের করল হাইপডারমিক সিরিঞ্জ।

কুয়াশা সিরিঞ্জে ওষুধ ভরতে শুরু করল।

গুহার ভিতর ঢুকে মোড় নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে কুয়াশার পাঁচ হাত দূরে এসে দাঁড়াল তিনজন হাহা। তাদের হাতে উদ্যত বর্শা। বর্শার মাথায় লোহার তিনটে করে তীক্ষ্ণধার ফলা। ফলাগুলোর মুখে লাল রঙ লাগানো। ওগুলো শুধু রঙই নয়। লাল বিষাক্ত এক জাতীয় পাহাড়ী গাছের শিকড় থেকে যে মারাত্মক বিষ পাওয়া যায় তা মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে জিনিসিটা। এই বিষ মানুষের রক্তের সাথে মেশামাত্র যে-কোন মানুষ তৎক্ষণাৎ মারা যাবে।

এতোটুকু শব্দ হলো না।

বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাহা তিনজন। লাল টকটকে তিন জোড়া চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। একজন হাহা হিংস্র জন্তুর মত মোটা কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'গঁগ্ গঁগ্!'

চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল কুয়াশা। খাড়া হয়ে উঠল তার সর্বশরীরের লোম।

হাহারা একযোগে কুয়াশার বুক লক্ষ্য করে বর্শা চালাল বিদ্যুৎগতিতে।

চার

কুয়াশা বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় থেকে পুরো একটা ঘণ্টা গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল রাসেল। ওর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল সর্দারের কর্কশ, উচ্চকিত কণ্ঠস্বরে।

রাসেল যেখানে শুয়ে রয়েছে সেখান থেকে উঠানটা দেখতে পাবার কথা। রাসেলের ঘরের পর আরও একটা ঘর আছে। সেখানে আছেন ড. মুরকোট এবং ফোম। তারপর উঠান। সর্দার অবিরাম বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে। উঠান থেকে ভেসে আসছে তার একার গলা।

বিছানার উপর উঠে বসল রাসেল। যতটা দুর্বল সে মনে করেছিল ততটা দুর্বল বলে মনে হলো না এখন নিজেকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রাসেল।

ঘণ্টাখানেক গভীর ভাবে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাসেল। বনভূমির সবক'টা জংলীদের সর্দারকে বুঝিয়ে শুনিয়ে একত্রিত করে হাহাদেরকে আক্রমণ করলে মন্দ হয় না ভেবেছে সে। হাহারা যুগ যুগ ধরে বনভূমির জংলীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়ে আসছে। এর একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া দরকার। জংলীরা একত্রিত হয়ে হাহাদের উপর মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে হাহারা পরাজিত হতে বাধ্য। নরখাদক হাহারাদের অস্তিত্ব রাসেলের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত অবশ্যি আরও একটি কারণে নিতে বাধ্য হয়েছে

রাসেল। কুয়াশা গেছে হাহাদের এলাকায়। একা সে সেখানে গিয়ে কি করবে ভেবে কূল পায়নি রাসেল। ও ধরে নিয়েছে কুয়াশা নির্ঘাৎ হাহাদের হাতে নিহত হবে।

কুয়াশার মত প্রতিভাবান একজন স্বদেশবাসী বিজ্ঞানী একদল নরখাদক অসভ্যের হাতে নিহত হবে একথা ভাবতেই পারে না রাসেল। যেমন করে হোক হাহাদেরকে বাধা দিতে হবে। এবং কার্যকরীভাবে বাধা দিতে হলে বনভূমির সকল সক্ষম জংলীদেরকে নিয়ে আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পায়নি রাসেল।

উঠানে পা দিয়েই অবাক হয়ে পড়ল রাসেল। উৎসব-টুৎসব চলেছে নাকি জংলীদের?

দাঁড়িয়ে পড়ল রাসেল। বিরাট তোড়জোড় দেখা যাচ্ছে জংলীদের মধ্যে। ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে বোঝার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিতে শুরু করল ও।

প্রকাণ্ড উঠানের মাঝখানে বড় আকারের দুটো শ্বেত পাথর দেখা যাচ্ছে। একটি শ্বেত পাথরের উপর বসে আছে জংলীদের সর্দার। তার সারা গায়ে লাল রঙ। রঙ শুকিয়ে চকচক করছে।

সর্দার যে শ্বেত পাথরে বসে আছে তার পাশেই, পাঁচ হাত দূরে আর একটি শ্বেত পাথর। সেটার উপরও কে একজন বসে আছে। যে বসে আছে তাকে চেনার কোনও উপায় নেই। কারণ তার মাথা, কাঁধ, সর্ব শরীর উপর কচি লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

শ্বেত পাথরের পিছনে অনেকগুলো কালো পাথর। গুণল রাসেল।

মোট বাইশটা কালো পাথর পাশাপাশি ফেলা। প্রতিটি পাথরের উপর একজন করে প্রকাণ্ডদেহী লোক।

এই বাইশজন লোককেও চিনতে পারল না রাসেল। লোকগুলোর বেশভূষা এবং চেহারা দেখে বুঝতে পারল যে ওরাও জংলী। তবে এ গ্রামের জংলী নয়। বাইশজন লোকের বাইশ রকম বেশভূষা। রঙের আধিক্য তাতে বড় বেশি। অন্যান্য জংলী জাতির সর্দার নাকি ওরা বাইশজন?

কালো এবং শ্বেত পাথরগুলোর কাছ থেকে দশগজ অবধি কোন লোক নেই। দশ গজ জায়গা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে জংলীরা। তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গিও বড় বিচিত্র।

সাধারণত জংলীদেরকে খালি হাতে দেখা যায় না। কিন্তু রাসেল একজন জংলীর হাতেও কোন রকম অস্ত্র দেখতে পেল না।

অস্ত্রগুলো স্তূপীকৃত হয়ে আছে ফাঁকা দশগজ জায়গার মধ্যে। তাও বর্শা ছাড়া অন্য কোন প্রকার অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না সেখানে।

জংলীরা ভীড় করে দাঁড়ায় সাধারণত। কিন্তু রাসেল দেখল এরা পাঁচজনের এক একটি দল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটি দলের কাছ থেকে আর একটি দল দাঁড়িয়ে আছে চার পাঁচ হাত দূরে। কোন দলেই কম বেশি দেখল না রাসেল।

সর্দার বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। হঠাৎ কান পাতল রাসেল। সর্দারের কথা ও বুঝতে না পারলেও কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। যেন বিদায় ভাষণ দিচ্ছে সর্দার। সুরটা কেমন যেন উদাস। ভাবাবেগে যেন কাঁপছে সর্দারের গলা।

পা বাড়াল রাসেল। কালো পাথরগুলোর পিছনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল ও। কয়েকমুহূর্ত পর পিছন থেকে শোনা গেলঃ রহস্যময় কেস, মি. রাসেল। সমাঢান করিটে পারিবেন বলিয়া হোপ করিবেন না! মাঠা খাটাইটে খাটাইটে ঘামিয়া নাকানি চোবানি খাইটেছি...।

ঘাড় ফিরিয়ে ঠোঁটে তর্জনী রেখে ডি.কস্টাকে চুপ করার নির্দেশ দিল রাসেল। ডি.কস্টা অসন্তুষ্ট হয়ে চুপ করে গেল।

খানিক পর বক্তৃতা শেষ করে উঠে দাঁড়াল শ্বেত পাথরের উপর সর্দার। শ্বেত পাথরের উপর থেকে নেমে স্তূপীকৃত বর্শাগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। পাঁচটা বর্শা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সামনের দলের পাঁচজন জংলীর হাতে পাঁচটা বর্শা তুলে দিয়ে আবার ফিরে এল সর্দার। আবার তুলে নিল পাঁচটা বর্শা। এভাবে পাঁচটা করে বর্শা তুলে নিয়ে প্রত্যেক দলকে দিয়ে আসতে লাগল সর্দার। প্রায় পনেরো মিনিট লাগল প্রত্যেকটি দলকে বর্শা দিতে। অবশেষে শ্বেত পাথরের উপর এসে বসল সর্দার।

জংলীদের কারও মুখে কোন কথা নেই। এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। কেউ নড়ছে না একচুল। সত্যি বড় রহস্যময় মনে হলো গোটা ব্যাপারটা রাসেলের। সর্দার চিৎকার করে বলল, 'হিচকা-মিচকা তুরুপ তা না, দুমকা লুমকা কাউঠা ছা-না।'

কেউ নড়ল না। কেউ কোন কথা বলল না।

সকলে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে সর্দারের দিকে।

সর্দার আস্তে আস্তে লম্বা শ্বেত পাথরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

চমকে উঠল নিজের মনে রাসেল। সর্দারের চোখে জল। তার গাল বেয়ে জল পড়ছে শ্বেত পাথরে।

ব্যাপার কি?

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সর্দার।

আকাশের দিকে তাকাল রাসেল সর্দারের দৃষ্টি অনুসরণ করে। নির্মল, মেঘমুক্ত আকাশ। সূর্য গাছপালার আড়ালে চলে গেছে। দুটো শকুনকে শুধু উড়তে দেখল রাসেল মাথার উপর। পাশাপাশি থেকে আকাশে চক্কর মারছে শকুন দুটো।

সর্দারের বজ্রকণ্ঠ শুনে চমক ভাঙল রাসেলের। সর্দার মেঘের মত গর্জন করে বলল, 'চাগলা আগলা রিমরিম। লাললা শাওলা টিমটিম।'

অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটতে লাগল।

বর্শা হাতে সামনের জংলী দলটা তীরবেগে পা চালাল। ছুটে এল তারা

লাফিয়ে লাফিয়ে। শ্বেত পাথরের সামনে এসে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে বর্শার তীক্ষ্ণধার ফলা সবেগে ঢুকিয়ে দিল তারা সর্দারের বুকে।

পাঁচটা বর্শা সর্দারের বুকের চারদিকে গেঁথে গেল। হেঁচকা টান দিয়ে একযোগে বর্শা পাঁচটা খুলে নিয়ে পাঁচজনার দলটা ছুটে চলে গেল নিজেদের জায়গায়। কালবিলম্ব না করে ছুটে এল দ্বিতীয় দলটা।

পাঁচটা বর্শার আঘাত খেয়েই ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে জংলী সর্দারের।

পাঁচ

আকাশের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেছে সর্দারের চোখ দুটোর কালো মণি জোড়া।

রক্তাক্ত শ্বেত পাথরের উপর নিঃসাড় পড়ে আছে তার দেহটা। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম—একের পর এক দল বর্শা উঁচিয়ে ছুটে আসছে।

দেখতে দেখতে সর্দারের অতবড় দেহটা আর চেনার কোন উপায় রইল না। একদলা মাংসপিণ্ড পড়ে রয়েছে শ্বেত পাথরের উপর। সেই মাংসপিণ্ডের উপরই বর্শা গাঁথছে জংলীরা। বর্শার ডগায় আটকে যাচ্ছে মাংসের, হাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো। শ্বেত পাথরের উপর থেকে কমছে একটু একটু করে দলা পাকানো মাংসপিণ্ড। প্রায় পঞ্চাশটা দল বর্শার আঘাত হানল একই নিয়মে।

বর্শাঘাত হানার শেষে দেখা গেল শ্বেত পাথরে সের দুয়েক মাত্র মাংস অবশিষ্ট আছে।

জংলীরা যে-যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে চারদিকে। কোথাও কেউ এতটুকু নড়ছে না।

আচমকা উপস্থিত শত শত জংলী গান গেয়ে উঠল।

'ইচাকা ইচাকা হিচকো সাউনা, তোপরা তোপরা কাউলা বাউনা…।'

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গাইছে জংলীরা সমস্বরে। রাসেল লক্ষ্য করল কালো বাইশটা পাথরের উপর বসা জংলী সর্দাররা গানের সুরে ঠোঁট নাড়ছে না! লতাপাতা ঢাকা শ্বেত পাথরে বসা অপর লোকটি গাইছে কি না বোঝার উপায় নেই।

গান থামল খানিক পর।

গান থামার সাথে সাথে লতাপাতায় ঢাকা শ্বেত পাথরের উপর বসা লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। লতাপাতা খসে খসে পড়ল তার গা থেকে।

জংলীরা একযোগে উল্লাসধ্বনি করে উঠল। বর্শাধারী জংলীর প্রথম দলটাকে আবার ছুটে আসতে দেখল রাসেল।

কেঁপে উঠল রাসেলের বুক।

পাঁচজনের দলটা ছুটে এসে শ্বেত পাথরের সামনে দাঁড়াল। বর্শাগুলো তারা

শ্বেত পাথরের নিচে ফেলে আবার ছুটে চলে গেল নিজেদের জায়গায়। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পরবর্তী সব দলের পালা।

রাসেল অনুমান করল দ্বিতীয় শ্বেত পাথরে যে সুঠাম দেহের অধিকারী যুবকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সে বর্তমানে এই গ্রামের জংলীদের সর্দার। সর্দারকে বরণ করছে জংলীরা।

জংলীরা নতুন সর্দারের পায়ের কাছে বর্শা জমা দিয়ে যে যার জায়গায় ফিরে গেল।

নতুন সর্দার জংলীদের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। প্রতিটি জংলীর উপর দৃষ্টি পড়ছে তার। গর্বে তার বুক ফুলে উঠেছে। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে গভীর দায়িত্ব সচেতনতার ভাব। জংলীদের দিক থেকে দৃষ্টি ফেলল সে ঘাড় ফিরিয়ে রাসেলের দিকে।

নতুন সর্দার হাসল রাসেলের চোখে চোখ রেখে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সে তাকাল জংলীদের দিকে। পরমুহূর্তে বক্তৃতা দিতে শুরু করল সে।

মিনিট তিনেক এক নাগাড়ে বক্তৃতা দেবার পর থামল নতুন সর্দার। জংলীরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। এতক্ষণ পাঁচজন পাঁচজন করে সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। এবার দল ভেঙে গেল।

শ্বেত পাথরের উপর থেকে নিচে নামল নতুন সর্দার। একদল জংলী তার শ্বেত পাথরটা তুলে নিয়ে গিয়ে কালো বাইশটা পাথরের সামনে রাখল।

মৃত সর্দারের শ্বেত পাথরটা সরিয়ে নিয়ে গেল জংলীরা।

নতুন সর্দার অন্যান্য জংলীদের মুখোমুখি বসেছে। একদল যুবক নিয়ে আসছে শূকরের পোড়ানো রান, ভাল্লুকের ঝলসানো সিনা, বন্য মুরগী এবং পাখির রোস্ট।

নতুন সর্দার ঘাড় ফিরিয়ে রাসেলের দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। হাত নেড়ে ডাকল সে।

এগিয়ে গেল রাসেল।

পাশে বসতে বলল সর্দার রাসেলকে। শ্বেত পাথরের উপর, নতুন সর্দারের পাশে বসল রাসেল।

সর্দার ঝকঝকে দাঁত বের করে হঠাৎ ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে ইংরেজিতে বলে উঠল, 'তোমার বান্ধবী কেমন আছে?'

অবাক হলো রাসেল। মাথা নেড়ে ও বলল, 'ফোম ঘুমাচ্ছে। তুমি ইংরেজি জানো?'

'জানি একটু একটু। ড. মুরকোটের সাথে সাথে থাকতাম কিনা। আমার নাম মোনজা। জোনজা আমার ছোট ভাই ছিল। ওর বন্ধু ছিল ফোম। এখন তুমি ফোমের বন্ধু। ছোট ভাইয়ের বন্ধু ছিল বলে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমি বড় ভাই হয়ে ফোমের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারি না। সে নিয়ম যদি থাকত তাহলে তোমাকে

আমি খুন করতাম—না, খুন করতাম না, খুন করা আজ থেকে আমাদের মধ্যে পাপ বলে মনে করা হবে—তোমাকে তাড়িয়ে দিতাম আমাদের গ্রাম থেকে। তারপর ফোমকে বন্ধু করে নিতাম। কিন্তু নিয়ম তা নয়। তাই ফোমের সাথে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। তুমিই ওর বন্ধু থাকো। তুমি আমারও বন্ধু। রাজি?'

সপ্রতিভ ভাবে এতগুলো কথা মন খুলে বলে আবার সাদা দাঁত বের করে হাসল মোনজা।

রাসেলও হাসল। বলল, 'তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমি খুব খুশি। কিন্তু একটু আগে যা ঘটে গেল তার ব্যাখ্যা আমাকে জানাতে পারো, বন্ধু?'

'জানাতে পারি। আমার বাবা অর্থাৎ আমাদের সর্দার আমাকে বলে গেছেন কোন সমস্যা দেখা দিলে তোমার সাথে পরামর্শ করতে।'

'তোমার বাবাকে হত্যা করা হলো কেন?'

মোনজা হাসছে। এতটুকু মলিন দেখাচ্ছে না তাকে। এতটুকু দুঃখিত মনে হচ্ছে না।

বলতে শুরু করল সে, 'আমাদের জংলীদের নিয়ম বড় কড়া, বন্ধু। শোনো তবে। আমাদের মধ্যে যে সব আইন, নিয়মকানুন ইত্যাদি যুগ যুগ ধরে চালু আছে তা পরিবর্তন বা উঠিয়ে নেয়া খুব কঠিন। কোন আইন বাতিল করার ক্ষমতা কারও নেই একমাত্র সর্দার ছাড়া। তাও সর্দারও পারেন না আইন বাতিল করতে। যদি করেন তাহলে সর্দারের পদ থেকে পদত্যাগ করে উত্তরাধিকারীর হাতে সর্দারীর দায়িত্ব দিয়ে নিজের প্রাণ স্বইচ্ছায় দান করতে হয়। কিন্তু সর্দাররা নিজেদের প্রাণ হারাতে চান না বলে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত আইন বহাল আছে আমাদের মধ্যে। আইন বাতিল করার মত দুঃসাহসী সর্দার শত বছরে, হাজার বছরেও একজন জন্মগ্রহণ করে কিনা সন্দেহ। আমার বাবা সৎসাহসী। তিনি আপনার ভাই, আমাদের দেবতার নির্দেশ মত, মৃত্যুদণ্ডের আইন বাতিল ঘোষণা করেছেন।

গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিহত সর্দারের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করল রাসেল। অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলতে পারল না।

খাওয়া-দাওয়া শুরু হলো।

সর্দারের অপর পাশে এসে অযাচিত ভাবে বসল ডি.কস্টা। জংলী সর্দাররা যা খাচ্ছে সে-ও তা মহা উৎসাহে উদরস্থ করতে লেগে গেছে তৎপরতার সাথে। রাসেল বুনো মুরগীর রোস্ট বেছে নিয়ে আস্তে আস্তে খাচ্ছে।

খেতে খেতে নিমন্ত্রিত অন্যান্য বাইশজন জংলী-সর্দারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল মোনজা। জংলী সর্দাররা মোনজার মাধ্যমে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। একজন জংলী সর্দার জানতে চাইল জংলীদের মধ্যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে রাসেল।

রাসেল উত্তরে বলল, 'হাহাদেরকে উচিত শাস্তি দিতে।'

জংলী সর্দাররা উৎসাহিত হয়ে উঠল। হাহাদের উপর সব সর্দারই খাপ্পা। কোন

সর্দার জানাল প্রতি মাসে গড়ে প্রায় পঁচিশজন লোককে ধরে নিয়ে যায় হাহারা গ্রাম থেকে।

হাহাদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অনেক গল্প বলল সর্দাররা। রাসেল এক ফাঁকে বলল, 'হাহাদেরকে উচিত শাস্তি ইচ্ছা করলে জংলীরাই দিতে পারে। এমন শাস্তি ইচ্ছা করলে জংলীরা হাহাদেরকে দিতে পারে যার ফলে চিরকালের জন্যে হাহারা জংলীদের কথায় উঠবে, বসবে। গোলাম হয়ে থাকবে তারা জংলীদের। জংলীরা এক জোট হলেই তা সম্ভব।

একজোট হতে রাজি হয়ে গেল সর্দাররা। তারা চেপে ধরল রাসেলকে একটা উপায় বের করে দেবার জন্যে, যাতে করে হাহাদের হাত থেকে তারা স্থায়ীভাবে রেহাই পেতে পারে।

রাসেল সর্দারদের সাথে গঠনমূলক আলোচনায় রত হলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল গভীর শলাপরামর্শ।

সর্দাররা রাসেলের পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত সানন্দে গ্রহণ করল।

মোনজা তার জংলীদেরকে প্রস্তুত হতে বলল যুদ্ধযাত্রার জন্যে। অন্যান্য সর্দাররা ঘোড়া ছুটিয়ে যে-যার গ্রামের দিকে চলে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পনেরো-বিশ হাজার সশস্ত্র জংলীকে নিয়ে ওরা বাইশ জনই ফিরে আসবে। তারপর রাসেলের নেতৃত্বে তারা সবাই হাহাদেরকে আক্রমণ করার জন্যে রওনা হবে।

বাইশজন সর্দার চলে যাবার পর রাসেল মোনজাকে বলল, 'আমাদের এই গ্রামের মেয়েদেরকেও যেতে হবে যুদ্ধে। যুদ্ধ যে তাদেরকে করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। তবে মেয়েরা হলো জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ওরা সঙ্গে থাকলে যোদ্ধাদের মনোবল বাড়বে, দেখতেও বেশি মনে হবে সংখ্যায়।'

সানন্দে রাজি হলো মোনজা। ঠিক হলো মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা-চওড়া, মোটা, ভারী এবং শক্তিশালী মেয়ে ত্রিশ বছর বয়স্কা কালাকুলার অধীনে মেয়েরা যুদ্ধে যাবে।

কালাকুলা সত্যি দশাসই মেয়ে। প্রকাণ্ড দেহ তার। হাতির মত পা। বড় বড় চোখ। লম্বাও সে খুব। তার মতো মেয়ে জংলীদের মধ্যে আর একজনও নেই। অনেক পুরুষও তার সাথে শক্তি পরীক্ষায় পারে না। ত্রিশ বছর বয়স হলেও জংলীদের কোনও পুরুষ তাকে বিয়ে করতে সাহসী হয়নি। শেষ অবদি ডি. কস্টা তাকে অন্য বারোজন মেয়ের সাথে বিয়ে না করলে চিরকাল কালাকুলা অবিবাহিতাই থেকে যেত।

ডি.কস্টার তেরোজন নতুন বউদের মধ্যে কালাকুলাও একজন।'

ডি.কস্টা কথাটা শুনে পাটখড়ির মত পা দুটো নিয়ে ছুটল স্ত্রীকে সুখবরটা দিতে। তার বিবাহিত একজন স্ত্রী গোটা জংলীদের মেয়ে সমাজকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করবে এ কি কম গর্বের কথা!

কালাকুলা তার আর সব সতীনদেরকে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে নেকড়ের কলজে সিদ্ধ খাচ্ছিল। ডি.কস্টা ক্যাঙ্গারুর মত লাফাতে লাফাতে ঘরের ভিতর ঢুকে নতুন রপ্ত করা জংলীদের ভাষায় হড়বড় করে সুসংবাদটা প্রচার করে দিল।

স্বামীর কথা শুনে নেকড়ের সিদ্ধ কলজে হাতে উঠে দাঁড়াল কালাকুলা। বুক উঁচু করে পাঁচবার উঠল আর বসল। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার শরীরটা একটু দলাইমলাই করে দাও দেখি।'

ডি.কস্টা বলে উঠল, 'ব্যায়াম করিয়া কুছ ফায়দা হোবে না, মাই ডিয়ার। যুদ্ধে ফিজিক্যাল শক্তি বিশেষ ডরকার নাই। চলো, টোমাকে হামি রাইফেল চালনা শিখাইয়া ডিই।'

ঘরের কোণ থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে এসে কালাকুলার একটা হাত ধরে আকর্ষণ করল ডি. কস্টা।

রাইফেল দেখে ভয়ে ডি. কস্টার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সরে গেল কালাকুলা।

'ভয় পাইটেছ কেন…?'

ডি. কস্টা আবার এগিয়ে গেল কালাকুলাকে ধরার জন্যে। কালাকুলা হঠাৎ ধাক্কা মারল ডি. কস্টাকে।

ধাক্কা খেয়ে রোগা পটকা ডি. কস্টা ছিটকে পড়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল কালাকুলা।

রাগে চেঁচিয়ে উঠল ডি. কস্টা, 'ইহার ফল ভাল হইবে না বলিয়া ডিটেছি। হামি টোমাকে ডাইভোর্স করিব, ফর গডস সেক…!'

উঠে বসার চেষ্টা করল ডি. কস্টা। কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা লাগায় তা সে পারল না। তার অন্যান্য স্ত্রীরা সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে দেখে সে চিৎকার করে উঠল, 'ডুর হইয়া যাও টোমরা হামার সম্মুখ হইটে! বেয়াড়া, আনসিভিলাইজড, ডুষ্টু ওয়াইফ যত্তো সব। হামার ফোরহেডে এমনও ছিল…।'

ছয়

বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। চোখের পলক পড়তে না পড়তে তিন হাত দূরে সরে গেল সে।

হাহাদের বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। মাত্র দশ সেকেণ্ড সময় পেল কুয়াশা। বিমূঢ় হাহারা নতুন করে তাল সামলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করার অবসর পেল না। কুয়াশা উঠে দাঁড়িয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনের উপর।

একজন শত্রুর বাহুতে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করাবার সাথে সাথে দ্বিতীয় লোকটার তলপেটে সবেগে লাথি মারল সে।

লাথি খেয়ে গুহার দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল লোকটা। ঝুপ করে পড়ল সে মেঝেতে।

তৃতীয় শত্রু বর্শা তুলেছে মাথার উপর। কুয়াশার বুক লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করার আগেই বিদ্যুৎবেগে বর্শাটা ধরে হেঁচকা টান মারল কুয়াশা।

তাল হারিয়ে ছুটে এল তৃতীয় শত্রু কুয়াশার দিকে। গায়ের সাথে ধাক্কা লাগার আগেই কুয়াশা ডান হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার কপালের পাশে। এক ঘুসিতেই অসংখ্য শর্ষে ফুল ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। ছিটকে পড়ল গুহার দেয়ালের কাছাকাছি।

প্রথম শত্রুর বাহুতে সিরিঞ্জ ফুঁড়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছে কুয়াশা। জ্ঞান হারিয়েছে সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

জ্ঞান হারিয়েছে তিনজনই।

অজ্ঞান প্রথম শত্রুর কপালের পাশে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল কুয়াশা। ইঞ্জেকশন দেয়ায় সাময়িক ভাবে জ্ঞান হারালেও খানিক পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করবে সে ওষুধের গুণে। ঘুসি মারার ফলে জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে লোকটার।

ব্যাগ থেকে তুলো বের করে তিন অচেতন শত্রুর মুখের ভিতর খানিকটা করে তুলো ভরে দিয়ে কাপড় দিয়ে বাইরে থেকে বেঁধে দিল কুয়াশা। একজন শত্রুর পোশাক খুলে নিল সে। নিজের পোশাক খুলে লাল রঙ করা নেকড়ের ছাল কোমরে পরে নিল দ্রুত! হাহাদের মাথা কামানো। কুয়াশা ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের চওড়া একটা জিনিস বের করল। সেটা মাথায় পরল সে। কে বলবে তার মাথায় চুল আছে। কুয়াশার মাথা এখুনি যেন কেউ কামিয়ে দিয়েছে।

হাহাদের নিখুঁত ছদ্মবেশ নিতে আরও দশ মিনিট খরচ করল কুয়াশা। ছদ্মবেশ নেয়া শেষ হতে শূকরগুলোর উরুতে সিরিঞ্জ ফুঁড়ে ইঞ্জেকশন দিতে শুরু করল ও। প্রত্যেকটি শূকরের দেহে ইঞ্জেকশন দেয়া শেষ হতে দেখা গেল শূকরগুলো জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে আছে গুহার মেঝেতে।

শূকরগুলোর গলার বাঁধন খুলে দিল কুয়াশা। ব্যাগ থেকে একটা ক্ষুদ্র মিনি ওয়্যারলেস সেট এবং যাবতীয় দরকারী জিনিস সে নেকড়ের ছালের ভিতর, কোমরে গুঁজে নিল। তারপর বেরিয়ে এল সতর্ক চোখে চারদিকে দেখতে দেখতে গুহার বাইরে।

গুহার বাইরে বেরিয়ে কুয়াশা দেখল আশপাশে কেউ নেই। খানিকটা দূরে দূরে গুহা। গুহার ভিতরে বাইরে হাহারা যে-যার কাজে ব্যস্ত। কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই।

সূর্য ঢলে পড়েছে। খানিক পরই অদৃশ্য হয়ে যাবে দিগন্ত রেখা অতিক্রম করে।

গুহা থেকে বেরিয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল কুয়াশা পাথর কাটা সিঁড়ির ধাপ টপকে টপকে।

গুহার কাছ থেকে প্রায় পঁচিশ গজ উপরে উঠে কুয়াশা অদূরে দেখল একটি

গুহা। গুহার বাইরে কয়েকজন হাহা কি যেন খাচ্ছে। কুয়াশাকে দেখে তারা হাতের খাবার দেখিয়ে কাছে ডাকল।

সামনে যাওয়া কি উচিত হবে? ভাবল কুয়াশা। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে যদি তার ছদ্মবেশ ধরে ফেলে? সে যে হাহাদের একজন নয় তা সহজেই বুঝতে পারবে ওরা।

ছদ্মবেশ ধরতে না পারলে ভয়ের কিছু নেই। হাজার-হাজার হাহাদের মধ্যে সবাই কি আর সবাইকে চেনে, সকলের চেহারা কি সকলে মনে করে রাখে?

ডাকছে লোকগুলো। না গেলে হয়তো সন্দেহ করবে।

সিঁড়ি ছেড়ে চওড়া সমতল পথ ধরে সেদিকে পা বাড়াল কুয়াশা।

দু'পা এগোতেই শব্দ এল পিছন থেকে। সতর্ক, সন্দিহান হয়ে উঠল কুয়াশা। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবার অবসরও পেল না সে।

একটা বর্শার ফলা কুয়াশার উরুর পিছনে খোঁচা মারল। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল কুয়াশা। একজন হাহা বর্শা হাতে পিছন পিছন আসছে। নোংরা দাঁত বের করে হাসছে সে। নেকড়ের ছাল কুয়াশার শরীরে ছোট হয়েছে বলে বর্শার খোঁচা মেরে ঠাট্টা করেছে হাহাটা। কুয়াশার পাশে চলে এল সে। সৌভাগ্যক্রমে কোন কথা জিজ্ঞেস করল না লোকটা কুয়াশাকে।

পাশাপাশি হেঁটে গুহাটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা দুজন। গুহার সামনে চার-পাঁচজন হাহা পাহাড়ী হরিণের কাবাব তৈরি করে খাচ্ছে। ওদের দুজনের দিকে দুটো এক সের ওজনের মাংসের টুকরো তুলে দিল একজন হাহা।

কুয়াশার সাথে যে হাহাটা এসেছিল সে মাংস নিয়ে দাঁড়াল না। খেতে খেতে হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে। কুয়াশাও তাই করল। লোকটাকে অনুসরণ করে চলল সে।

কিন্তু লোকটা দ্রুত হাঁটছে। কুয়াশা ইচ্ছে করেই আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে। কান পেতে রইল সে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পরই প্রত্যাশিত শব্দ কানে এল কুয়াশার। একপাল শূকর গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।

আশপাশের হাহারা অবাক হয়ে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ল কুয়াশা। সে-ও তাকাল শব্দ লক্ষ্য করে।

এক মুহূর্ত পরই দেখা গেল গুহার ভিতর থেকে একটা দুটো করে শূকর বেরিয়ে আসছে চেঁচাতে চেঁচাতে।

আধ মিনিটের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল হাহাদের মধ্যে। জোর গলায় হাসছে কেউ কেউ। কেউ বর্শা নিয়ে ছুটছে শূকর শিকার করার জন্যে। কেউ কেউ একে ওকে জিজ্ঞেস করছে হঠাৎ এতগুলো শূকর কোথা থেকে এল।

প্রশ্নটা নিয়ে হাহারা খুব একটা মাথা ঘামাল না! দলে দলে তারা বর্শা নিয়ে ছুটল শূকর শিকার করবে।

সুযোগটা হাত ছাড়া করল না কুয়াশা। হাহাদের দেখাদেখি সে-ও তার বর্শা

উঁচিয়ে শূকর শিকার করতে শুরু করল। মিনিট তিনেক একটা শূকরের পিছনে ছুটে সেটাকে বিদ্ধ করল কুয়াশা।

অন্যান্যদের দেখাদেখি নিহত শূকরটাকে কাঁধে নিয়ে চওড়া সমতল রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চলল কুয়াশা।

সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের নিচে নামল কুয়াশা। কাঁধে সদ্য শিকার করা শূকর নিয়ে প্রকাণ্ড একটা গুহার ভিতর ঢুকছে সবাই। কুয়াশাও ভিতরে ঢুকল।

বিরাট বিশাল গুহাটা।

গুহার ভিতরে ধোঁয়া। চোখ জ্বালা করতে লাগল কুয়াশার অনভ্যাসে। তবু বেরিয়ে এল না সে ভিতর থেকে। চারদিকে লোকজন দেখল ও। একদিকে শূকর, ভাল্লুক, ক্যাঙ্গারু, পাহাড়ী হরিণ, ছাগল জবাই করা হচ্ছে। ছাল ছাড়ানো হচ্ছে আর এক দিকে। ছাল ছাড়াবার পর আগুনে ঝলসানো হচ্ছে জানোয়ারগুলোকে। একের পর এক শূকর নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছে হাহারা। সকলে খুশিতে ফেটে পড়ছে শূকর দেখে। ভাগ্য আজ হঠাৎ সুপ্রসন্ন। অনেকগুলো শূকর অযাচিত ভাবে মিলে গেছে।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এল কুয়াশা। বাইরের হাহারা প্রায় উৎসব শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। আজ ভুরি-ভোজন হবে।

হাঁটতে হাঁটতে বর্শার ফলা শান দিচ্ছে যেখানে একদল লোক সেখানে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। সেখান থেকে এক মিনিট পর পা বাড়াল সে।

এক জায়গায় প্রায় আশি নব্বুই জন হাহা ব্যায়াম করছে—সব জায়গায় একবার করে গেল কুয়াশা হাঁটতে হাঁটতে। যেখানে কিছু লোকের ভীড় দেখল সেখানেই গিয়ে কিছুক্ষণ করে দাঁড়াল।

একটা পুকুরে সাঁতার কাটছে মেয়ে-পুরুষ একত্রে। পুকুরের পাড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াল কুয়াশা।

সন্ধ্যার পর আরও একটা পুকুর দেখতে পেল কুয়াশা। কিন্তু সেটায় কেউ নামেনি। সেটার পারে গিয়ে দাঁড়াতে কুয়াশা অবাক হয়ে গেল। পানির বদলে পুকুরে রয়েছে অপরিশোধিত তেল।

কুয়াশা বুঝতে পারল পাথরের নিচে তেলের খনি আছে। এই পুকুর কৃত্রিম পুকুর নয়।

এই তেল প্রচুর পরিমাণে আছে বলেই মশাল জ্বেলে গোটা এলাকাটা লালচে আলোয় আলোকিত করে রাখতে পেরেছে হাহারা।

গোটা এলাকাটা ঘুরে ফিরে দেখতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগল কুয়াশার।

হাহারা যে পাহাড় শ্রেণীর উপর রাত্রি যাপন করে তার সামনের দিকে মরুভূমি। মরুভূমির অপর দিকে, মাইল খানেকেরও কম দূরে, মুখোমুখি আবার পাহাড় শ্রেণী। সেখানে হাহারা রাত্রি যাপন করে না। সেখানে দিনের বেলায় তারা যায় যুদ্ধ-বিদ্যা শিখতে।

গোটা এলাকাটা ঘুরে দেখে কুয়াশা অনুমান করল হাজার পাঁচেক লোক সব মিলিয়ে হাহারা।

বন্দীদের গুহার সামনেও গেল একবার কুয়াশা। বন্দীদের কয়েকজনকে দেখে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে।

বিশ্ববিখ্যাত ইন্দোনেশিয়ান বিজ্ঞানী সুর্জানা বছরখানেক আগে গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমিতে ক্যানবেরায় একটা সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার সময় প্লেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গেছেন বলে শুনেছিল কুয়াশা। বন্দীদের মধ্যে বৃদ্ধ সুর্জানাকেও দেখল সে তাঁর সাথে রয়েছেন ইরাকের কেমিস্ট হাসান আল ইয়াজদি। বয়সে তরুণই বলা চলে ইয়াজদিকে। সুর্জানার সাথে প্লেনে সে-ও ছিল। বন্দীদের আর কাউকে চিনতে পারল না কুয়াশা।

কুয়াশা বন্দীদের গুহার সামনে থাকার সময়ই একদল হাহা ভিতরে ঢুকল। তারা ইয়াজদিকে ধরে বের করে আনল গুহার ভিতর থেকে।

গুহা থেকে ইয়াজদিকে বের করে হাহারা তাঁকে বেঁধে ফেলল জন্তুর সরু চামড়া দিয়ে। তারপর তাঁকে সিঁড়ির উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল নিচের দিকে।

কি ভেবে হাহাগুলোকে অনুসরণ করল কুয়াশা।

সাত

এলাকার সবচেয়ে বড় পাহাড়টার বৈশিষ্ট্য আগেই লক্ষ করেছিল কুয়াশা। পাহাড়ের পাদদেশে প্রকাণ্ড একটা গুহামুখ। এই গুহার ভিতর হরদম হাহারা যাচ্ছে আর আসছে।

উলঙ্গ হাহাদের একজনকেও গুহার ভিতর ঢুকতে বা বের হতে দেখেনি কুয়াশা। গুহার ভিতর যারা ঢুকছে বা বের হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের পরনে নেকড়ের ছাল।

ইয়াজদিকে নিয়ে হাহা কজন সেই পাহাড়টার গুহার দিকেই চলেছে। কুয়াশা পিছু পিছু যেতে অনুমান করল হাহাদের রাজা বা সর্দার হয়তো গুহার ভিতরই থাকে।

গুহার ভিতর হাহারা প্রবেশ করল ইরাকী কেমিস্ট ইয়াজদিকে নিয়ে। খানিক পর কুয়াশাও প্রবেশ করল। গুহা মুখের ভিতর প্রবেশ করেই ভুল ভাঙল তার।

গুহামুখ বলে যেটাকে ভুল করেছিল কুয়াশা সেটা আসলে প্রকাণ্ড এক সুড়ঙ্গের মুখ। সোজা চলে গেছে সুড়ঙ্গটা বহুদূর অবধি।

সুড়ঙ্গের মেঝে শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো।

দেয়ালে দেয়ালে পাথর খুদে তাতে নানারকম রঙ লাগিয়ে আঁকা হয়েছে নানা প্রকার জীব-জ্যানোয়ারের ছবি।

সুড়ঙ্গ পথটা খুবই চওড়া। পথের দু'ধারে পাথরের উঁচু আসন। সেখানে

হাহারা বসে গল্প করছে। হাসাহাসি করছে।

ইয়াজদিকে নিয়ে হাহারা এগিয়ে চলল।

প্রায় পঞ্চাশ গজ সোজা যাবার পর মোড় নিল হাহারা। কুয়াশাও মোড় নিয়ে ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে চলল। বড় বড় পাথরের পাত্রে একদল হাহা তরল পানীয় নিয়ে যাচ্ছে ভিতর দিকে। লোহার শিকে বিদ্ধ শূকরও বয়ে নিয়ে চলেছে অনেকে। এই মাত্র আগুনের আঁচ থেকে তুলে আনা হয়েছে ওগুলোকে।

মিনিট খানেক পর রাস্তার শেষ মাথায় এসে পৌছুল কুয়াশা। সামনে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড একটা দরজা। দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে হাহারা বন্দী ইয়াজদিকে নিয়ে।

ভিতরে প্রবেশ করল কুয়াশা।

প্রকাণ্ড একটা গোল সভাগৃহের মত দেখতে জায়গাটা। অনেক উঁচুতে পাথরের ছাদ, গম্বুজওয়ালা মসজিদের ভিতরটা যেরকম দেখতে অনেকটা সেরকম জায়গাটা। আকারে প্রকাণ্ড। প্রায় শ' পাঁচেক বা তারও বেশি লোক বসে আছে ভিতরে।

হাহারা বসে বসে মাংস এবং মদ খাচ্ছে। সভাগৃহের মাঝখানে ছোট একটা মঞ্চ। সেখানে উলঙ্গ কয়েকজন যুবতী নাচছে। ঢাক ঢোল পেটাচ্ছে একদল হাহা মঞ্চের নিচে।

সভাগৃহের সর্বশেষ প্রান্তে উঁচু আর একটা মঞ্চ। সেই মঞ্চে বসে আছে তিনজন। তিনজনের মধ্যে একজন মেয়ে।

মেয়েটির বয়স খুব কম। বড় জোর উনিশ কি কুড়ি বছরের হবে। তার নিম্নাঙ্গে এবং উর্ধ্বাঙ্গে নেকড়ের ছাল। লাল এবং নীল রঙে রাঙানো। গর্বিত ভঙ্গিতে সোনা দিয়ে তৈরি উঁচু একটা সিংহাসনে বসে আছে সে। তার ডান পাশে একজন দীর্ঘকায় যুবক হাহা।

কুয়াশা অনুমান করল, যুবকটি হলো হাহাদের রাজা। পাশের মেয়েটি তার স্ত্রী—রানী।

রানীর বাঁ দিকে বসে আছে আর একজন লোক। লোকটার উপর চোখ পড়তে চমকে উঠল কুয়াশা।

লোকটা শ্বেতাঙ্গ। চিনতে এতটুকু অসুবিধে হলো না কুয়াশার।

পরিষ্কার বুঝতে পারল এখানে থাকা নিরাপদ নয়। কিন্তু বন্দী ইয়াজদিকে নিয়ে হাহারা কি করে না দেখে এখান থেকে বেরিয়ে যাবারও ইচ্ছা করল না তার।

গা-ঢাকা দেবার চেষ্টায় সভাগৃহের এক কোণায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা।

মঞ্চের কাছে উঁচু একটা পাথরের উপর নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে হাসান আল ইয়াজদিকে।

দু জন হাহা ধারাল খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। তারা তাকিয়ে আছে রাজার দিকে। রাজার আদেশ পেলেই ইয়াজদির গলায় খাঁড়া মেরে মুণ্ডু আর ধড় আলাদা করে ফেলবে।

নরবলি দেয়ার রেওয়াজ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে হাহাদের মধ্যে। প্রতি রাতে একজন করে বিদেশীকে বলি দেযা হয় রাজার সামনে। ব্যতিক্রম নেই এর।

ডেভিড রাজার কানে কানে কি যেন বলছে লক্ষ করল কুয়াশা। তাকে কি ডেভিড চিনে ফেলেছে?

ডেভিডের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে যুবক রাজা। ডেভিডের কথা শেষ হলো। কথা শেষ করে ডেভিড তাকাল ইয়াজদির দিকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল কুয়াশা। ডেভিড তাকে চিনতে পারেনি। তা যদি চিনত তাহলে রাজার কানেকানে কথা বলার পর সরাসরি তাকাত সে কুয়াশারই দিকে।

রাজা ইঙ্গিতে ডাকল দুজন হাহাকে। তাদের কানে কানে কি যেন বলল সে।

হাহা দুজন মঞ্চ থেকে নেমে এল। তারা নেমে আসতেই একদল হাহা তাদের দুজনকে ঘিরে ধরল। তারা অন্যান্য হাহাদেরকে কি যেন বলল। বলে উঠে গেল দুজনেই আবার মঞ্চে।

হাহাদের দলটি এবার সরাসরি তাকাল কুয়াশার দিকে। কুয়াশা প্রথম থেকে লক্ষ করছিল গোটা ব্যাপারটা। হাহারা তার দিকে তাকাতেই সে বুঝতে পারল ডেভিড তাকে চিনে ফেলেছে।

হাহারা দ্রুত এগিয়ে আসছে কুয়াশার দিকে।

পালাবার কথা ভাবল কুয়াশা। কিন্তু পালানো যে সম্ভব নয় তা সে বুঝতে পারল। সভাগৃহের সর্বত্র সশস্ত্র হাহারা রয়েছে। কিভাবে, কোন পথে পালাবে সে? তার চেয়ে ধরা পড়ে বন্দী হয়ে দেখা যাক কি ঘটে।

নিজের জায়গায় শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। যেন কিছুই সে জানে না।

দ্রুত হাহাদের একটি দল কুয়াশার কাছে এসে ঘিরে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে কৃত্রিম বিস্ময়ে প্রত্যেকের দিকে তাকাল কুয়াশা।

হাহাদের একজন দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন দ্রুত বলে উঠল। লোকটার কথার একটা বর্ণও বুঝতে পারল না কুয়াশা। ভাষা বুঝতে না পারলেও উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় তার। কেউ ওর শরীর স্পর্শ করার আগেই পা বাড়াল ও মঞ্চের দিকে।

দৃঢ় পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল কুয়াশা। হাহারা চারপাশ থেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল তাকে।

চারটে ধাপ টপকে মঞ্চের ভিতর উঠে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। সরাসরি রাজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কুয়াশার প্রকাণ্ড পেশীবহুল শরীরের দিকে তাকিয়ে থেকে রাজা ডেভিডের উদ্দেশে নিজস্ব ভাষায় কি যেন বলল।

ডেভিড কুয়াশার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'আপনি ধরা পড়ে গেছেন, ড. কুয়াশা। তবে আপনার সাহসের প্রশংসা··· ।'

কুয়াশা তাকাল ডেভিডের দিকে।

ডেভিড হাসছে ব্যঙ্গভরে। হাসতে হাসতে সে বলে উঠল, 'শুনেছিলাম আপনি সাহসী পুরুষ। কিন্তু এতটা ভাবিনি। মৃত্যুকে আপনি বুঝি ভয় পান না?'

কুয়াশা গুরু গম্ভীরভাবে বলল, 'না, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আমার মৃত্যুর কথা ভাবছি না। ভাবছি তোমার মৃত্যুর কথা।'

'আমার মৃত্যুর কথা!'

কথাটা বলে সশব্দে হেসে উঠল ডেভিড। হাসি থামিয়ে সে বলল, 'আপনি তো বেশ লোক, ড. কুয়াশা! মৃত্যু আপনার অবধারিত জেনেও এমন রসিকতা করতে পারছেন। সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার। আসলে এক নম্বরের বোকা আপনি। সাহস দেখিয়ে বাহাদুরী করার লোভে আপনি হাহাদের মধ্যে এসে পড়েছেন বুঝতে পারছি। এদেরকে আপনি চেনেন না। চিনলে এ সাহস আপনার হত না। না চিনলেও একটু পরই চিনতে পারবেন। আফশোস, তখন আর আপনার কিছু করার থাকবে না। যাকগে, আপনার দুর্ভাগ্যের জন্যে আপনিই দায়ী—আমাদের কিছু করার নেই। তা বুড়ো মূরকোট কেমন আছে? তার সুপারম্যান কি ত্রুটি-মুক্ত হয়েছে?'

যুবতী রানী কুয়াশার দিকে সপ্রশংসদৃষ্টিতে তাকিয়ে রাজার উদ্দেশে কি যেন বলছে লক্ষ করল কুয়াশা।

কুয়াশা বলল, 'ড. মূরকোটের সুপারম্যান সম্পর্কে তোমার কোন কৌতূহল থাকা উচিত নয়, ডেভিড। ড. মূরকোট একজন বিজ্ঞানী, আর তুমি একজন শয়তান। আমার লেসার গানটা কোথায় রেখেছ?'

'লেসার গান?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ডেভিড।

'হ্যাঁ। যেটা একজন বিশ্বাসঘাতক তোমার হাতে দিয়েছিল চুরি করে। পালাবার সময় যেটা তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ। ওটা বন্দুক বা রাইফেল নয়, ওটা লেসার গান। আমার নিজের তৈরি। কোথায় রেখেছ?'

'আপনার নিজের তৈরি? নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে জানেন? আমি তো হাজার চেষ্টা করেও কাজে লাগাতে পারিনি। তা আপনার লেসার গান কি কাজে ব্যবহার হয়, ড. কুয়াশা? কিভাবে ব্যবহার করতে হয়?'

'তোমার মত আস্ত একটা গাধার পক্ষে লেসার গানের তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়, ডেভিড। ওটা তোমার ব্যবহারের জিনিস নয়। আমার জিনিস ফিরে চাই আমি।'

হাঃ হাঃ করে জঘন্য ভাবে হেসে উঠল ডেভিড। হাসি থামিয়ে সে রাজার দিকে তাকিয়ে কয়েকটি কথা বলল হাহাদের ভাষায়।

রাজা কয়েকজন হাহার প্রতি ইঙ্গিত করল। কুয়াশার দিকে এগিয়ে এল তারা সরু চামড়ার বেল্ট নিয়ে। কুয়াশাকে বাঁধতে চায় তারা।

রানী কি যেন আবার বলল রাজার উদ্দেশে।

রাজা তাকাল ডেভিডের দিকে। ডেভিডকে কি যেন বলল সে। ডেভিড উত্তরে অনেকগুলো কথা বলল। ডেভিডের কথা শেষ হতে রাজা আবার কি বলল।

ডেভিডের মুখ শুকিয়ে গেল কেন যেন। কিন্তু হাহাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় একটা আদেশ দিল সে।

উঁচু পাথরের উপর থেকে নামিয়ে আনা হলো হাসান আল ইয়াজদিকে।

ডেভিড কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে রাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বলি দেয়া হবে আপনাকে। নিজের কোন বক্তব্য থাকলেও রাজাকে জানাতে পারেন।

কুয়াশা হাসান আল ইয়াজদির দিকে তাকাল। মৃদু হাসল সে। ইয়াজদির উদ্দেশে বলল, 'মিঃ ইয়াজদি, আপনি আমাকে চিনতে না পারলেও আমি আপনাকে চিনেছি। আমার নাম কুয়াশা। বার্লিনে একটা সিম্পোজিয়ামে আপনার সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার দশ বছর আগে। আপনি কি হাহাদের ভাষা বুঝতে এবং বলতে পারেন?'

অবাক বিস্ময়ে কুয়াশার কথাগুলো গিলছিল হাসান আল ইয়াজদি। কুয়াশার প্রশ্নে মাথা নেড়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি হাহাদের ভাষায় কথা বলতে শিখেছি গত এক বছরে।'

কুয়াশা বলল, 'দয়া করে আমার বক্তব্যটুকু রাজাকে আপনি জানিয়ে দিন। রাজাকে বলুন, আমি একজন জাদুকর। মন্ত্র পড়ে, হিসেব কষে আমি অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে পারি। বলে দিতে পারি ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা যা বলব তা অবশ্যই ঘটবে।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল ইরাকী কেমিস্ট।

কুয়াশা বলল, 'ইতস্তত করবেন না। যা বলছি তা ভেবেই বলছি। আপনি রাজাকে আমার কথাগুলো জানান।'

ইয়াজদি রাজাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করল। তার কথা শেষ হতে রাজা একটা প্রশ্ন করল।

ইয়াজদি বলল, 'রাজা জানতে চাইছেন আপনি আপনার জাদু-শক্তি প্রমাণ করতে পারবেন?'

'পারব।'

কথাটা রাজাকে জানাল ইয়াজদি। রাজা প্রশ্ন করল, 'বেশ, হাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জাদুকর কিছু বলুক শুনি।'

রাজার প্রশ্ন শুনে কুয়াশা বলল, 'হাহাদের সামনে ভীষণ বিপদ। চারভাগের তিনভাগেরও বেশি হাহা আজ রাতের মধ্যেই মারা যাবে। এবং দু'একদিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে গোটা হাহা জাতি।'

ইয়াজদি কথাটা রাজাকে জানাতে ভয় পেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুয়াশার বারংবার অনুরোধে কথাটা জানাতে বাধ্য হলো সে।

কুয়াশার কথা শুনে রেগে লাল হয়ে গেল রাজা। সিংহাসন ত্যাগ করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে কি যেন বলল সে।

ইয়াজদি ফিসফিস করে কুয়াশার উদ্দেশে বলল, 'রাজা আপনার কথা শুনে

ভীষণ অপমানিত বোধ করেছে। মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে সে আপনার।'

কুয়াশা বলল, 'আমাকে মেরে ফেললেও হাহাদের ভবিষ্যৎ বদলাবে না। যা বলেছি তা ঘটবেই।'

একদল হাহা ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঁধে ফেলল কুয়াশাকে। বন্দী কুয়াশাকে তারা নিয়ে চলল উঁচু পাথরটার উপর।

পাথরটার উপর দাঁড় করিয়ে খাঁড়া উঁচু করে ধরল কয়েকজন হাহা কুয়াশার মাথার উপর। রাজার আদেশের অপেক্ষায় তৈরি তারা।

রাজা এদিকে তাকিয়ে আছে সভাগৃহের দরজার দিকে। দরজা দিয়ে দশ পনেরোজন নেকড়ের ছাল পরা হাহা হাঁপাতে হাঁপাতে ভিতরে প্রবেশ করছে। দরজার কাছ থেকেই তারা রাজার উদ্দেশে চিৎকার করে কি যেন বলছে।

আট

অসংখ্য মশালের আলোয় সভাগৃহ আলোকিত।

সভাগৃহের কাছ থেকে ভীড় ঠেলে হাহাগুলো শোরগোল তুলে এগিয়ে আসতে লাগল রাজার দিকে।

রানী তার সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল রাজার পাশে। ডেভিড বসেই রইল তার সামনে। চোখমুখের চেহারা তার ভারী, থমথমে হয়ে উঠেছে।

কি যেন বলল রানী রাজার দিকে তাকিয়ে।

রাজা তাকাল কুয়াশার দিকে।

কুয়াশা লক্ষ করল রানীও তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। ডেভিডের দিকে তাকাল কুয়াশা। দাঁতে দাঁত চাপছে সে। কার উদ্দেশ্যে কে জানে।

উত্তেজিত হাহাগুলো মঞ্চে উঠে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল।

এমন সময় সভাগৃহের একধারে গোলযোগ শুরু হলো। রাজা তাকাল সেদিকে।

একদল পান-ভোজনে মত্ত হাহা হঠাৎ ঢলে পড়েছে মেঝেতে। কোন রকম নড়াচড়া করছে না তারা। তাদের পাশে যারা ছিল তারা ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করছে।

রাজার সামনে দাঁড়িয়ে নবাগত হাহারা সমস্বরে কি সব বলে চলেছে।

শুনতে শুনতে অবিশ্বাস ফুটে উঠল রানীর সারা মুখের চেহারায়। গম্ভীর হয়ে উঠল রাজা।

সভাগৃহের আর এক দিকে নতুন করে গোলযোগ শুরু হলো। সেখানেও একদল হাহা পান-ভোজন করতে করতে আচমকা ঢলে পড়েছে।

উপস্থিত হাহারা ঢলে পড়া সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ভাবছে মারা গেছে তারা। ফলে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ভীষণ ভাবে।

রাজা ডেভিডের দিকে তাকাল, কি যেন বলল সে তাকে। ডেভিড মাথা নেড়ে

কি যেন বলল দ্রুত।

এমন সময় একজন হাহা ঢুকল সভাগৃহে। হাঁপাতে হাঁপাতে, ছুটতে ছুটতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে সে।

সভাগৃহের মাঝখানে নতুন করে গোলযোগ শুরু হলো।

নবাগত হাহাটা মঞ্চে উঠে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপা এবং ভীত কণ্ঠে কি সব বলতে শুরু করল। তার কথা শেষ হবার আগেই আর একজন দুঃসংবাদবাহক হাহা সভাগৃহের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। তার পিছু পিছু প্রবেশ করল আরও দু'জন।

মঞ্চের উপর নবাগত হাহার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তেই লাগল।

সভাগৃহে উপস্থিত হাহারা ছুটোছুটি শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। রাজার উপস্থিতি ভুলে তারা পরস্পরের ঘাড়ে পড়ছে, চিৎকার করছে, ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে সভাগৃহ থেকে।

রাজা একজন হাহাকে কি যেন বলল।

কুয়াশার কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের উদ্দেশে লোকটা নির্দেশ দিল।

লোকগুলো খুলতে শুরু করল কুয়াশার বাঁধন। বাঁধন খুলে উঁচু পাথরের উপর থেকে নামিয়ে কুয়াশাকে মঞ্চে নিয়ে আসা হলো।

হাসান আল ইয়াজদি তখনও মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে সে অবিশ্বাস ভরা বিমূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'আপনি কি সত্যিই জাদু জানেন, ড. কুয়াশা? আপনার ভবিষ্যৎ-বাণী যে ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে!'

কুয়াশার মুখে কোন কথা ফুটল না। তার দৃষ্টি ভাবলেশহীন নির্বিকার।

রাজা, রানী, ডেভিড, মঞ্চে উপস্থিত নাবাগত হাহারা ও সভাগৃহের সচেতন প্রতিটি হাহা তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে।

রাজার চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। রানীর চোখে অপার বিস্ময়। ডেভিডের চোখে ঘৃণা, ঈর্ষার আগুন। নবাগত এবং সভাগৃহের প্রতিটি হাহার চোখে আতঙ্ক।

রাজা ইয়াজদির দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল।

ইয়াজদি কুয়াশার দিকে তাকাল, 'রাজা বলছেন তার রাজ্যে হঠাৎ অশান্তি শুরু হলো কেন? এর জন্যে কে দায়ী? আপনি?'

'অশান্তি তো শুরু হবেই। হাহাদের সামনে মারাত্মক বিপদ এ কথা বলে সাবধান করে দিইনি আমি? এই বিপদ এবং অশান্তির জন্যে দায়ী হাহারা নিজেরাই। তারা অন্যায় করছে অন্যান্য জাতির উপর, তারা একজন বিদেশী শয়তানকে নিজেদের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছে এবং তারা ভাল মানুষদেরকে বলি দিচ্ছে।'

ইয়াজদি কুয়াশার বক্তব্য রাজাকে জানাল। রাজা তাকাল ডেভিডের দিকে। কি যেন বলল সে। ডেভিড রাগে কাঁপতে কাঁপতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলল।

রাজা কথা বলল আবার।

ইয়াজদি রাজার প্রশ্ন জানাল কুয়াশাকে, 'রাজা জিজ্ঞেস করছেন তার প্রজারা দলে দলে মারা যাচ্ছে। প্রতিটি গুহা থেকে সংবাদ আসছে মৃত্যুর। এই সভাগৃহেও মরছে অনেকে। আপনি যখন জাদুকর তখন নিশ্চয়ই হাহাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন?'

কুয়াশা জানাল, 'পারি।'

রাজা প্রস্তাব দিল সমাধান করার।

কুয়াশা বলল, 'আমার জাদুদণ্ড চুরি করেছে ডেভিড। জাদুদণ্ড ছাড়া প্রমাণ করা সম্ভব নয়। জাদুদণ্ডটা কোথায় রেখেছে ডেভিড বলুক।'

রাজা ডেভিডকে জাদুদণ্ডের কথা জিজ্ঞেস করল। সেটা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করল ডেভিড।

রাজা তখন একজন হাহাকে হুকুম করল ডেভিডের গুহা থেকে জাদুদণ্ডটা নিয়ে আসতে। রাজার হুকুম শুনে খেপে গেল ডেভিড। চিৎকার করে অনেকগুলো কথা বলল সে। তারপর মঞ্চ থেকে নামার জন্যে সামনে পা বাড়াল।

রাজার নির্দেশে কয়েকজন হাহা বাধা দিল ডেভিডকে। বাধা পেয়ে মঞ্চ ত্যাগ করার চেষ্টা বাদ দিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল সে তার আসনে।

নতুন নতুন দুঃসংবাদ নিয়ে সভাগৃহে হাহাদের প্রবেশ করার বিরাম নেই। সভাগৃহেও অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটে চলেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেক হাহা ঢলে পড়ে যাচ্ছে মেঝেতে। পড়ে যাবার সাথে সাথে স্থির, নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছে তাদের দেহ। সুস্থ লোক সভাগৃহে এখন মুষ্টিমেয়। বেশির ভাগ হাহাই ঢলে পড়েছে।

দুঃসংবাদ নিয়ে আগত ত্রিশ চল্লিশ জন হাহার মধ্যেও পনেরো বিশজন ঢলে পড়েছে মঞ্চে।

ডেভিড বিপদ টের পেয়ে কৌশলের আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছে। নরম সুরে রাজার সাথে কথা বলছে সে। কুয়াশা মৃদু হাসল রানীর দিকে তাকিয়ে। পরিবর্তে মিষ্টি হাসি উপহার দিল রানী।

লেসার গান নিয়ে ফিরে এল একজন হাহা।

রাজা সেটা নিজের হাতে নিয়ে কি যেন বলল। ইয়াজদি তাকাল কুয়াশার দিকে, বলল, 'রাজা বলছেন তার সম্মানিত মেহমান মি. ডেভিডও একজন জাদুকর। আপনি তাকে শয়তান বললেও রাজা তা মেনে নিতে পারছেন না। রাজার কথা হলো দুই জাদুকর আপনি এবং মি. ডেভিড পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামুন। প্রতিযোগিতায় যে জিতবে তাকেই বড় জাদুকর হিসেবে স্বীকার করে নেবেন রাজা। যে হারবে তাকে মরতে হবে।'

কুয়াশা জানাল, 'আমি রাজার প্রস্তাবে রাজি আছি। ডেভিডকে চ্যালেঞ্জ করছি আমি। রাজা ওর হাতেই জাদুদণ্ড দিন। মন্ত্র পড়ে জাদুদণ্ডের সাহায্যে ডেভিড আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করুক।'

ডেভিড কুয়াশার প্রস্তাবে রাজি হলো না। সে বলল, 'জাদুদণ্ডটা কুয়াশার;

আমার নয়। আমি আমার জাদুদণ্ড ব্যবহার করতে চাই।'

সে অধিকার ডেভিডকে দিতে রাজি হলো কুয়াশা।

ডেভিডের নির্দেশে একজন হাহা একটা রাইফেল নিয়ে এসে দিল তার হাতে।

রাইফেল দেখে কুয়াশা আপত্তি করল। রাজার উদ্দেশে সে বলল, 'রাইফেল হলো একটা আগ্নেয়াস্ত্র। ওটা কোন জাদুদণ্ড নয়। রাইফেল ব্যবহার করে যে-কোন লোক যে-কোন লোককে খুন করতে পারে, আহত করতে পারে। রাজা, আপনি কি একটা বর্শাকে জাদুদণ্ড বলেন? একটা বর্শা যদি জাদুদণ্ড না হয় তাহলে একটা রাইফেলও জাদুদণ্ড নয়।'

রাজা মাথা দোলাল। কুয়াশার যুক্তি মনঃপূত হয়েছে তার।

ডেভিড বলল, 'রাইফেল যদি জাদুদণ্ড না হয় তাহলে রাজার হাতে যেটা রয়েছে সেটাও জাদুদণ্ড নয়। কেননা ওটাও রাইফেলের মত দেখতে। ওটার কাজও নিশ্চয়ই রাইফেলের মত।'

কুয়াশা বলল, 'না, ওটার কাজ রাইফেলের মত নয়।'

ডেভিড জানতে চাইল, 'তাহলে ওটার কাজ কি রকম?'

কুয়াশা বলল, 'ওটার কাজ কি তা বললে আমার মন্ত্র গুণ হারিয়ে ফেলবে। জাদুদণ্ডও কাজ করবে না। তবে রাজাকে গোপনে আমি কথাটা জানাতে পারি।'

রাজা কুয়াশাকে নিয়ে মঞ্চের একধারে চলে এল। সঙ্গে এল হাসান-আল ইয়াজদি।

কুয়াশা জানাল, 'আমার জাদুদণ্ডের দ্বারা আমি ডেভিডকে বাতাসের সাথে মিশিয়ে দিতে পারি। কেউ তাকে দেখতে পাবে না। হঠাৎ সে মিলিয়ে যাবে বাতাসে।'

রাজা মাথা নেড়ে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, এটা জাদুর দ্বারাই সম্ভব। রাইফেল বা বর্শা এরকম অত্যাশ্চর্য কাজ করতে পারে না। একমাত্র জাদুদণ্ডের দ্বারাই তা সম্ভব।'

ওরা আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে এল।

ডেভিড বলল, 'ঠিক আছে, আমি কুয়াশার জাদুদণ্ড হাতে নেব। দেখি ওটা দিয়ে আমি কোন জাদু দেখাতে পারি কিনা।'

রাজা ডেভিডকে কুয়াশার লেসার গানটা দিল।

ডেভিড কুয়াশার দিকে তুলে ধরল জাদুদণ্ড অর্থাৎ লেসার গান।

কেঁপে উঠল কুয়াশার বুক। ডেভিড কি এতক্ষণ ভান করছিল? খেলা করছিল তার সাথে? সে কি জানে লেসার গান অপারেট করতে?

লেসার গান ব্যবহার করতে শেখাটা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। লেসার রশ্মি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার, জানা দরকার গানের মেকানিজম সম্পর্কে দু'একটি খুঁটিনাটি।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুয়াশা ডেভিডের দিকে।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে ডেভিডের দিকে।

রানী তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে। তার চোখে শঙ্কা ফুটে উঠেছে। রাজাও তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে। নির্বিকার মুখ তার। কি যে ভাবছে বোঝার উপায় নেই।

ডেভিড লেসার গানের লকটা নাড়াচাড়া করছে। হেসে ফেলল কুয়াশা। ডেভিড যে লেসার গান চালাতে জানে না তা সে ধরে ফেলেছে। লক খোলার আগে ছোট একটা বোতামে চাপ দিয়ে লকের ট্রিগারটাকে গুপ্তস্থান থেকে বাইরে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে সবচেয়ে আগে। কুয়াশা বোতামটার নাম দিয়েছে সিক্রেট বাটন। সেটা আবার একটি গর্তের ভিতর লুকানো আছে। গর্তটা সহজে চোখে পড়বার মত জায়গায় নেই।

কুয়াশা বুঝতে পারল ডেভিড সিক্রেট বাটনের অস্তিত্বের কথা জানে না।

রাজাকে কুয়াশা জানাল, 'ডেভিড আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি ওর চেয়ে অনেক বড় জাদুকর। মন্ত্র পড়ে জাদু শক্তি আমি নষ্ট করে দিয়েছি।'

ডেভিডের চোখ-মুখ কালো হয়ে গেছে।

লেসার গান নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করছে সে।

হঠাৎ ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল কুয়াশার।

কুয়াশার কোমরের কাছ থেকে যান্ত্রিক ধ্বনি বেরিয়ে আসছে—কির-কির কিরকির, কির-কির কিরকির…।

রাজা পিছিয়ে গেল এক পা। ভয় পেয়েছে সে।

কোমর থেকে বের করল কুয়াশা মিনি ওয়্যারলেসটা। কানের কাছে সেটা তুলে ধরে মেসেজ রিসিভ করার জন্যে অতি ক্ষুদ্র একটা বোতাম টিপল সে।

ভেসে এল রাসেলের কণ্ঠস্বর, 'মি. কুয়াশা?'

'বলছি।'

রাসেল বলল, 'আপনি কি বন্দী হয়েছেন হাহাদের হাতে?'

'প্রায় তাই। কিন্তু তুমি কোথা থেকে বলছ?'

রাসেল বলল, 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমরা আধঘন্টার মধ্যে আক্রমণ করছি হাহাদের এলাকা।'

'বলো কি?'

'ঠিকই বলছি। আমার সঙ্গে পনেরো বিশ হাজার জংলী রয়েছে। হাহারা সংখ্যায় কত?'

কুয়াশা হেসে বলল, 'সংখ্যায় ওরা বেশি নয়। বড় জোর ছয়-সাত হাজার।'

'সাত-হাজার! অসম্ভব! আপনি কি ঠাট্টা করছেন?'

কুয়াশা বলল, 'না, সত্যি কথাই বলছি। তুমি এখানে এলেই সব দেখতে পাবে। সম্ভবত হাহারা তোমাদেরকে বাধাই দেবে না। বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নেবে।'

'এসব কি বলছেন আপনি! আপনার কি মাথা…।'

কুয়াশা বলল, 'মাথা আমার ঠিকই আছে।'

রাসেল জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি গুরুতর বিপদে পড়েছেন?'

'তা পড়েছি। তবে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'চিন্তা করবেন না। ওদেরকে আধঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখুন কোন মতে। আমরা আধঘণ্টার মধ্যে আপনাকে উদ্ধার করার আশা করছি।'

হেসে ফেলে কুয়াশা বলল, 'ঠিক আছে।'

সেট অফ করে সেটা আবার কোমরে গুঁজে রাখল কুয়াশা।

রাজা জানতে চাইল, 'ব্যাপার কি?'

কুয়াশা জানাল, 'ব্যাপার গুরুতর। জাদুর বদৌলতে আমি আমার ওস্তাদের সাথে কথা বললাম। ওস্তাদ আমাকে জানালেন যে হাহাদের সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ। বনভূমির জংলীরা আজ রাতের মধ্যেই আক্রমণ করবে হাহাদেরকে। সংখ্যায় তারা পনেরো বিশ হাজার।'

কালো হয়ে গেল রাজার চোখ-মুখ।

ডেভিডের হাত থেকে লেসার গান নিয়ে নিল রাজা। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এবার আপনি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুন।'

কুয়াশা লেসার গান হাতে নিয়ে সিক্রেট বাটনের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে চাপ দিল।

লকের ট্রিগার বেরিয়ে এলো ক্লিক করে একটা শব্দ করে। লেসার গান ধরল কুয়াশা ডেভিডের দিকে।

ডেভিডের পিছন দিকে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে রেঞ্জ ঠিক করে নিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল কুয়াশা।

চোখের পলকে অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল। ডেভিড যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে সে নেই। চোখের পলকে সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

হাত তালির শব্দে সকলের সংবিৎ ফিরল।

রানী কুয়াশার প্রশংসা করছে হাত তালি দিয়ে।

রাজা নত হয়ে দাঁড়াল কুয়াশার সামনে। বলল, 'আপনি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ জাদুকর। আপনার প্রাপ্য সম্মান দিতে আমি বাধ্য। এখন থেকে আপনি আমার সম্মানিত মেহমান। আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্যে আপনার জাদুশক্তি ব্যবহার···!'

রাজার কথা শেষ হবার আগেই অকস্মাৎ চারদিক কাঁপিয়ে একযোগে সভাগৃহের বাইরে এবং ভিতরে বেজে উঠল অনেকগুলো ড্রাম।

ড্রামের গুরুগম্ভীর আওয়াজে কান পাতা দায় হয়ে উঠল।

রাজা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সভাগৃহে প্রবেশ করছে সশস্ত্র হাহারা।

খানিক পর ড্রামের শব্দ থামল।

সভাগৃহে জড়ো হয়েছে প্রায় হাজার খানেক যোদ্ধা। তারা নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে রাজার দিকে।

কিন্তু রাজা তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে।

রাজা বলল, 'ড্রাম বাজার একটাই অর্থ। শত্রুরা আক্রমণ করতে আসছে জানতে পারলেই কেবল ড্রাম বাজানো হয়। আপনার কথাই ঠিক। জংলীরা সত্যি সত্যি আক্রমণ করতে আসছে।'

কুয়াশা মৃদু হাসল। একটা হাত আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে উপর দিকে তুলে সে বলল, 'ভয় নেই। আমি জাদুকর। জংলীদেরকে শান্ত করার ক্ষমতা আমার আছে।'

আশ্বাস পেয়ে রাজার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলতে শুরু করল, 'রাতারাতি হাহারা প্রায় অর্ধেকই মারা গেছে। বেঁচে আছে যারা তাদেরও অনেকেই অসুস্থ। এ-রকম মহাবিপদে হাহারা যুদ্ধ করতে পারে না। অথচ আত্মসমর্পণ করারও কোন মানে হয় না। কারণ জংলীরা হাহাদেরকে পেলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

কুয়াশা বলল, 'জংলীদেরকে সমূলে ধ্বংস করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি জাদুকর হলেও কারও ক্ষতি করতে পারি না। আমার জাদুশক্তি কেবল ভাল কাজ করার জন্য ব্যবহার করা চলে। রাজা, আপনি যদি রাজি হন তাহলে আমি জংলীদেরকে মন্ত্র দিয়ে বশ করে আপোস করার জন্যে রাজি করাতে পারি।'

'কি রকম আপোস?' সাগ্রহে জানতে চাইল রাজা।

'আপনাকে হাহাদের তরফ থেকে কথা দিতে হবে যে ভবিষ্যতে হাহারা জংলীদের ওপর অত্যাচার করতে পারবে না, আক্রমণ করতে পারবে না। জংলীদের সাথে একত্রে বনভূমি, মরুভূমি এবং পার্বত্য এলাকা ভাগাভাগি করে বসবাস করতে হবে। জংলীরা এবং হাহারা পরস্পরকে ভাই বলে মনে করবে। জংলীদের মেয়েদের সাথে হাহাদের ছেলেদের এবং হাহাদের মেয়েদের সাথে জংলীদের ছেলেদের বিয়ে দিতে হবে।'

রানীর সাথে পরামর্শ করল রাজা। রানী মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। কুয়াশার প্রস্তাবে রাজি হলো রাজা।

কুয়াশা বলল, 'পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমি সকল হাহাকে নতুন করে বাঁচিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু তা করার আগে আমার কয়েকটা শর্ত মেনে নিতে হবে।'

রাজা জানতে চাইল, 'কি শর্ত?'

কুয়াশা বলল, 'হাহাদের হাতে যে-সব বন্দী আছে তাদেরকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। হাহাদের মধ্যে যে নিয়ম আছে তা উঠিয়ে নিতে হবে। নরবলি দেয়া চলবে না। মানুষের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করতে হবে।'

রানীর পরামর্শ নিয়ে রাজা কুয়াশার শর্তগুলো বিনা দ্বিধায় মেনে নিল।

মিনি ওয়্যারলেস বের করে কুয়াশা রাসেলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করল।

'কি সংবাদ, মি. কুয়াশা।' উত্তেজিত শোনাল রাসেলের গলা।

কুয়াশা বলল, 'খবর ভাল। তোমরা এখন কোথায়?'

'আমরা আর মাইল খানেক এগোলেই হাহাদের পাহাড়গুলোর কাছাকাছি পৌঁছে যাব।'

'পাহাড়ের কাছে আর পৌঁছুবার দরকার নেই। তোমরা যেখানে আছ সেখানেই থামো। আমি হাহাদের রাজা এবং রানীকে নিয়ে তোমাদের কাছে আসছি।'

'সে কি!'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। যুদ্ধ করে লাভ নেই বুঝিয়েছি আমি রাজাকে। তাতে শুধু রক্তপাতই ঘটবে। আপোস করতে রাজি আছে রাজা।'

আপোসের শর্তাবলী জানাল কুয়াশা রাসেলকে। তেইশজন জংলী সর্দারের সাথে পরামর্শ করে কুয়াশাকে জানাল, 'জংলী সর্দাররা সবাই আপোসে রাজি আছে।'

ওয়্যারলেস সেট যথাস্থানে রেখে কুয়াশা রাজাকে তিনটে তেজি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে বলল।

পনেরো মিনিট পর কুয়াশা রাজা ও রানীকে নিয়ে সারবন্দীভাবে দণ্ডায়মান জংলীদের সামনে এসে থামল।

আধঘণ্টা আলাপ আলোচনার পর তেইশজন সর্দার এবং রাসেল হাহাদের সভাগৃহ অভিমুখে যাত্রা করল।

সভা গৃহ থেকে ঢলে পড়া হাহাদেরকে সরিয়ে অন্যত্র রেখে আসা হলো।

সভা বসল সভাগৃহে।

ঝাড়া দু'ঘণ্টা আলাপ আলোচনার পর আনুষ্ঠানিকভাবে জংলী এবং হাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতিমূলক চুক্তি সম্পাদিত হলো। তেইশজন সর্দার এবং রাজা যার যার কড়ে আঙুল কেটে রক্ত জমা করল একটি পাত্রে। সেই রক্ত দিয়ে রাজা সর্দারদের কপালে টিপ পরিয়ে দিল। সর্দারদের মধ্যে একজন টিপ পরাল রাজার কপালে।

ঠিক হলো হপ্তাব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হবে। চুক্তি সম্পাদন শেষ হবার পর সর্দাররা রাজার সাথে খোশ-গল্পে রত হলো।

কুয়াশার নির্দেশে একদল হাহা বন্দীদেরকে মুক্ত করে সভাগৃহে নিয়ে আসার জন্যে রওনা হলো।

রাসেল কুয়াশার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'এমন অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড কিভাবে ঘটালেন? একশো শূকরের দশাই বা কি হলো?'

কুয়াশা মৃদু হেসে বলল, 'একশো শূকরের প্রাণের বিনিময়ে অনেক বড় কাজ হয়েছে। আমার আবিষ্কৃত একটা পয়জন শূকরগুলোর শরীরে প্রবেশ করিয়ে

দিয়েছিলাম। কয়েক মিনিটের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল তারা। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসে আবার। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও শূকরগুলোর মাংস বিষাক্ত হয়ে যায়। ওই বিষ শূকরগুলোর কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু যারা ওই শূকরের মাংস খেয়েছে তারা সবাই ছয় ঘণ্টার জন্যে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

'অদ্ভুত! কিন্তু একশো শূকরের মাংস কি কয়েক হাজার হাহার জন্যে যথেষ্ট? হাহারা কি সবাই খেয়েছে শূকরের মাংস?'

'খায়নি। ব্যাটারা এক একজন যে পরিমাণ মাংস খায় তাতে একশো শূকর তো একশোজন হাহাই খেয়ে শেষ করে ফেলতে পারে।'

'তাহলে কি ভাবে হাজার হাজার হাহাকে অজ্ঞান করলেন আপনি?'

'এক্স-এম টু-থ্রি কম্পাউণ্ড দিয়ে। জিনিসটা ছোট একটা মারবেলের মত দেখতে। ক্ষুদ্র একটা বোতামও আছে ওগুলোর গায়ে। বোতাম টিপে প্রায় প্রতিটি গুহায় একটা করে এক্স-এম-টু-থ্রি কম্পাউণ্ড। বোমা ফেলে দিয়েছিলাম আমি। এগুলো কিন্তু ফাটে না। বোতাম টিপার পর থেকে চোখে দেখা যায় না এমন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস বের হতে থাকে ভিতর থেকে। ওই গ্যাস যার বুকে ঢুকবে সেই-ই ছয় ঘণ্টার জন্যে জ্ঞান হারাবে। এখন বুঝতে পারছ আসল রহস্য?'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থেকে রাসেল বলে উঠল, 'জলের মত। এক্স-এম-টু-থ্রি কম্পাউণ্ডও নিশ্চয় আপনার আবিষ্কার?'

মৃদু হেসে কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে কুয়াশা বলল, 'হাহাদের কাছে কি সব যন্ত্র আর মেশিন আছে জানো? ক্রেন, ট্রাক্টর, ট্রাক, ডায়নামো, গভীর নলকূপ বসাবার ভারী যন্ত্রপাতি...।'

'বলেন কি! আপনার দারুণ কাজে লাগবে তাহলে ওগুলো, তাই না? ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করার জন্যে ওগুলোর মধ্যে কাজে লাগবে অনেক জিনিস।'

কুয়াশা বলল, 'লাগবেই তো। এমন সময় রানী তার একজন সহচারীকে নিয়ে হাজির হলো সামনে। মিষ্টি সুরে নিজেদের ভাষায় কি যেন বলল সে। তারপর ইঙ্গিতে বলল, 'আপনারা আমার সাথে অন্দর মহলে চলুন। আপনাদেরকে আমি নিজের হাতে খাওয়াব।'

রানীর সাথে যেতে যেতে রাসেল সহাস্যে কুয়াশাকে বলল, 'খেতে তো যাচ্ছি। কিন্তু শূকরের মাংস চিনব কি ভাবে?'

কুয়াশা বলল, 'একটু বুদ্ধি খরচ করলেই চিনতে পারবে।'

'সে কেমন?'

মৃদু হেসে কুয়াশা বলল, 'চিন্তা করে দেখো।'

রাসেল চিন্তা করে বলল, 'বুঝেছি। আপনি যে মাংস খাবেন না আমিও সেটা খাব না। তাহলেই বিষক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচব। তাই না?'

'তাই,' কুয়াশা বলল।

কুয়াশাঃ ৪১

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৭৩

এক

শাড়ি কাপড়ের হাটের জন্যে সোনাডাঙ্গা বিখ্যাত। হপ্তায় একদিন হাট। লাখ লাখ টাকার বেচাকেনা। এই হাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সোনাডাঙ্গা শহরটা।

সোনাডাঙ্গার ইতিহাস যারা জানে তারা সোনাডাঙ্গায় হাট করতে এলেও মনের ভিতর খুঁতখুঁতে একটা ভয় নিয়েই আসে। সারাটা দিন হাটের মধ্যে কাটিয়ে, সন্ধ্যা নামার আগেই ট্রেন ধরে যে-যার গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। ভাল হোটেল আছে। হোটেলের খাওয়াদাওয়া ভাল। ব্যবসায়ীরা একদিন আগে পৌঁছুতে পারলে সেরা মালগুলো হাটের দিন সকালে কিনে ফেলতে পারে। কিন্তু তা বড় কেউ করে না। যেদিন হাট সেদিনই সোনাডাঙ্গায় পৌঁছয় সবাই। একদিন আগে এসে সোনাডাঙ্গায় রাত কাটাবার মত দুঃসাহস কারও নেই।

সোনাডাঙ্গার চারদিকে বনভূমি। বন কেটে প্রকাণ্ড এক গ্রাম গড়ে উঠেছিল। শোনা যায়, এই গ্রামের সৃষ্টি হয় ঠগীদের একটি অনুতপ্ত দলের লোকজনদের চেষ্টায়। কিন্তু সোনাডাঙ্গার গ্রামের বর্তমান অধিবাসীরা নিজেদেরকে ঠগীদের উত্তর-পুরুষ বলে স্বীকার করে না। তাদের ধারণা তাদের পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন চর এলাকার লোক। চর ডুবে যেতে শত শত হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ এই জঙ্গলে এসে আশ্রয় নেয় এবং ঠগীদের সাথে বছরের পর বছর ধরে সংগ্রাম করে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। চাষাবাদই সোনাডাঙ্গার অধিবাসীর প্রধান পেশা। তাঁতের সংখ্যাও প্রচুর।

গ্রাম এখন আর বলা চলে না সোনাডাঙ্গাকে। বিদ্যুৎ, দুরালাপনী, মোটর গাড়ি, সাইকেল-রিকশা, ট্যাক্সি, ট্রেন—সবই আছে। আছে একটা হাসপাতাল, কয়েকটি ব্যাঙ্ক, একটি উচ্চ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পোস্ট অফিস। সরকারী কলেজ চালু হবার সব ব্যবস্থাও প্রায় পাকা হতে চলেছে।

সোনাডাঙ্গায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও বর্তমানে প্রচুর। ডাক্তার আছেন তিন জন।

মাধবপুর প্রায় বিশ মাইল দূরে সোনাডাঙ্গা থেকে। বড় শহর। নিউ মার্কেট আছে। আছে সিনেমা হল।

ন'টার ট্রেনটা শেষ ট্রেন। ট্রেন থেকে নেমে যে-যার বাড়ির ভিতর ঢোকে। তারপর সারারাত আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না সোনাডাঙ্গার মানুষদের।

আজও সেখানকার মানুষরা রাতের বেলা ঘর থেকে বের হতে আতঙ্ক অনুভব করে।

কেউ কেউ বলে সোনাডাঙ্গার চারপাশে যে গভীর জঙ্গল তার ভিতর এখনও শত শত হাজার হাজার ঠগী লুকিয়ে আছে।

আবার কেউ কেউ বলে যে—না ঠগীরা কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। ঠগীদের বদ আত্মারা নাকি রাতের বেলায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামের ভিতর চলে আসে। ওঁৎ পেতে থাকে তারা বাড়িগুলোর আনাচে-কানাচে, ঘরের দরজা জানালার পাশে। কেউ বের হলেই ঘাড় মটকে তার রক্ত চুষে খাবে। জঙ্গলের ভিতর যে প্রাচীন মন্দিরটা আছে সেখানে নাকি তারা নরবলি দিত।

এসব কথা কেবলই গল্প কথা। বুড়োবুড়ীরাই বলে থাকে। আজ অবদি ঠগীরা বা ঠগীদের আত্মারা কারও ঘাড় মটকায়নি।

কিন্তু রাত নামার পর সোনাডাঙ্গার ছেলেমেয়ে এমনকি যুবক-যুবতীদেরও গা ছমছম করে। ঘরের বাইরে বড় একটা তারা বের হয় না।

গ্রামটা বেশ বড়।

পাশাপাশি তিনটে ব্যাঙ্ক। বাঙলা ব্যাঙ্কটা অপর দুই ব্যাঙ্কের মাঝখানে। ব্যাঙ্কের সামনেই বাজার। প্রকাণ্ড বাজার। সকাল থেকে সন্ধে অবদি গমগম করে। পাকা দোকানের সংখ্যাই একশো। আরও অনেক রকম দোকান। প্রায় সব জিনিসই পাওয়া যায়। গ্রামের লোক-সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। মাধবপুর সোনাডাঙ্গার চেয়ে বড় শহর হলেও সব জিনিস সেখানে পাওয়া যায় না। সেখান থেকেও লোক আসে সোনাডাঙ্গার বাজারে। বাজার এবং হাট একই জায়গায় বসে না।

আজ মঙ্গলবার।

মি. হায়দার ঠিক ন'টার সময় বাড়ি থেকে বের হন ব্যাঙ্কের উদ্দেশে। কিন্তু আজ প্রায় দু'ঘন্টা আগে বাড়ি থেকে বের হলেন তিনি। সঙ্গে চাকর ছেলেটাকে নিলেন। বাজার করে পাঠাবেন।

মিসেস হায়দার জানেন স্বামীর আজ তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে যাবার কারণটা।

বাঙলা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মি. হায়দার। আট-দশ বছর হয়ে গেছে চাকরি করছেন। ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিলেন। আজ তিন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। সোনাডাঙ্গার বাজারে কয়েকটা দোকানও আছে তাঁর। নিজে চালান না। লোক দিয়ে চালান দুটো। বাকিগুলো ভাড়া দিয়েছেন। ছোটখাট সাপ্লাইয়ের কাজ করেও ভাল পয়সা রোজগার করেন তিনি। রীতিমত বড় লোকই বলা যায় তাঁকে। ইচ্ছা করলে চাকরি না করলেও পারেন। কিন্তু চাকরিটাকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন একরকম, তাই ছাড়ার কথা কোনদিন ভাবেননি।

মিসেস হায়দারও অশিক্ষিতা নন। কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ লেখাপড়ায় ইস্তাফা দিয়ে বিয়ে করেছেন মি. হায়দারকে।

দোতলা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বামীর গমন পথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকতে থাকতে চিন্তিত হয়ে উঠলেন মিসেস হায়দার। বুকের মাঝখানে একটা ভয় ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে তাঁর।

দুশ্চিন্তায়, ভয়ে এবং পাপবোধে জর্জরিতা মিসেস হায়দার প্রায় টলতে টলতে বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এলেন। চাকরাণীটাকে ডেকে বললেন, 'আজ আমি কিছু খাব না। শরীরটা খারাপ। তোর সাহেবের জন্যে রেঁধে দুপুরবেলা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিস।'

'কি হয়েছে বিবি সাব…।'

হঠাৎ কোনদিন যা হয় না তাই হলো। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মিসেস হায়দার চিৎকার করে উঠলেন, 'দূর হ আমার সামনে থেকে! কথার ওপর কথা! ব্যাখ্যা চাইছে আবার, আজই তোকে বিদায় করে দেব!'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল চাকরাণীটা তার বিবি সাহেবার দিকে। এ কেমন হলো? এমন তো কখনও করেন না বিবি সাহেব!

নানা কথা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেল চাকরাণীটা কামরা থেকে। মিসেস হায়দার নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

দুই

ব্যাঙ্কের ভিতর ঢুকেই মি. হায়দার ডাকলেন, 'লতিফ।'

দারোয়ান লতিফ গেটের বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকল।

'শরীফ সাহেব, মোশাররফ, জিয়া সাহেব…।'

লতিফ বলল, 'ওনারা এসেছেন, স্যার। পিছনের উঠানে আছেন সবাই।'

'তোমার ভাই?'

লতিফের বদলে আজ ব্যাঙ্কের দারোয়ানি করবে লতিফের ভাই মোতালিব।

'সে তো আসবে আটটায়, স্যার।'

মি. হায়দার চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাচ দুটো মুছতে মুছতে বললেন, 'কিছু জানে না তো সে?'

'না, স্যার! কিছুই বলিনি ওকে। আটটার সময় আমার সাথে দেখা করতে বলেছি শুধু। এসে আমাকে পাবে না। করিম সাহেব থাকবেন। তিনিই ওকে বলবেন আজকের দিনটা দারোয়ানি করতে।'

পুরানো নোট ঢাকায় যাবে আজ। সতেরো লক্ষ টাকা সব মিলিয়ে। একশো, দশ, পাঁচ, এক—সব রকমের নোট মিলিয়ে সতেরো লাখ টাকা। এতগুলো টাকার ব্যাপার, সুতরাং গোপনীয়তাও রক্ষা করা দরকার।

মি. হায়দার আবার সব বিষয়েই একটু অতিরিক্ত সাবধানী।

মি. শরীফ বাঙলা ব্যাঙ্কের একাউন্টেন্ট। তার ওপর মি. হায়দারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তবু তিনি বন্ধুকেও আগে থেকে বলেননি যে আজ ঢাকায় টাকা পাঠানো হবে।

বাজার করতে আসার পথে লতিফের বাড়ি হয়ে এসেছিলেন মি. হায়দার। লতিফকে ঘুম থেকে তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সকলের বাড়িতে। সবাইকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে পৌছুবার নির্দেশ দিয়েছিলেন লতিফের মাধ্যমে।

সবাই চেনে মি. হায়দারকে। মি. শরীফ, ক্লার্ক মোশাররফ, ক্যাশিয়ার জিয়া সবাই জানে কারণ জিজ্ঞেস করা বৃথা। লতিফকে তারা কোন প্রশ্ন করেওনি। খবর পেয়েই ছুটে চলে এসেছে ব্যাঙ্কে।

তবে এদের মধ্যে একজন মোটেই আশ্চর্য হয়নি। তার কারণ সে জানত আজ ঢাকায় টাকা যাবে। জানত সে কয়েক দিন আগে থেকেই।

মি. হায়দার বললেন, 'তোমার ভাই এলে আমিও তাকে বলতে পারব। তোমাদের সাথে আমি যাচ্ছি না।'

'কোথায় যাব স্যার, আমরা?'

সুযোগ পেয়ে এই কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না লতিফ। একটু যেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন মি. হায়দার লতিফের দিকে। তারপর কি মনে করে মিটি মিটি হাসতে লাগলেন। বললেন, 'কোথাও তো নিশ্চয়ই যাবে। তাড়াতাড়ি করো দেখি। গেট বন্ধ করে পিছন দিকে এসো।'

লতিফ গেট বন্ধ করার জন্যে এগিয়ে গেল।

মি. হায়দার অফিসরুমের ব্যাক ডোর ঠেলে বেরিয়ে এলেন পিছনের বারান্দায়। বারান্দা থেকেই দেখলেন মি. শরীফ, মোশাররফ, জিয়া—তিনজন বসে রয়েছে তিনটে চেয়ারে।

শীতের সকাল। রোদে বসে কথাবার্তা বলছে ওরা।

মি. হায়দারকে দেখে মি. শরীফ ছাড়া সবাই উঠে দাঁড়াল।

বারান্দা থেকে উঠানে নেমে মি. হায়দার বললেন, 'বসুন, আপনারা বসুন।'

ক্লার্ক মোশাররফ বয়সে তরুণ। নতুন এসেছে চাকরিতে। বিনয়ের অবতার ছেলেটি। মি. হায়দার একটু বিরূপ এবং সন্দেহের চোখেই তাকে দেখেন। তার ধারণা এত বিনয় ভাল নয়। হয় সে হীনমন্যতায় ভুগছে নয়ত বিনয়টা তার কৃত্রিম।—সেক্ষেত্রে ছেলেটি অতি চালাক।

জিয়া সাহেব—মি. হায়দারের ধারণা সৎ লোক। একটা পয়সার এদিক ওদিক হয়নি তার হাত থেকে আজ অবদি। চাকরিও করছেন প্রায় আট বছর ধরে। প্রায় মি. হায়দার এবং মি. শরীফের সময় থেকে। ওরা দুজনেও আজ আট বছর ধরে চাকরি করছেন বাঙলা ব্যাঙ্কে।

মোশাররফ প্রচুর বিনয়ের হাসির সাথে নরম ভারী ডালের মত নুয়ে পড়তে পড়তে এক'পা সরে গিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'সে কি হয়, স্যার! আপনি বসুন। আমি

দাঁড়িয়ে থাকি।'

মি. শরীফ বললেন, 'কি ব্যাপার, হায়দার?'

মি. শরীফের গলায় একটু যেন বিরক্তির সুর।

হেসে ফেললেন মি. হায়দার। শরীফ যে বিরক্ত হয়েছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আজ ঢাকায় টাকা পাঠাতে হবে। তাই ডেকে পাঠিয়েছি তোমাদেরকে।'

এর আগেও ঢাকায় টাকা পাঠাবার সময় এমনি হঠাৎ পরিকল্পনা করে বসেছেন মি. হায়দার। কিন্তু সাত-সকালে সকলকে ডেকে আগে কখনও একথা বলেননি তিনি।

মি. শরীফ অধিকতর বিরক্তির সুরে বললেন, 'এর কোন মানে হয়, বলো তো? কালকেই তো খবরটা জানাতে পারতে তুমি?'

কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে তাকিয়ে রইলেন মি. হায়দার। কি বলবেন তিনি উত্তরে? বলবেন, তোমাদেরকে আমি বিশ্বাস করি না তাই খবরটা আগে থেকে জানাইনি? তা বলা সম্ভব নয়।

তাছাড়া সত্যিসত্যি তিনি কাউকে অবিশ্বাস করেন না। কেন যে তিনি টাকা পাঠাবার সময় এরকম অস্বাভাবিক গোপনীয়তা পালন করেন তা তিনি নিজেই ভাল করে জানেন না। হয়তো স্বভাব। হয়তো অহেতুক ভয়। হয়তো তিনি কোন রকম ঝুঁকি নিতে একেবারেই পছন্দ করেন না।

কিন্তু মি. শরীফ যে আজ এত বেশি বিরক্ত হবে তা ভাবেননি মি. হায়দার। অপ্রতিভ হাসিটা মুছে ফেললেন তিনি জোর করে মুখ থেকে। বললেন, 'অফিশিয়াল ব্যাপারগুলো কেমন বোঝো তো, শরীফ? তাছাড়া আমি নিজেই ঠিক করতে পারছিলাম না কবে পাঠানো যায় টাকাগুলো। আজ সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি সূর্য ওঠেনি। ভাবলাম কাজটা সেরে ফেলাই যাক।'

'ভাল কথা, যেমন বুঝেছ ভালই বুঝেছ। ক'টার ট্রেনে যাবে টাকা? এখনও কেউ আমরা নাস্তা করিনি।'

মি. হায়দার পিছন ফিরে তাকালেন। লতিফ পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'লতিফ, হোটেলে গিয়ে নাস্তার অর্ডার দিয়ে এসো তো। কিন্তু ট্রেন যে ন'টায়।'

মি. শরীফ উঠে দাঁড়ালেন ন'টায় ট্রেন শুনে। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঢাকায় ট্রেন পৌঁছবে সাড়ে এগোরোটার সময়। এখন নাস্তা করার সময়ও নেই। দরকার নেই নাস্তার। টাকার ট্রাঙ্ক বের করে ভ্যানে চড়াতে হবে, স্টেশনে যেতে হবে—সময় কই অত? আটটা তো প্রায় বাজেই।'

মি. হায়দার বললেন, 'স্টেশনে গিয়ে নাস্তা করলেই চলে।'

'তাই করব।'

শান্ত হয়ে গেছেন মি. শরীফ। কাজটা যখন হতে যাচ্ছে, হোক নির্বিঘ্নে, ভাবটা এই রকম।

লতিফ বলল, 'স্যার, আপনি তো আবার বাইরের চা খান না।'

মি. শরীফ তাকালেন লতিফের দিকে। ঠিকই বলেছে লতিফ। মি. শরীফ প্রচুর চা পান করেন। কিন্তু হোটেলের চা খান না।

'তোমার স্টোভটা নিয়ে নাও ভ্যানে। চা'র পাতা, দুধ কিনে নাও। ট্রেনেই তৈরি করে খাওয়া যাবে। এক প্যাকেট বিস্কুটও নিয়ো।'

গ্যারেজ থেকে মিনি ভ্যানটা বের করে উঠানে আনা হলো। ট্রাঙ্কগুলো বের করা হলো। মোট পাঁচটা ট্রাঙ্ক। সতেরো লাখ টাকা ভিতরে।

সাড়ে আটটার ভিতর রওনা হয়ে গেল মিনি ভ্যানটা বাঙলা ব্যাঙ্কের উঠান থেকে সতেরো লাখ টাকা নিয়ে স্টেশনের দিকে।

সাথে গেল মি. শরীফ, জিয়া সাহেব, মোশাররফ এবং লতিফ।

স্টেশনে থাকবে সাদা পোশাক পরা দুজন পুলিস অফিসার। কিন্তু তাদের কথা এঁরা কেউ জানেন না। জানেন শুধু মি. হায়দার। তিনিই ফোন করে গতকাল পুলিসের ব্যবস্থা করেছেন।

তিন

সোনাডাঙ্গা থেকে প্রথম ট্রেনটা ছাড়ে সকাল সাড়ে সাতটায়। প্রচণ্ড ভীড় হয় সেটায়। সোনাডাঙ্গার বহু লোক ঢাকা, মাধবপুর, কৈলাসনগর, ধুপখোলায় চাকরি করে। ডেইলী প্যাসেঞ্জার প্রচুর। প্রথম ট্রেনেই সবাই যায়। দ্বিতীয় ট্রেনটা ন'টায়। ভীড় হয় না বললেই চলে।

কিন্তু মিনি ভ্যান থেকে স্টেশনের ভিতরে নেমে চক্ষুস্থির সকলের। স্টেশনে ঢোকা মুশকিল। ভীষণ ভীড়। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে রীতিমত।

ছোট্ট স্টেশন। পঞ্চাশ জন লোক জমা হলেই দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যায় না। তারমধ্যে এত ভীড়। মি. শরীফ কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়েছেন। লতিফ কি মনে করে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল একবার। দু'মিনিট পরই ফিরে এল সে।

'কি ব্যাপার?' গাড়ির ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন মি. শরীফ।

লতিফ হাসছে। চোখে মুখে কৌতূহল, শ্রদ্ধার ভাব তার।

হাসতে হাসতেই সে বলল, 'সেই ছেলেটা, স্যার। ডানপিটে সেই ছেলেটাকে লোকেরা পৌঁছে দিতে এসেছে। সাব্বাস ছেলে বটে। এ কদিন সারাটা গ্রামকে···।'

মোশাররফ বিনয়ের অবতার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লতিফের চেয়ে বয়সে সে ছোট বলেই হোক কি অন্য কোন কারণেই হোক, কথা বলে অতি সমীহ ভাবে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু যদি মনে না করো, লতিফ ভাই, তাহলে আমি

একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি।'

'কি কথা?'

লতিফও মোশাররফের এত বিনয় সহ্য করতে পারে না।

'তুমি ভাই যে ছেলেটির কথা বলছ তার নাম কি? কে সে?'

লতিফ বলে উঠল, 'আপনি সাহেব আশ্চর্য মানুষ। এই কদিন গ্রামে ছিলেন না? সারা গ্রামের লোক চেনে, নাম জানে তার, আর আপনি বলছেন···।'

লতিফ মুখ ফিরিয়ে নিল।

মোশাররফ এবার বলল, 'তুমি বুঝি, ভাই, মি. রাসেল আহমেদের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

মোশাররফ বিনয়ের সাথে হাসল। বলল, 'কিছু যদি মনে না করো, ভাই, তাহলে বলি; দোষটা আমার না। তুমি বললে সেই ছেলেটা। মি. রাসেল আহমেদকে "ছেলে" বলা উচিত হয় না, ভাই। তিনি আমার বন্ধু। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। বাংলাদেশের বীর সন্তান তিনি···।'

মাঝপথে বাধা দিল লতিফ। বলল, 'আপনি সাহেব বড় বেশি কথা বলেন। ওর বন্ধু হলেন আপনি কিভাবে শুনি?'

'তোমার তো দোষ নেই, ভাই,' বলল মোশাররফ, 'তুমি তো দেখনি। একদিন পথে বীর সন্তান মি. রাসেল আহমেদের সাথে আমার কথা হয়েছিল। তিনি আমাকে বাজারে যাবার পথটার হদিস জানতে চেয়েছিলেন। দু'একটা অন্যান্য কথাও আমাদের মধ্যে হয়েছিল। সেই থেকে আমি তাকে বন্ধু বলে···।'

মি. শরীফ ওদের কথা শুনছিলেন না। অস্বাভাবিক চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। শেষ অবধি কি ভেবে গাড়ি থেকে নেমে স্টেশন মাস্টারের কামরার দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

গত কয়েকদিনে সোনাডাঙ্গা গ্রামটাকে তোলপাড় করেই ছেড়েছে বটে রাসেল। সোনাডাঙ্গার আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সবাই রাসেলকে দেখেছে। সবাই রাসেলকে চিনেছে। অথচ সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই বড় মজার। রাসেল সোনাডাঙ্গায় পা ফেলতে না ফেলতে কিভাবে যেন রটে গেল যে সে হরিণ শিকার করতে এসেছে। ব্যস। অমনি সোনাডাঙ্গার সব লোক খেপে উঠল। কথাটা যে-ই শুনল সে-ই শত্রুতে পরিণত হলো রাসেলের।

কলেজ ছুটি হবার পর রাসেল বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য ছেলেরা ক'দিন থেকেই যে-যার দেশের বাড়িতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। ওদের ব্যস্ততা দেখে মনটা খারাপ হতে শুরু করে রাসেলের। ঘরের ছেলেরা ছুটির মধ্যে ঘরে ফিরে যাবে। সে যাবে কোথায়?

ঢাকার ছেলে রাসেল। ঘর-বাড়িও আছে। কিন্তু ঘরে মানুষ নেই। মা-বোন ছিল ওর জীবনের সব। তারাই নেই। গত মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছে তারা।

কলেজ খোলা থাকলে লেখাপড়া, বন্ধুবান্ধব, আড্ডা নিয়ে থাকে। সময় কেটে যায় সুন্দর। কিন্তু কলেজ বন্ধ হলেই কেমন যেন ছটফট করে বুকটা।

অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরা ব্যাপারটা লক্ষ না করলেও জামান লক্ষ করেছিল রাসেলের বিষণ্নতা। ছুটির আগের দিন রাসেলের বাড়িতে এসে জামান বলছিল, 'কি রে, এত কি ভাবছিস? একি রাইফেল…।'

অপ্রতিভ হয়ে হেসেছিল রাসেল। বলেছিল, 'ভাবছি ছুটির ক'দিন কোথায় কিভাবে কাটাব। ভাবছি সুন্দরবনে যাই৮ কিন্তু সঙ্গী কোথায় পাই বল তো?'

'সুন্দরবনে যাবি!'

জামানের চোখ জোড়া ছানাবড়া হয়ে ওঠে, 'কেন?'

মৃদু স্বরে উত্তর দিয়েছিল রাসেল, 'পশুপাখি শিকার করা আজকাল নিষেধ। কিন্তু দেখা তো নিষেধের আওতায় পড়ে না। রয়েলবেঙ্গল টাইগার দেখতে যাব।'

আর কোনও কথা বলেনি জামান কয়েক মুহূর্ত। চেনে সে ভাল করে রাসেলকে। যা ভাবছে তা সম্ভব করে তুলবেই সে। কেউ যদি সঙ্গী হতে না চায় তাহলে একাই হয়তো বেরিয়ে পড়বে। না, কোনমতেই জামান রাসেলকে একা ছেড়ে দেবে না।

রাইফেল পরিষ্কার করতে লাগল রাসেল।

'আমাকে নিয়ে যাবি?'

হেসেই বলেছিল জামান। জামানের কথা শুনে হেসে উঠেছিল রাসেল। বলেছিল, 'তুই যে যেতে চেয়েছিস এটাই যথেষ্ট। নারে, তোর দ্বারা হবে না। ভীতুর ডিম তুই। টিকটিকি দেখেই ভয় পাস। আমি আমার মত একজনকে খুঁজছি।'

'সে তুই পাবি না।'

জামান রাসেলের কথা মেনে নিয়ে বলে, 'সবাই আমারই মত, বুঝলি। প্রাণ হারাতে হতে পারে এমন কোন কাজে ক'জন ছেলে পা বাড়ায়। যাকগে, তোর সাথে তো আমার যাওয়া চলবে না। আমার সাথে তুই যেতে পারবি কিনা ভেবে দেখ দেখি।'

চকিতে কেন যেন মুখটা লাল হয়ে ওঠে রাসেলের। হাত দুটো স্থির হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায় ও। জামানের কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেও আবার প্রশ্ন করে ও, 'কি বললি?'

'ঋতু তো তোর প্রশংসায় পাগল। আমাদের বাড়ির প্রতিটি মানুষ তোর চেহারা স্বভাব সব মুখস্থ করে ফেলেছে। ঋতুর পাবলিসিটি! যাবি আমার সাথে?'

যেতে মন চায় রাসেলের! ভাবে ঋতু তাহলে তাকে ভুলতে পারেনি।

জামানের ছোট বোন ঋতু। ঢাকায় এসেছিল প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে। জামানের বোন, রাসেল ঋতুকে নিজের বোনের মত মনে করেছিল। ওদের কোনও আত্মীয়-স্বজন না থাকায় জামান হোটেলেই রাখতে চেয়েছিল ঋতুকে। কিন্তু

আপত্তি করেছিল রাসেল। ঋতুকে তখনও রাসেল দেখেনি। তখনও সে ঢাকায় আসেনি। জামানকে রাসেল বলেছিল, 'তোর হোস্টেলের রুমে কয়েকটা দিন না হয় আমি থাকব। তুই তোর বোনকে নিয়ে আমার বাড়িতে গিয়ে থাক।'

রাজি হয়নি জামান। কিন্তু ধমক দিয়ে রাসেল বলেছিল, 'পাগল না মাথা খারাপ তোর! হোটেলে কোন মেয়ে একা থাকে? খোঁজ খবর রাখিস কিছু শহরের? বহু লোক ঘুর ঘুর করছে সব জায়গায়। এই তো সেদিন…।'

এই এক গুণ রাসেলের। ক্রিমিনোলজি সম্পর্কে মোটা মোটা বই পড়বে সময় পেলেই। আর দেশের কোথায় কি অঘটন ঘটছে তার নিখুঁত হিসেব রাখবে।

ঢাকায় কোথায় ডাকাতি হলো, কোথায় কে খুন হলো—সব জানা চাই ওর।

জামান ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই বলছিস হোটেলে ঋতুকে রাখা নিরাপদ নয়?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি।'

'তবে ভাই তোর বাড়িতে…।'

সব রকমই ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু জামানের অনুরোধে রাসেল ছিল বাড়িতে। ক'দিনের জন্যে আর হোস্টেলে গিয়ে ওঠেনি।

ষোলো কি সতেরো বছর বয়স ঋতুর। কলমি লতার মত বেড়ে উঠেছে সবে। খিলখিল করে হাসে। প্রচুর কথা বলে। ভীষণ অভিমানি। কোন কারণে অভিমান হলে তা বোঝাও যাবে না। কথা বলবে, হাসবে, কিন্তু অল্প অল্প। কোন অভিযোগ জানাবে না, মুখ ভার করে থাকবে না। শুধু শান্ত হয়ে থাকবে। তখনই বুঝতে হবে সে অভিমান করেছে।

পনেরো দিন ছিল ঋতু। এই পনেরো দিনেই ঋতু মনে মনে ভালবেসে ফেলেছিল রাসেলকে।

জামান খানিক পর জিজ্ঞেস করে, 'হরিণ তো আমাদের ওদিকের জঙ্গলেই পাওয়া যায় শুনেছি। দেখে আসবি।'

'তাই নাকি!'

রাসেল বলল, 'তবে প্রথমেই সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গলের মুখোমুখি হবার দরকার নেই। আগে হরিণ দেখেই আসি। তোদের সোনাডাঙ্গাতেই যাই চল!'

কিন্তু সোনাডাঙ্গায় পৌঁছে হরিণ দেখা মাথায় উঠল। ঋতু অবশ্য হ্যাঁ না কিছুই বলল না। চুপ করেই রইল সে। এটা তার আর এক মূর্তি। ঋতু ছাড়া ওদের বাড়ির বাকি সবাই ঘোর আপত্তি জানালেন। জামানের বাবা বললেন, 'কি দরকার বাবা ওই অভিশপ্ত জঙ্গলে ঢুকে। তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছ যখন, তখন আমাদেরই ছেলে। আমরা কি নিজের ছেলেকে জেনে শুনে অমন ভয়ের জায়গায় যেতে দিতে পারি?'

সব ঘটনাই মনোযোগ দিয়ে শুনল রাসেল। ঠগীদের কথা, ঠগীদের বদ আত্মার

কথা রঙ মাখিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীরাই কয়েকজন এসে শুনিয়ে গেল রাসেলকে। সবচেয়ে বেশি ভয় দেখাল তারা প্রাচীন মন্দিরের কথা তুলে। জঙ্গলের ভিতরের ওই অভিশপ্ত মন্দিরে নাকি ভূত-পেত্নীরা থাকে।

সব শুনে চুপ করেই রইল রাসেল দু'দিন। তৃতীয় দিন রাসেল সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে তারা বছরের পর বছর ধরে যা শুনে আসছে তা স্রেফ বাজে কথা। কিংবদন্তী মাত্র। এই অমূলক আতঙ্কে ভোগার কোনও দরকার নেই। সে যাবে জঙ্গলের ভিতর। মন্দিরের ভিতরও ঢুকবে সে। কিছুই তার হবে না। অক্ষত শরীরে ফিরে আসতে পারবে আবার।

আর কেউ না চিনলেও জামান চেনে তার বন্ধুকে। বাধা দিল না সে। বাড়ির সবাইকেও বাধা দিতে নিষেধ করে দিল।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। গ্রামের সর্বত্র হৈ-হৈ পড়ে গেল। প্রবীণ লোকেরা জামানদের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন। বুঝতে পারছিল রাসেল, গ্রামের প্রবীণরা একজোট হয়ে রাসেলের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করছে। তারা গ্রামের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলল। জঙ্গলে যদি রাসেল যায় তাহলে গ্রামের উপর বিপদ নেমে আসবে এই ছিল তাদের যুক্তি। প্রবীণরা বেশির ভাগই অশিক্ষিত। যুক্তির কথা শুনতে তারা রাজি নন। বুঝতে বাকি রইল না রাসেলের যে এদের অনুমতি নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

দেরি করাও যায় না। বুড়োরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নোটিস জারি করে বসলে জঙ্গলে পা দেয়া আর সম্ভব নাও হতে পারে। সব বুঝতে পেরে মনে মনে প্রস্তুত হলো রাসেল।

রাইফেল সে সঙ্গে করে নিয়েই এসেছিল। পরদিন ভোরে ব্যাগে প্রচুর খাবার এবং পানি নিয়ে জঙ্গলের উদ্দেশে পা বাড়াল সে। তখনও সূর্য ওঠেনি। তখনও গ্রামবাসীরা কেউ জাগেনি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ঋতুই পেল রাসেলের চিঠি। জঙ্গলে যাচ্ছে, ফিরতে দু'একদিন দেরি হতে পারে—একথা জানিয়ে চিঠি লিখে রেখে গেছে রাসেল জামানের উদ্দেশে।

চিঠির কথা রটে গেল সারা গ্রামে। সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। সবার মনে ভয়—কি হয় কি হয়! সবার মুখে এক কথা—ছেলেটা তো বড় দুঃসাহসী!

কেটে গেল একটা দিন।

ফিরে এল না রাসেল। উত্তেজনাও বাড়ল সেই সাথে। সারাদিন সারারাত ঘরে বাইরে হাটে মাঠে ঘাটে সেই একই আলোচনা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরও যখন রাসেল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল না তখন সবাই একবাক্যে মেনে নিল যে—ছেলেটা মারা পড়েছে।

কেমন যেন শোকাভিভূত হয়ে পড়ল সোনাডাঙ্গার মানুষরা। রাসেলের প্রতি

ভাল মনোভাব কারুরই ছিল না। কিন্তু ছেলেটি মারা গেছে মনে হতেই দুঃখ পেল সবাই।

কিন্তু তৃতীয় দিন ঘটল আসল ঘটনাটা।

চার

বনভূমিতে প্রবেশ করে রাসেল নিজের অজ্ঞাতেই বেশ একটু সতর্ক হয়ে উঠল।

সোনাডাঙ্গার লোকেদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় এই বনভূমিতে মানুষের পদক্ষেপ পড়েনি কোনদিন। সন্দেহ ছিল এ ব্যাপারে রাসেলের। সন্দেহ নিরসন করাই ওর জঙ্গলে ঢোকার প্রধান কারণ। তাছাড়া প্রাচীন মন্দির সম্পর্কে কৌতূহলটাও কম নয়।

আধঘণ্টাটাক ধীর পায়ে হাঁটার পর বেশ একটু নিরাশই হলো রাসেল। বড় বড় গাছপালার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। ঝোপঝাড় খুব ঘন এবং লম্বা হয়ে আছে। সূর্য উঠল। অথচ সূর্যের আলো গাছের শাখা-প্রশাখা এবং ডালের বাধা পেরিয়ে নিচে নামল না।

যে জঙ্গলে মানুষ প্রবেশ করে সেখানে পায়ে হাঁটার সরু পথ থাকার কথা। তেমন কোন পথ চোখে পড়ল না। একই পথে ঘনঘন জন্তু জানোয়ার চলাচল করলেও সরু পথের সৃষ্টি হয়। তেমন কোন পথও চোখে পড়ল না রাসেলের।

সত্যিই কি এই জঙ্গলে মানুষ প্রবেশ করে না?

জীবিত প্রাণ বলতে প্রচুর সংখ্যক পাখি ছাড়া কোথাও কিছু নেই। শালিক, ঘুঘু, চড়ুই, টিয়া, কোকিল, ময়না, দোয়েল—হরেক রকম পাখি দেখতে দেখতে হাঁটছে রাসেল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ও। একমনে কি যেন ভাবল। তারপর পানি ভর্তি ফ্লাস্ক ব্যাগ এবং রাইফেলটা নামিয়ে বসে পড়ল ঘাসের উপর। মাটিতে কান ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ কি যেন শুনল রাসেল।

মিনিট দুয়েক পর সোজা হয়ে বসল রাসেল। চকচক করছে ওর দুই চোখ। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আপন মনেই বিড় বিড় করে বলে উঠল রাসেল, 'মানুষ তাহলে আছে জঙ্গলে।'

আবিষ্কারের আনন্দে শিস দিয়ে উঠল রাসেল। আবার কাঁধে রাইফেল ও মালপত্র তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

আগের চেয়ে বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছে এবার রাসেল। মাটিতে কান পেতে পরিষ্কার শব্দ শুনেছে ও। একদল লোক বহুদূরে গাছ কাটছে—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

সোনাডাঙ্গা থেকেই দেখা যায় প্রাচীন মন্দিরের উঁচু চূড়া। সেদিকেই এগিয়ে

যাচ্ছিল রাসেল। কিন্তু এবার সে দিক পরিবর্তন করল। উত্তর-পুব বরাবর দ্রুত এগিয়ে চলল ও।

হঠাৎ একটা ঝোপের ভিতর শব্দ হতেই রাসেল থমকে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করল।

পরমুহূর্তে দেখা গেল একটি খরগোশ। ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটছে সাদা খরগোশটা। তার পিছন পিছন বেরিয়ে এল আরও একটা। পেছনেরটা রাসেলকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল। বড় বড় দুই চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল খরগোশটা রাসেলের দিকে। জীবিত বলে চেনা গেল না। এতটুকু নড়ছে না প্রাণীটা। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। প্রথম খরগোশটা অদৃশ্য হয়ে গেছে আরেক ঝোপের ভিতর। দ্বিতীয়টি রাসেলের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

'কি দেখছিস রে?' মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করল রাসেল। অমনি বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মেয়ে খরগোশটার শরীরে। ছুটে পালিয়ে গেল ওটা।

রাসেল এদিক-ওদিক তাকাল ভাল করে। তারপর আবার পা বাড়াল।

যতই এগিয়ে যেতে লাগল রাসেল ততই পরিষ্কার হতে লাগল গাছ কাটার শব্দ। বেলা সাড়ে দশটার দিকে রাসেল দাঁড়াল।

পায়ে চলা সরু পথ সামনে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রাসেল পথটা। জন্তু-জানোয়ারের চলার পথ যে এটা নয় তা ও বুঝতে পারল সহজেই। বেশ চওড়া পথ। মানুষজন যাওয়া-আসা করায় এই পথের সৃষ্টি।

রোমাঞ্চ অনুভব করল রাসেল। সোনাডাঙ্গার লোকেরা যখন শুনবে যে মানুষজন নিয়মিত জঙ্গলে যায় তখন কি বলবে তারা?

কিন্তু কারা আসে জঙ্গলে? তারা কি সোনাডাঙ্গারই মানুষ? নাকি তারা জঙ্গলেই থাকে? ঠগীদের উত্তর-পুরুষরা তবে কি এখনও আছে এই জঙ্গলে...?

হাসি পেল রাসেলের। অবাস্তব চিন্তা করা শোভা পায় না তার পক্ষে। ঠগীরা কয়েক যুগ আগে মরে ভূত হয়ে গেছে।

মিনিট পনেরো সেই পথ দিয়ে হাঁটার পর থমকে দাঁড়াল রাসেল। চিন্তার অতীত একটা দৃশ্য দেখে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়ল ও।

পায়ে হাঁটার মেঠো পথটা ভাগ হয়ে গেছে দুই দিকে। একটা চলে গেছে বাঁ দিকে, অপরটি ডান দিকে। ডান দিকের পথ ধরে কয়েক পা যেতেই রাসেল দেখল প্রকাণ্ড একটা জায়গা!

ফাঁকা জায়গাটা এককালে জঙ্গলেরই অংশ ছিল। জঙ্গলের গাছ কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। এখনও কাটা গাছের মোটা ছোট ছোট কাণ্ডগুলো দেখা যাচ্ছে। প্রায় আধমাইল লম্বা হবে জায়গাটা। একেবারে শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো লোককে। খালি গায়ে কুড়াল দিয়ে গাছ কাটছে তারা। একজন দুজন নয়, সংখ্যায়

তারা প্রায় একশো সোয়াশো জন হবে।

কাঠ কাটছে, ওরা কাঠুরে। কিন্তু কেন যেন সন্দিহান হয়ে উঠল মনটা রাসেলের। ঝট করে একটা গাছের আড়ালে সরে গেল ও, যেন ওকে দেখে না ফেলে। আড়াল থেকে দূরবর্তী লোকগুলোর কাঠ কাটা দেখতে দেখতে অনেক প্রশ্ন জাগল ওর মনে।

কারা এরা? গাছ কেটে কোথায় নিয়ে যায়? কোন্ পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে?

সোনাডাঙ্গার লোকেরা কেন বলে যে এই জঙ্গলে মানুষ প্রবেশ করে না? কে তাদেরকে ধোকা দিয়ে রেখেছে এতদিন? এতগুলো লোক কাঠ কাটছে, কোথা থেকে এসেছে এরা? কে নিযুক্ত করেছে এদেরকে? সরকারী অনুমতি নিয়ে, না বেআইনি ভাবে কাঠ কাটছে এরা?

নিশ্চয়ই এরা গোপনে কাঠ কাটছে। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ রইল না রাসেলের মনে। তারমানে ওরা চায় এই গাছ কাটার কথা যেন কেউ না জানে। হঠাৎ যদি ওরা জানতে পারে যে রাসেল ওদের গাছ কাটা দেখে ফেলেছে—তাহলে?

তাহলে হয়তো ওরা রাসেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। হয়তো খুনই করে ফেলবে এই জঙ্গলে। কেইবা জানবে যে রাসেল খুন হয়েছে? সবাই বলাবলি করবে ঠগীদের আত্মা বা মন্দিরের ভূতেরা মেরে ফেলেছে ছেলেটাকে।

অপেক্ষা করাই স্থির করল রাসেল। গাছ কাটা শেষ করে কোথায় যায় লোকগুলো দেখা দরকার। সব না দেখে এই জঙ্গল থেকে বের হবে না ও।

হাতের রাইফেল মাটিতে নামিয়ে রাখল রাসেল। চওড়া একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।

ফ্লাস্ক এবং ব্যাগ নামিয়ে একটি মাঝারি আকারের ঝোপের দিকে পিছন ফিরে বসে পড়ল রাসেল। পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল সজোরে পিছনের ঝোপটা।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে সবেগে উঠে দাঁড়াল রাসেল মাটি থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে।

লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগারে চাপ দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল।

প্রাণপণে ছুটছে লোকটা।

রাসেলের পিছনের ঝোপের আড়ালেই ছিল লোকটা।

ঢোলা প্যান্ট লোকটার পরনে। মাথায় সাহেবী টুপি। রোগা লম্বা লোকটা দ্রুত ছুটছে।

চিনতে পেরেই গুলি করল না রাসেল। লোকটাকে পিছন থেকে দেখেও চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি রাসেলের।

কিন্তু ডি. কস্টা অদৃশ্য হয়ে যেতেই জটিল একটি প্রশ্নের উদয় হলো রাসেলের মনে।

কুয়াশার অনুচর ডি. কস্টা এই বনভূমিতে কেন এসেছে? তবে কি কুয়াশাও

আছে এই জঙ্গলে? তবে কি কুয়াশাই গাছ কাটাচ্ছে?

কোন প্রশ্নেরই কোনও সদুত্তর পেল না রাসেল। ভাবতে ভাবতে দুপুর হলো।

গাছের আড়াল থেকে রাসেল এবার আরও একটি অদ্ভুত জিনিস দেখল।

দুপুরের খাবার খাচ্ছে কাঠুরেরা। সারি সারি বসেছে সবাই। বেশ কয়েকজন লোক তাদেরকে পরিবেশন করছে।

খুব সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু ব্যবস্থাটার মধ্যে অতিরিক্ত কি যেন আছে। একদল কাঠুরেকে কি এমন বসিয়ে সুশৃংখল ভাবে খাবার খেতে দেয়া হয়?

এ থেকেই রাসেলের মনে হলো লোকগুলো কোন সুসংগঠিত দলের লোক। এদের একজন নেতা আছে, কর্তা আছে, তার নির্দেশেই এরা চলে।

সন্ধ্যা নামার প্রায় আধঘন্টা আগে গাছ কাটা শেষ করল লোকগুলো।

কাটা গাছগুলো সেখানেই পড়ে রইল। লোকগুলো গায়ে জামা চড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

সাবধানে লুকিয়ে রইল রাসেল।

লোকগুলো যত এগিয়ে আসছে বিস্ময় ততই বেড়ে যাচ্ছে রাসেলের। পরিশ্রমী লোকেরা স্বাস্থ্যবান হয় তা ঠিক। কিন্তু এই লোকগুলোকে দেখে রাসেলের মনে হলো এরা এক একজন ডাকাত। ডাকাতের মতই চেহারা প্রত্যেকের। ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল, ইয়া চওড়া বুক, চোখে কঠোর দৃষ্টি।

সামনে এসে পড়েছে লোকগুলো। রাসেল ভাল করে দেখতে লাগল আড়াল থেকে। সব লোকই যে ডাকাতদের মত তা নয়। নিরীহ, ক্ষীণদেহী লোকও রয়েছে বেশ কয়েকজন।

চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল লোকগুলো পায়ে হাঁটা চওড়া পথ দিয়ে।

লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবার পর রাসেল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পা চালাল।

লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাদের কথাবার্তার শব্দ কানে আসছে গুঞ্জনের মত। সেই শব্দ লক্ষ্য করেই অনুসরণ করে চলল রাসেল।

পায়ে চলা পথ ধরে প্রায় পনেরো মিনিট হাঁটার পর দাঁড়িয়ে পড়ল রাসেল।

সামনে প্রাচীন মন্দির। গাছের আড়াল থেকে রাসেল দেখল ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে লোকগুলো ঢুকছে মন্দিরের ভিতর।

দেখতে দেখতে মন্দিরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সবাই।

এসবের রহস্য কি বুঝতে পারল না রাসেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ফিরে যাবে ও সোনাডাঙ্গায়?

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না রাসেলের। নিশ্চয়ই আগামীকালও লোকগুলো যাবে গাছ কাটতে। সেই সুযোগে রাসেল মন্দিরে ঢুকবে। দেখবে কি করে

লোকগুলো ওখানে। রাতটা কোন উঁচু গাছে কাটিয়ে দেবে স্থির করল রাসেল।

পরদিন সকালে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল লোকগুলো আবার। কুঠার হাতে নিয়ে চলে গেল সবাই গাছ কাটতে।

বেশ খানিক পর মন্দিরের দিকে পা বাড়াল রাসেল।

দাঁত বের করে হাসছে প্রাচীন মন্দিরের ইঁট বের হওয়া গা। প্রায় শ'খানেক ধাপ সিঁড়ির। এককালে মসৃণ ছিল, এখন ভেঙেচুরে এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে।

প্রকাণ্ড প্রবেশ পথের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সারা শরীরে খেলে গেল অজানা একটি ভয়। কেঁপে উঠল রাসেল।

চারদিকে কেউ নেই। মন্দিরের ভিতর কালীমূর্তির দুই চোখের দিকে তাকিয়ে রইল রাসেল নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

সংবিৎ ফেরার পর রাসেল লক্ষ্য করল কালীমূর্তির সামনেই পড়ে রয়েছে কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের খালি প্যাকেট, গাছের পাতা, ছোট একটা গাছের ডাল ইত্যাদি। পরিষ্কার করা হয় না জায়গাটা। তার মানে পূজা করে না কেউ এখানে।

কালীমূর্তির দিকে আর একবার তাকাল রাসেল। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। ভিতরে আর কোন দরজা নেই। অথচ লোকগুলো এই কামরায় ঢুকেছিল। নিশ্চয়ই গোপন পথ আছে এখান থেকে অন্য কোথাও যাবার।

সতর্ক পায়ে কালীমূর্তির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রাসেল। ছোট একটা জানালা দেখা যাচ্ছে। জানালার গায়ে ধাক্কা দিল রাসেল।

খুলে গেল কপাট দুটো। জানালার মত দেখতে হলেও গরাদ নেই। তারমানে এটা দরজা। একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

ব্যাগ থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল রাসেল।

কাজটা কি ভাল করছ, রাসেল? নিজেকেই জিজ্ঞেস করল ও। হাসল আপন মনে। সামনে একটা বাঁক দেখে নিঃশব্দে পা ফেলে নামল কয়েকটা ধাপ। সোজা নেমে গেছে সিঁড়িটা বাঁক নিয়ে।

সোজা নেমে এল রাসেল প্রকাণ্ড এক আলোকিত উঠানে। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা দেখে মনে মনে খুব অবাক হলো না রাসেল। আগে থেকেই ও অনুমান করেছিল ব্যাপারটা।

এখানে যারা থাকে তারা বেশ পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

উঠানটা ফাঁকা। উঁচু বারান্দা দেখা যাচ্ছে চারপাশে। দরজা দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটা। একটি ছাড়া সব দরজাই বন্ধ।

ফিরে যাওয়া উচিত। মনে মনে ভাবল রাসেল। এটা হয়তো ডাকাতদের আড্ডা। বহু লোককে ধরে নিয়ে এসে জোর করে কাজ আদায় করে এরা, কাঠ

কাটায়। নিজেরা হয়তো রাতে বের হয় আশপাশের গ্রামে ডাকাতি করার জন্যে।

নিশ্চয়ই এই পাতালপুরীতে ডাকাতদের লোক আছে। রাসেলকে দেখলে ছাড়বে না তারা।

দরজাটার পাশে এসে দাঁড়াল রাসেল। উঁকি মেরে দেখল কেউ নেই কামরায়। কামরার অপর দিকে আরও একটি দরজা। সেটাও খোলা। কামরার ভিতর প্রবেশ করবে কিনা ভাবছিল রাসেল এমন সময় কয়েকজন লোকের গলা শোনা গেল। সেই সাথে ভারি জুতোর পদশব্দ।

চমকে উঠল রাসেল।

মন্দিরের বাইরে থেকে গুপ্ত পথে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে কয়েকজন লোক।

এদিক ওদিক তাকাল রাসেল। লুবাকার জায়গা কই?

চিন্তার সময় নেই।

অথচ কোথায় লুকানো যায় ভেবে পাচ্ছে না রাসেল।

এগিয়ে আসছে শব্দ।

নিঃশব্দে কামরার ভিতর প্রবেশ করল রাসেল। মাঝারি আকারের একটি চৌকি খোলা কামরার একধারে।

রাইফেল, ফ্লাস্ক, ব্যাগ কাঁধ থেকে নামিয়ে চৌকির নিচে নিঃশব্দে রাখল রাসেল। নিজেও ঢুকে পড়ল চৌকির নিচে।

পরমুহূর্তেই কামরার ভিতর প্রবেশ করল তিনজন লোক।

তিন জোড়া পা দেখতে পেল শুধু রাসেল। একজনের পরণে দামী কাপড়ের প্যান্ট। অন্য দুজন লুঙ্গি পরিহিত। তিনজনের একজন চিৎকার করে কার যেন নাম ধরে ডাকল। পাশের কামরা থেকেই সম্ভবত সাড়া এলঃ আসছি, হুজুর!

পাশের কামরা থেকে একজন লুঙ্গি পরিহিত লোক এল।

আগন্তুক তিনজনের একজন বলে উঠল, 'সালাম আর জহুরকে গিয়ে খবর দাও। দলবল নিয়ে ওরা যেন কয়েকভাগে ভাগ হয়ে যায়। সোনাডাঙ্গা থেকে এক ছোকরা জঙ্গলে ঢুকেছে গতকাল। এখনও সে ফিরে যায়নি। জহুরকে বলবে ছোকরাকে দেখামাত্র যেন খতম করে দেয়া হয়। এটা আমার কঠোর নির্দেশ। যাও।'

চতুর্থ লোকটি দ্রুত বেরিয়ে যায় কামরা থেকে।

নিজের মৃত্যুদণ্ড শুনে ঘেমে উঠল রাসেল। চৌকির নিচে চুপচাপ পড়ে রইল ও।

'আমরা কি করব, হুজুর?'

'তোমরা থাকো এখানে। সতর্কভাবে থাকবে। বলা যায় না, ছোকরা হয়তো এখানেও ঢুকে পড়তে পারে। আমি চললাম। রাতে আসব।'

প্যান্ট পরিহিত লোকটা বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

কামরার ভিতর একটা বেঞ্চিতে অপর লোক দুজন বসল। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল তারা।

লোক দুজনার কথাবার্তা শুনে রাসেল পরিষ্কার বুঝতে পারল এরা আসলে ডাকাত দলই।

পালানো দরকার। পালাবার উপায় বের করার জন্যে ভাবতে লাগল রাসেল। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরই দ্বিতীয় দরজা দিয়ে কামরায় প্রবেশ করল চারজন লোক।

চিন্তিত হয়ে পড়ল রাসেল।

লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল ও। মন্দিরের বাইরে পাহারা দেবার জন্যে চারজনকে পাঠানো হলো। পাতালপুরীতে তারপরও নয়জন ডাকাত।

ধরা পড়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত?

গভীরভাবে ভাবতে লাগল রাসেল। রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার। নিজের ভুলের জন্যেই এই বিপদে পড়েছে সে।

সকাল থেকে দুপুর হলো, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তারপর হলো সন্ধ্যা। সেই চৌকির নিচে থেকে বের হবার কোন সুযোগই পেল না রাসেল।

কামরার ভিতর, উঠানে এবং মন্দিরের আশপাশে ডাকাত দলের লোকেরা সদাসর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ডাকাতদের কথাবার্তা শুনে সব খবরই পাচ্ছে রাসেল। অসহায়ভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া কোন পথ নেই। পানির পিপাসাটা বেশি কষ্ট দিচ্ছে খিদের চেয়ে। কিন্তু সাহস করে ফ্লাস্ক খুলতে পারছে না রাসেল। সামান্য এতটুকু শব্দ হলেই ধরা পড়ে যেতে হবে। সেই ভয়ে পানি এবং খাবার থাকা সত্ত্বেও নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে ও।

রাত নামতে দেরি হলো না বিশেষ। আবার সেই রহস্যময় প্যান্ট পরিহিত লোকটি এল। সবাই তাকে হুজুর হুজুর করে।

জহুর, মজিদ, ফেলু সর্দার ইত্যাদি কয়েকজনকে নিয়ে গোপন আলোচনার জন্যে অন্য কামরায় চলে গেল প্যান্ট পরা লোকটি।

গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। চৌকির উপর শুয়েছে দু'জন। মন্দিরের বাইরে পাহারায় আছে আটজন। উঠানে দুজন।

উঠানে পাহারা বসানো হয়েছে অন্য কারণে। ডাকাতরা যাদেরকে ধরে নিয়ে এসে কাজ করায় তারা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। গভীর রাতে পানি এবং রুটি খেল রাসেল নিঃশব্দে।

সেই রহস্যময় লোকটি রাতেই চলে গিয়েছিল। পরদিন সকালে সে আবার এল।

কথাবার্তা শুনে রাসেল এবার খুশি হলো।

রাসেল মারা গেছে—এটাই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে নিল ডাকাত দলের 'হুজুর'। কেননা গোটা জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি।

সেদিন গাছ কাটতে গেল অধিকাংশ লোক। পাতালপুরীতে রইল ছয়-সাতজনের মত। ওদের কথাবার্তায় বোঝা গেল মন্দিরের প্রবেশ পথে আর কোন পাহারাদারও নেই।

বেলা এগারোটার সময় সুযোগ পেল একটা রাসেল।

কামরায় কেউ নেই। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ও চৌকির নিচ থেকে।

মন্দিরের বাইরে নিরাপদেই বের হয়ে এল রাসেল। চারদিকে কেউ নেই। জঙ্গলে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

পাঁচ

তৃতীয় দিন রাসেল হাসিমুখে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ফিরে এল গ্রামে।

গ্রামে যেন আনন্দের বান ডাকল। রীতিমত উৎসব শুরু হয়ে গেল রাসেলকে কেন্দ্র করে। প্রতিটি বাড়ির ছেলে-মেয়ে-যুবক-যুবতী-বুড়ো-বুড়ি দেখতে এল রাসেলকে। সবাইকে রাসেল জানাল যে সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল বনভূমিতে। একজন মানুষও সে এই তিনদিন দেখেনি।

বুড়ো-বুড়িরা তাদের মত পরিবর্তন করলেন। তাদের অধিকাংশই বললেন, 'সে কি আজকের কথা। ভূত-পেত্নীদেরও তো মরণ আছে! মন্দিরের ভূতগুলো সব মরে গেছে।'

রাসেল সবাইকে জানিয়ে দিল যে সে মন্দির কোথায় খুঁজেই পায়নি জঙ্গলে।

জামান ঢাকায় চলে গেছে ক'দিন আগেই। গতকাল ওর চিঠি এসেছে। ঋতু কলেজে ভর্তি হবে। ভর্তি করার সব ব্যবস্থা শেষ করেই চিঠি লিখেছে সে।

জঙ্গলে যা দেখেছে রাসেল তারপর আর ঢাকায় ফিরে যাওয়া যায় না। একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু স্থানীয় পুলিসকে কিছু জানাতে চায় না রাসেল। সরাসরি মি. সিম্পসনের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করবে ও।

জামানের মা-বাবা রাসেলকে ছাড়তে চান না। তাদের একই কথা, 'ছুটি তো তোমার এখনও আছে, বাবা। একদিন আগে গেলেই তো চলে।'

গ্রামের যুবকরাও ছাড়তে চায় না রাসেলকে। মাথার মণি করে রেখেছে তারা রাসেলকে। কিন্তু জামানের চিঠি পেয়ে রাসেল যেন মুক্তি পেল। কেমন যেন একঘেয়ে লাগছিল। বৈচিত্র্য যা ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে যুবকদেরকে কয়েকবার নিয়ে গেছে সে জঙ্গলের ভিতর।

জামানের চিঠি পেয়ে জামানের বাবা-মাও আর আপত্তি করার সুযোগ পেলেন

না। রাসেলকে আবার আসতে বলে বিদায় দিলেন তারা। বিদায় দিল গ্রামবাসীরা। যুবকের দল রাসেল এবং ঋতুর সাথে চলল স্টেশন অবদি পৌঁছে দিতে।

স্টেশনে সকলের কাছে বিদায় চেয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল রাসেল।

'রাসেল ভাই, আবার আসবেন!'

'রাসেল ভাই, আমাদেরকে ভুলবেন না!'

'রাসেল ভাই, চিঠি দেবেন!'

চারদিক থেকে এইসব কথা। হাসিমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা কথার উত্তর দিচ্ছিল রাসেল। হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তেই হাসি মুছে গেল তার মুখ থেকে।

লম্বা একটা লোক দ্রুতপায়ে স্টেশনে এসে ঢুকল। আড়চোখে একবার দূর থেকেই দেখে নিল সে যেন রাসেলকে। তারপর দ্রুত ভিড়ের ভিতর দিয়ে ট্রেনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল সোজা কারও দিকে না তাকিয়ে। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি লোকটার। ঋজু দেহ। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। লম্বা লম্বা পা ফেলে ট্রেনের একটি কামরার সামনে এসে দাঁড়াল সে। কোটের হাতা সরিয়ে হাতঘড়িতে সময় দেখল। তারপর উঠে পড়ল ট্রেনে।

রাসেলের কামরা থেকে পাঁচটা কামরার পরের কামরাটায় চড়ল লোকটা।

চিনতে ভুল করেনি রাসেল লোকটাকে। যদিও লোকটা ছদ্মবেশ নিয়ে আছে।

লোকটা যে কুয়াশা তা দেখেই বুঝতে পেরেছে রাসেল। ডি. কস্টার কথা ভোলেনি সে। জঙ্গলে দেখেছে তাকে ও।

কুয়াশাও সোনাডাঙ্গায়! কেন?

প্রশ্নটা মনের ভিতর গেঁথে রইল রাসেলের।

'বুঝলেন মি. শরীফ, ছেলেটা আমাদের সকলের মনে একটা দাগ কেটে রেখে যাচ্ছে।'

স্টেশন মাস্টার মি. হক দ্রুত মি. শরীফের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'বড় বেপরোয়া, যাই বলুন!'

মি. শরীফ গম্ভীর ভাবে শুধু বললেন, 'হুঁ।'

স্টেশন মাস্টার মি. হক মি. শরীফের গাম্ভীর্য খেয়াল করলেন। 'যে কাজটা করে যাচ্ছে তা কিন্তু মোটেই সামান্য নয়, মি. শরীফ। সোনাডাঙ্গার গোটা চেহারাই পাল্টে যাবে, দেখবেন! ভয়ে কেউ ঢুকতই না জঙ্গলে। এখন তো বাচ্চারাও ভয় পাচ্ছে না। কাঠ—ধরুন কাঠের কথাই বলি, গরীব লোকেরা গাছ কেটে কাঠ বিক্রি করেই খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে। প্রচুর হরিণও নাকি আছে। এ বছরই খবর পেয়ে বিদেশী ট্যুরিস্টরা পৌঁছে যাবে। হোটেলগুলো জমজমাট ব্যবসা চালাবে। সত্যি কথা বলতে কি...'

সামনেই দেখা যাচ্ছে মিনি ভ্যানটাকে। মি. হক পিছন ফিরে তাকালেন। পিছন

পিছন চারজন কুলি আসছে।

ভ্যান থেকে কালো ট্রাঙ্কগুলো বের করে ওঠানো হলো ট্রেনে। শেষ বগিটায় তোলা হলো সবগুলো। মি. শরীফ, জিয়া সাহেব, মোশাররফ এবং লতিফ উঠল।

ট্রেন ছাড়ার এক মিনিট আগে ওদের বগিতে উঠল নতুন দুজন ভদ্রলোক। ওরা সবাই ভদ্রলোক দুজনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। স্বাস্থ্যবান দুজনই। তবে চোর-ছ্যাঁচর বা ডাকাত বলে মনে হলো না। শিক্ষিত লোক বলেই মনে হলো। তবে সোনাডাঙ্গার লোক নয়।

মোশাররফ তাদের সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক দুজন জানাল যে তারা সোনাডাঙ্গায় এসেছিল এক আত্মীয়ের বাড়িতে সকালের ট্রেনে, এখন ফিরে যাচ্ছে মাধবপুর।

আর কেউ বুঝতে না পারলেও মি. শরীফ এবং জিয়া সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। ভদ্রলোক দুজন পুলিসের লোক। সাদা পোশাক পরে রয়েছে এই যা। সাবধানতার জন্যে মি. হায়দার এই ব্যবস্থা করেছেন কাউকে কিছু না জানিয়ে।

মি. শরীফ এবং জিয়া সাহেব মনে মনে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও পরস্পরকে তাঁরা কেউ কিছু বললেন না।

মি. শরীফ দাঁড়িয়ে ছিলেন খোলা দরজার সামনে। ট্রেন ছাড়ল।

লতিফ গেছে বাথরুমে।

ভদ্রলোক দুজন বসে আছে একটি বেঞ্চে পাশাপাশি। খবরের কাগজ পড়ছে দুজন ভাগাভাগি করে। মোশাররফ তাদেরই পাশে। সে-ও পাশে বসে কাগজ পড়ার চেষ্টা করছে ঝুঁকে পড়ে।

জিয়া সাহেব অপর এক বেঞ্চিতে ওদের মুখোমুখি বসে। তৃতীয় বেঞ্চিটায় চা'র পাতা, গুঁড়ো দুধের প্যাকেট, কাপ ইত্যাদি নিয়ে একটি ঝোলা। মি. শরীফ দরজার কাছ থেকে সরে এসে বেঞ্চটায় বসলেন।

টাকাভর্তি ট্রাঙ্কগুলো পাশাপাশি রাখা হয়েছে বেঞ্চের নিচে।

পরবর্তী স্টেশন মাধবপুর। তারপর বিশ মাইল দূরে ধুমনগর।

মাধবপুর এবং ধুমনগরের মাঝখানে ছোট্ট একটা স্টেশন আছে বটে। কিন্তু আজকাল সেখানে ট্রেন থামে না। স্টেশনটা ভেঙেচুরে দিয়েছিল খান সেনারা। এখনও মেরামত করা হয়নি। তাছাড়া এই স্টেশনে লোকসমাগম নিতান্ত কম হয় বলে কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয়।

মি. শরীফ বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন কেন কে জানে।

লতিফ বাথরুম থেকে বেরুবার পর তিনি বললেন, 'চা করো তো।'

কথা বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি করতে শুরু করল লতিফ।

পিছনের বগিটায় গার্ড আছেন। গার্ড ভদ্রলোক বুড়ো। খবরের কাগজ পড়ছেন। মি. শরীফের সামনের বগিটায় পাঁচজন লোক উঠেছে। পাঁচজন শক্ত সামর্থ চেহারার লোক। একটা বেঞ্চিতে বসে চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে তারা। ঘনঘন ঘড়ি দেখছে একজন। আর একজন দু'মিনিট পরপরই খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখে নিচ্ছে।

পাঁচজনেরই চোখে মুখে উত্তেজনা।

এই পাঁচজন যে বগিটায় রয়েছে তার পাশের বগিটায় রয়েছে কুয়াশা।

কুয়াশা ছাড়া আর কেউ ওঠেনি এই বগিতে।

আরও পাঁচটা বগির পরের বগিটায় রাসেল এবং ঋতু।

ওরা পাশাপাশি বসেছে।

'আপনি কি সব সময় সকলের অমতে কাজ করতে ভালবাসেন, রাসেল ভাই?' হঠাৎ প্রশ্ন করল ঋতু।

'হঠাৎ এ কথা?' একটু অবাকই হলো রাসেল।

ঋতু জবাব দিল না। রাসেলই আবার বলল, 'সকলের অমতে মন্দিরে গিয়েছিলাম বলে ও-কথা বলছ? কিন্তু তুমি তো বাধা দাওনি আমাকে।'

'বাধা দিলে আপনি শুনতেন?' একটু যেন গম্ভীর হলো ঋতু।

চুপ করে রইল রাসেল।

চুপচাপ বয়ে চলেছে সময়। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ঋতু। কেন যেন দুই চোখে জল ভরে উঠেছে তার। কত কথা বলার জন্যে ছটফট করছে মন। কিন্তু বলতে পারছে না সে লজ্জায়।

ট্রেনের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। সামনে স্টেশন।

দু'মিনিট পরই ছেড়ে দিল ট্রেন। কয়েকটি কামরায় আরোহী উঠল দুই কি তিনজন। নামল চারজন।

চায়ের কাপ সামনে ধরে লতিফ ডাক দেয়ায় মি. শরীফের চিন্তাজাল ছিঁড়ে গেল।

লতিফ বলল, 'চা নিন, স্যার।'

লতিফের হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে বেঞ্চে ফিরে এসে বসলেন মি. শরীফ।

লতিফ সবাইকে এক কাপ করে চা দিল। সাদা পোশাক পরা অপরিচিত লোক দুজনকেও দিল সে চা। সবাই খাবে আর ওরা বাকি থাকবে তা কেমন যেন খারাপ দেখায়। তাছাড়া মি. শরীফও ইঙ্গিতে চা দিতে বললেন ওদেরকে।

সামনে ধুমনগর। অনেক দূর। মাঝখানে পড়বে আমড়া গ্রাম। আমড়াগ্রাম স্টেশনে ট্রেন থামবে না।

'সুন্দর হয়েছে চা'টা।' মি. শরীফ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কিন্তু এত তেতো কেন? চিনি দাও তো লতিফ।'

'হ্যাঁ। বড় তেতো,' বললেন জিয়া সাহেব।

মোশাররফ বলল, 'চিনি এদিকেও দিয়ো তো, ভাই লতিফ। কিছু মনে কোরো না ভাই, চা-র পাতা বড় বেশি দিয়ে ফেলেছ তুমি।'

দু'এক ঢোক করে চা খেয়ে সবাই মন্তব্য করছে। লতিফ নিজেও স্বীকার করল অভিযোগটা।

চিনির পেয়ালাটা মি. শরীফের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'বড় বেশি তেতো, ঠিকই বলেছেন, স্যার। কিন্তু...'

জড়িয়ে এল লতিফের কণ্ঠস্বর। টলছে সে।

সবাই লক্ষ্য করছিল লতিফকে। মোশাররফ লতিফকে ধরার জন্যে উঠে দাঁড়াল। প্রায় একই সময় উঠে দাঁড়ালেন মি. শরীফ।

লতিফের দিকে দুজনই হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু লতিফকে ধরে পড়ে যাওয়া থেকে সামলাতে গিয়ে নিজেকে সামলানোই দায় হয়ে পড়ল মোশাররফের।

'একি...!'

কথা শেষ হলো না তার। টলতে টলতে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে।

প্রায় একই সময় পড়ে গেলেন মি. শরীফ। মি. শরীফের পাশেই পড়ে গেল লতিফ।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল দুই অপরিচিত ভদ্রলোক। কিন্তু তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই টলতে টলতে পড়ে গেল।

জিয়া সাহেব বেঞ্চি ছেড়ে ওঠেননি বা ওঠবার চেষ্টা করেননি।

তিনি আর সকলের মতই জ্ঞান হারিয়েছেন, বেঞ্চের উপর ঘাড় গুঁজে পড়ে আছেন তিনি।

ট্রেনের এই বিশেষ কামরাটির ভিতর নেমে এল নিস্তব্ধতা। ছয়জন আরোহীই একযোগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। আর তাদের সাথে রইল সতেরো লাখ টাকা।

কিন্তু টাকাগুলো বেশিক্ষণ রইল না সেখানে।

ছয়

মি. শরীফদের সামনের বগিটায় ছিল পাঁচজন শক্তিশালী আরোহী। মাধবপুর স্টেশন ছেড়ে ট্রেন মাইল দুয়েক এগোবার পরই তারা নিজেদের বগি থেকে পিছনের বগিটায় যাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল।

চলন্ত ট্রেনের এক কামরা থেকে অপর কামরায় যাওয়া দুঃসাধ্য কিছু নয়।

ট্রেন ছুটছে। লাইনের দুই পাশে ঘন জঙ্গল। লোকজনের চিহ্ন নেই কোথাও।

দরজা, জানালা ধরে নিজেদের বগি থেকে পিছনের বগিতে চলে এল পাঁচজন লোক।

জ্ঞানহীন আরোহীদের দিকে এক পলক তাকিয়েই নিজেদের কাজে মন দিল তারা।

ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে ফেলে যে-যার কোটের পকেট থেকে হলুদ কাপড়ের ব্যাগ বের করল তারা।

টাকার ব্যাণ্ডিলগুলো দশটা ব্যাগে ভরে ফেলতে সময় লাগল তাদের তিন মিনিট।

টাকা ব্যাগে ভরেই পাঁচজন ছুটে গেল খোলা দরজার দিকে।

দুজন তাকাল বাইরের দিকে। দুজনের উপর বাকি তিনজন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'এসে গেছে আমড়াগ্রাম স্টেশন।' সামনের দুজনার একজন চাপা অথচ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল।

দরজার কাছ থেকে সরে এল তিনজন।

ট্রেন এখানে থামবে না। না থামলেও গতি সামান্য শ্লথ হলো।

দরজার সামনে দাঁড়ানো লোক দুজন লাফ দিয়ে নেমে পড়ল আমড়াগ্রাম স্টেশনের পাকা চত্বরে। ট্রেনের সাথে সাথে বেশ খানিকটা দৌড়ে গেল তারা। চমৎকার ভাবে তাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা।

ইতিমধ্যে টাকাভর্তি হলুদ ব্যাগগুলো স্টেশনের প্লাটফর্মে পড়তে শুরু করছে।

চলন্ত ট্রেন থেকে টাকাভর্তি দশটা ব্যাগ পড়ল আমড়াগ্রাম স্টেশনে।

মাধবপুর স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার পর, চলন্ত অবস্থায়, রাসেলদের কামরায় উঠেছিল গাড়ির গার্ড কাম-চেকার।

ওদের টিকেট চেক করে চুপচাপ বসেছিল সে আলাদা একটা বেঞ্চে। আমড়াগ্রাম স্টেশন পেরিয়ে যাব যাব করছে যখন ট্রেন তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চোখ পড়তেই সে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আশ্চর্য তো!'

জানালার ধারেই বসেছিল রাসেল। বাইরের দিকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সে জানতে চাইল, 'কি হয়েছে?'

রাসেল দেখল দুজন লোক হলুদ কয়েকটা ব্যাগ কুড়িয়ে নিচ্ছে। ট্রেন থেকে আরও দুটো ব্যাগ পড়ল প্ল্যাটফর্মে সেগুলোও তুলে নিল তারা।

গার্ড বলল, 'আমড়াগ্রাম স্টেশন আবার নতুন করে চালু হলো কবে থেকে! ভারি আশ্চর্য লাগছে! আমরা জানি না অথচ...'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল গার্ডকে!

'ওগুলো পোস্ট অফিসের মাল। ব্যাগগুলো দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

'ঠিকই বলেছেন।'

সায় দিল গার্ড। বলল, 'হয়তো স্পেশাল ডেলিভারি ছিল কিন্তু আমরা জানব না তা কেমন করে হয়···।'

'সাবধানের মার নেই। চেন টেনে গাড়ি দাঁড় করাতে পারেন।'

স্টেশন থেকে বেশ অনেকটা দূরে চলে এসেছে গাড়ি। গার্ড কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'থাক। ধুমনগরে তো থামবেই। তখনই জানা যাবে।'

ধুমনগরে ট্রেন থামার পর তাড়াতাড়ি করে নেমে পড়ল গার্ড।

যে কামরাটা থেকে হলুদ রঙের ব্যাগগুলো ফেলা হয়েছে আমড়াগ্রাম স্টেশনে সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গার্ড কামরার উপর। তারপরই চিৎকার শোনা গেল তার, 'পুলিস! পুলিস!'

সাত

কামরাটার সামনে ভীড় জমে উঠল গার্ড তখনও চেঁচাচ্ছে, 'ডাকাতি হয়ে গেছে। মরে গেছে কয়েকজন মানুষ! পুলিসকে খবর দিন!'

তখনও জ্ঞান ফেরেনি মি. শরীফ বা অন্যান্যদের।

হৈ-চৈ শুনে রাসেল ঋতুকে বসিয়ে রেখে নেমে এল।

ভীড় ঠেলে মি. শরীফদের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গার্ডকে সে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি?'

'ডাকাতি হয়ে গেছে, সাহেব! কেবিনের ভিতর পাঁচজন লোক মরে পড়ে আছে।'

'কই দেখি!' লাফ দিয়ে কেবিনের ভিতর ঢুকল রাসেল।

মি. শরীফ এবং অন্যান্যরা শুয়ে আছেন কেবিনের মেঝেতে। কারও কোন সাড়া শব্দ নেই। মি. শরীফের একটা হাত তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল রাসেল।

একে একে সকলেরই পালস দেখল রাসেল। বেঁচে আছে সবাই। মরেনি কেউ।

এমন সময় স্টেশন মাস্টার কেবিনে ঢুকলেন। রাসেল গার্ডের উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনি এক বালতি পানির ব্যবস্থা করুন দেখি তাড়াতাড়ি!'

পানির ব্যবস্থা করতে হলো না। জ্ঞান ফিরে এল মি. শরীফের।

চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন মি. শরীফ বোকার মত কয়েক সেকেণ্ড। তারপর আচমকা উঠে বসলেন। এদিক ওদিক তাকালেন। দেখলেন সবগুলো ট্রাঙ্কের ডালা খোলা এবং ভিতরে কিছুই নেই।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন মি. শরীফ। কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'পুলিসে খবর দিন। ও মাইগড! সতেরো লক্ষ টাকা! ডাকাতি...ও মাইগড!'

আবার পড়ে যাচ্ছিলেন মি. শরীফ। গার্ড এবং স্টেশন মাস্টার তাকে ধরে ফেলল।

সতেরো লাখ টাকা ডাকাতি হয়েছে। কথাটা বুঝতে অসুবিধে হলো না রাসেলের। অমনি ওর মনে পড়ে গেল আমড়াগ্রাম স্টেশনে ফেলা হলুদ রঙের ব্যাগগুলোর কথা।

একলাফে কেবিন থেকে নেমে ভীড় ঠেলে নিজেদের কেবিনের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রাসেল।

'কি হয়েছে রাসেল ভাই...'

'ঋতু, কিছু মনে কোরো না তুমি।'

বাধা দিয়ে রাসেল দ্রুত বলে চলল, 'ঢাকায় তুমি এই ট্রেনেই চলে যাও একা, কেমন? আমি...আমাকে একবার আমড়াগ্রাম স্টেশনে যেতে হচ্ছে। কিছু মনে কোরো না...।'

ছুটল রাসেল।

'রাসেল ভাই!'

বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ঋতু। কিন্তু রাসেল তখন অনেকটা দূরে চলে গেছে। শেষ চেষ্টা করল ঋতু। চিৎকার করে বলল সে, 'রাসেল ভাই!'

কিন্তু রাসেল থামল না। চলে গেল ও ঋতুকে ফেলে।

ছুটতে ছুটতে মি. শরীফদের দুটো কেবিনের পরের কেবিনটায় এসে উঠল রাসেল।

যা ভেবেছিল ও তাই। কুয়াশা নেই কেবিনে। অথচ কুয়াশাকে এই কেবিনেই উঠতে দেখেছিল রাসেল।

কুয়াশাকে কেবিনে না দেখে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রাসেল।

স্টেশনে লোক খুব বেশি নয়। প্রতিটি লোকের উপর একবার করে দৃষ্টি ফেলে নিরাশ হলো রাসেল।

স্টেশনের কোথাও নেই কুয়াশা।

একমুহূর্ত কি যেন ভাবল রাসেল। তারপর লাফ দিয়ে নামল ট্রেন থেকে। নেমেই ছুটতে শুরু করল।

ছুটতে ছুটতে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল রাসেল।

চারদিকে লোকজন খুব কম। ধু-ধু করছে ধান খেত। সামনে দুটো সাইকেল রিকশা এবং একটি বেবী টেক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেবী ট্যাক্সির ড্রাইভার উৎসুকদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে রাসেলেরই দিকে।

'কোথায় যাবেন, সাব?' চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'আমড়াগ্রাম স্টেশনে কতক্ষণে পৌঁছুতে পারবে?' সরাসরি প্রশ্ন করল রাসেল।
নড়েচড়ে উঠল ড্রাইভার। একগাল হাসল সে। বলল, 'দশ মিনিটে যামু গা, সাব। আহেন না!'
আর কথা না বলে বেবীতে গিয়ে চড়ল রাসেল।
'আমড়াগ্রাম ইস্টিশনে কি কাম, সাব? আব্বাসের ট্যাক্সি কইরা তিনজন লোক এই মাত্তর গেল দেখলাম…।'
বাধা দিয়ে রাসেল বলল, 'তাই নাকি? লোকগুলো দেখতে কেমন?'
ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ড্রাইভার রাসেলের দিকে। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে সে। চওড়া মেটো পথ। কিন্তু সমান, এবড়োখেবড়ো নয়। তুমুল বেগে ছুটছে বেবী।
'আপনে সাব ভদ্দরলোক। আপনারে কইতে পারি লোকগুলারে তেমন সুবিধার মনে অইল না। আব্বাসের ট্যাক্সিতে চইড়াই দশ টাকার দুই খান নোট বাইর কইরা একজন কইল—জলদি লয়া চল্, ব্যাটা, বিশ টাকা পাবি! লোকগুলা সব দেখতে গুণ্ডাপাণ্ডাগো রহম।'
'ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো তুমি।'
আমড়াগ্রাম স্টেশনে দুজন লোককে হলুদ রঙের ব্যাগ কুড়াতে দেখেছিল রাসেল। আরও তিনজন গেছে বেবী ট্যাক্সিতে। মোট পাঁচজন। দু'একজন আরও হয়তো আছে।
অস্ত্র বলতে পকেটে ছোট একটা ছুরি। রাইফেলটার কথা ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি। নিজেকে তিরস্কার করল রাসেল। ঋতুর কাছে রয়ে গেছে রাইফেলটা। কথা বলার সময় চেয়ে নিলে কাজ হত।
পথের দুই ধারে ফাঁকা মাঠ। কখনও ঝোপঝাড়। কখনও ধানখেত। পিছন ফিরে তাকাল রাসেল।
দেখা যায় না কিছু। ধুলোর পাহাড় শুধু।
মিনিট তিনেক পরই আমড়াগ্রামে ঢুকল বেবী ট্যাক্সি। আঁকাবাঁকা পথ। ঘর-বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে অসংখ্য মোড় নিয়ে আমড়াগ্রাম স্টেশন অবধি।
ঘর বাড়ির সামনে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে। জোরে গাড়ি চালানো অসম্ভব এবং ভয়ানক বিপদজনক।
কিন্তু ড্রাইভার দক্ষতার সাথে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলল বেবী ট্যাক্সিকে। সর্বক্ষণ হর্ন বাজাচ্ছে সে।
মিনিটখানেক পরই ধান খেত পড়ল পথের দুই পাশে।
'ওইযে, সাব, ইস্টিশন দেহা যায়।'
সামনের দিকে তাকিয়ে ভাঙাচোরা স্টেশনটা দেখতে পেল রাসেল। স্টেশনের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিরাশই হলো ও। কোথাও কোন লোকজন নেই। কোথাও কোন গাড়িঘোড়ার চিহ্ন নেই। সব খাঁ খাঁ করছে।

'তোমার আব্বাসের বেবী ট্যাক্সি কোথায়, দেখছি না যে?'

হেসে ফেলল ড্রাইভার।

বলল, 'কোয়েন না, সাব! হের নাম আব্বাস। বিশ ট্যাহা কামাইছে–দেহেন গা, মদ খায়া টলতাছে এরি মধ্যে···!'

স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়াল বেবী। লাফ দিয়ে নামল রাসেল। কাউন্টারের পাশ দিয়ে লোহার খোলা গেট দিয়ে একটা শেডের ভিতর গিয়ে ঢুকল ও।

কেউ নেই শেডের ভিতর।

কিন্তু কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করল রাসেল।

বেবী ট্যাক্সির ড্রাইভারকে টাকা দেয়নি রাসেল। ইচ্ছা করেই। টাকা পেলেই ভেগে যেতে পারে। সেটা চায় না সে। একজন লোক অন্তত কাছাকাছি থাকুক।

আট

শেডের ভিতর জায়গা বলতে অবশিষ্ট নেই এতটুকু। ভাঙা কাঠের চেয়ার, লম্বা লম্বা কাঠ, চটের ব্যাগ, কাগজের স্তূপ চারদিকে। একদিকে দাঁড় করানো রয়েছে অনেকগুলো ড্রাম।

ড্রামগুলোর মাঝখান দিয়ে সরু পথ। পথটা শেষ হয়েছে একটা বন্ধ দরজার কাছে। দরজাটার দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রাসেল।

শব্দটা আসছে ওদিক থেকেই।

কে যেন কাতরাচ্ছে ব্যথায়।

মেঝের দিকে তাকাল রাসেল। চোখকান সতর্ক হয়ে উঠল ওর। ধুলোর উপর পায়ের ছাপ। সেই সাথে টাটকা রক্ত, ফোঁটা ফোঁটা।

এক পা এক পা করে খালি ড্রামগুলো দুই পাশে রেখে দরজাটার দিকে এগিয়ে চলল রাসেল।

দরজার গায়ে কোন তালা নেই। ভিতর থেকে সম্ভবত বন্ধ। বন্ধ না-ও হতে পারে। হয়তো কবাট দুটো শুধু ভেজানো আছে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাসেল। পকেট থেকে আগেই বের করেছে ও ছোট ছুরিটা।

মৃদু ঠেলা দিল দরজার কবাটে।

সাথে সাথে খুলে গেল দরজা।

ছোট একটা কামরা। কামরার ভিতর দুজন লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। একজন নড়ছে চড়ছে না। মারা গেছে সম্ভবত। বুকের কোট, শার্ট রক্তে ভেজা। অপর জনের বুকের কাছটায়ও রক্ত দেখা যাচ্ছে। নড়ছে না সে বিশেষ। কিন্তু মাঝে মধ্যে গোঙাচ্ছে। মৃত্যুপথের যাত্রী সে-ও বুঝতে পারল রাসেল।

পা বাড়াল রাসেল। কিন্তু পরমুহূর্তে কি মনে করে বাঁ দিকে তাকাল একবার।

বাঁ দিকে তাকিয়েই রাসেল দেখল লোহার একটা রড নেমে আসছে তার মাথার উপর।

ড্রামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা।

ছুরিটা ফেলে দিল রাসেল হাত থেকে।

আক্রমণকারীর রডটা সবেগে নেমে এল রাসেলের কাঁধ বরাবর। রাসেল ধরে ফেলল ডান হাত দিয়ে রডটা। পরমুহূর্তে বাঁ হাতের আঙুলগুলো পাশাপাশি রেখে লোকটার গলায় প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল ও।

দুই হাত মাথার উপর তুলে সবেগে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল লোকটা। পড়ল গিয়ে দুটো ড্রামের গায়ে। উল্টে পড়ল ড্রাম দুটো। স্থির হয়ে গেল আক্রমণকারীর দেহটা।

সেদিকে পা বাড়াতে গেল রাসেল। ঠিক তখুনি আবার আক্রান্ত হলো ও।

ডান পাশের ড্রামগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুই জোড়া হাত।

রাসেল টেরই পেল না।

দুই জোড়া হাত জড়িয়ে ধরল রাসেলের পা দুটো।

ঘুরে দাঁড়াবার আগেই পড়ে গেল রাসেল। পড়ার সাথে সাথে কপালের পাশে এসে লাগল একটা প্রচণ্ড ঘুসি।

ঘুসি খেয়েও লাথি চালাল রাসেল। লাগল না সেটা। দ্বিতীয় একটা ঘুসি লাগল রাসেলের নাক বরাবর। তারপর আবার একটা ঘুসি সেই একই জায়গায়।

মাথাটা ঠুকে গেল রাসেলের পাকা মেঝের সাথে।

ড্রামের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল লোক দুজন। কামরার ভিতর তাকাল না তারা একবারও। ভিতর থেকে আহত লোকটার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

যে লোকটার গলায় মেরেছিল রাসেল সেই লোকটার অজ্ঞান দেহটা তুলে নিল লোক দুজনের একজন। শেড ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল তারা।

বেবী-ট্যাক্সির ড্রাইভার রাসেলের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

লোক দুজন অজ্ঞান দেহটা নিয়ে শেড থেকে বেরিয়ে আসতেই হাঁ হয়ে গেল ড্রাইভারের মুখ। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল তার। বুকটা ঢিব ঢিব করতে শুরু করল।

লোক দুজন একটু থমকে দাঁড়াল। ড্রাইভারের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে একমুহূর্ত তাকাল তারা। তারপর একজন অপর জনকে বলল, 'দেরি করলে লাভ কি, চল ভেগে যাই!'

'কিন্তু টাকার কি হবে!' অপরজন চাপা গলায় যেন আর্তনাদ করে উঠল।

'টাকা কি আর এখানে আছে! বড় কড়া ওস্তাদ লেগেছে আমাদের পিছু। সালাম, পটলা—দুজনকে মেরে রেখে গেছে দেখলি তো! চল চল, এখন জান

বাঁচানো ফরজ।'

সিঁড়ি ক'টা বেয়ে নেমে ডান পাশ দিয়ে স্টেশনের দেয়াল ধরে খানিকদূর গিয়েই মোড় নিল ওরা।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বেবী ট্যাক্সির ড্রাইভার। কিন্তু ভয় এখনও দূর হয়নি তার। ওদিকে কোথায় গেল লোক দুজন? রেললাইন টপকে জঙ্গল পেরিয়ে ধুমপাড়ার দিকে যাবে নাকি?

নাকি কাঁধের দেহটা আড়ালে রেখে ফিরে আসবে?

কথাটা মনে হতেই আবার আতঙ্কে অবশ হয়ে গেল ড্রাইভারের হাত-পা।

পালানো দরকার, বুঝতে পারছে ড্রাইভার। লোক দুজন ফিরে এলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু পালাতে যেন মন সরছে না। যে সাহেবকে সে খানিক আগে নিয়ে এসেছে সে কোথায়, কি হালে আছে তা জানা দরকার।

সাহেবটাকে মেরে ফেলল নাকি লোক দুজন?

এমন সময় শোনা গেল একটি গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ।

দেয়ালের আড়াল থেকে কালো রঙের একটা ফোক্সওয়াগেন গাড়ি বেরিয়ে এল।

বেবী-ট্যাক্সির দিকে না এসে সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করল গাড়িটা।

ফাঁকা মেঠো পথ দিয়ে ঝড়ের বেগে পালিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা।

সত্যি সত্যি নিরাপদ বোধ করল এবার ড্রাইভার। যাক, বাঁচা গেল। গাড়ি করে চলে গেল লোকগুলো।

হঠাৎ তার মনে পড়ল সাহেবের কথা। বেবী ট্যাক্সি থেমে নেমে পা বাড়াল সে এবার সিঁড়ি কটার দিকে।

অকারণেই কেঁপে উঠল ড্রাইভারের বুকটা। এইমাত্র সাহেবকে নিয়ে এসেছে সে। কি দেখবে সে এখন কে জানে।

নয়

জ্ঞান ফিরে আসতে রাসেল দেখল ড্রাইভার তার মুখের উপর ঝুঁকে বসে আছে। নাক জ্বালা করছে ভীষণ। হাতটা স্বভাবতই নাকে ঠেকল। হাত নামাতেই লাল তাজা রক্ত দেখতে পেল সে।

উঠে বসতে গেল রাসেল।

'উইঠেন না, সাব!'

ড্রাইভার আপত্তি প্রকাশ করল। ধরল সে দুই হাত দিয়ে রাসেলকে।

উঠে বসল রাসেল। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকের রক্ত মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল ও, 'লোক তিনজন পালিয়েছে না?'

'হ, সাব। কালো একটা গাড়ি আছিল ইস্টিশনের ডাইন পাশে…'
'নম্বরটা দেখেছ তুমি?'
'দেখছিলাম, সাব। কিন্তু ঢাকা ক, না, খ কইতে পারি না। নাম্বারগুলা মনে আছে, তবে শেষেরটা মনে নাই। তিন, দুই, পাঁচ…!'
খুশি হয়ে উঠল রাসেল।
'ওতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। কালো রঙের তাই না?'
'হ, সাব। ভোক্সোওয়াগান।'
জিজ্ঞেস করল রাসেল, 'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম আমি বলো তো?'
'মিনিট দশেক অইব, সাব।'
ঘড়ি দেখল রাসেল। বলল, 'দেখো তো, পুলিসের গাড়ি আসছে কিনা।'
কথা শেষ হবার সাথে সাথে শোনা গেল জীপের শব্দ।
এদিক ওদিক তাকিয়ে ছোট ছুরিটা খুঁজতে লাগল রাসেল। পাওয়া গেল সেটা অল্প দূরেই।
ছুরিটা পকেটে নিয়ে পা বাড়াল রাসেল। দরজা পেরিয়ে কামরার ভিতর ঢুকে লাশ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল ও।
এই লোক দু'টোকেই রাসেল ট্রেন থেকে দেখেছিল হলুদ ব্যাগগুলো কুড়াতে।
দু'জনার ক্ষত স্থানই পরীক্ষা করল রাসেল। বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে লোক দুজন। যে গুলি করেছে তার লক্ষ্য অব্যর্থ। ঝানু লোক সন্দেহ নেই রিভলভার বা পিস্তল যাই হোক চালাতে চালাতে হাত পেকেছে। দুজনারই হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে বুলেট।
কুয়াশার মুখটা আর একবার ভেসে উঠল রাসেলের চোখের সামনে।
ভারী জুতোর শব্দ এগিয়ে আসছে।
কামরার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল রাসেল দ্রুত।
খালি কামরা। হলুদ ব্যাগ তো দূরের কথা, কিছুই নেই।
'লোকগুলো যাবার সময় কিছু নিয়ে গেছে? কয়েকটা হলুদ ব্যাগ?' জানতে চাইল রাসেল।
'না, সাব। কিছু নিয়া যাইতে দেহি নাই।'
'আপনারা কে?'
জুতোর শব্দ এসে থামল খোলা দরজার সামনে কয়েক জোড়া।
ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রাসেল। ড্রাইভার লোকটা দ্রুত সরে গেল এক কোণে। পুলিস দেখে ভয় পেয়েছে সে।
ইউনিফর্ম দেখে রাসেল বুঝতে পারল প্রশ্নকারী একজন পুলিস ইন্সপেক্টর। ইন্সপেক্টরের হাতে একটি রিভলভার।
পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াল রাসেল। মৃদু হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। বলল, 'আমি

একজন ছাত্র। রাসেল আহমেদ। 'আমার সঙ্গে ও একজন বেবী ট্যাক্সির ড্রাইভার।'

'কি করছেন আপনারা এখানে?'

ধমক দিয়েই প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর, 'লাশ দুটো কার? কে খুন করেছে?'

'উত্তেজিত হবেন না, ইন্সপেক্টর,' বলল রাসেল শান্ত গলায়। 'আমিও জানতে চাই কে খুন করেছে এই লোক দুটোকে। কিন্তু আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সময় দরকার। আপনি এখানের করণীয় যাবতীয় কাজ করে নিন। আপনার সাথে আমি থানায় যাব। সেখানেই শুনবেন সব কথা।'

ইন্সপেক্টর রাসেলের আপাদমস্তক লক্ষ করল বারকয়েক। কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে কি মনে করে। তারপর পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'নজর রেখো, হাবিব।'

'জ্বী, স্যার!'

ইন্সপেক্টরের নির্দেশ শুনে নিঃশব্দে হাসল রাসেল। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

কামরার ভিতর ঢুকলেন ইন্সপেক্টর। পিছু পিছু ঢুকল একজন কনস্টেবল। কনস্টেবলের পিছনে ধুমনগর স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। সবশেষে ঢুকল ট্রেনের গার্ড।

গার্ড রাসেলকে দেখেই অবাক গলায় বলল, 'আরে, আপনি, এখানে!'

মৃদু হেসে রাসেল বলল, 'আপনাদের আগেই পৌঁছেছি। কিন্তু ফল হয়নি। নাকে মুখে ঘুসি খাওয়াই সার।'

'চেনেন নাকি ওকে?'

'ঠিক চিনি না। তবে উনি ওই ট্রেনেই ছিলেন। একই কেবিনে ছিলাম আমরা। এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হলুদ রঙের ব্যাগগুলো যখন ট্রেন থেকে পড়ছিল তখন তা আমরা দুজনই দেখেছি। ওনার সাথে এক মহিলাও ছিলেন...।'

সব কথা শোনার প্রয়োজন বোধ না করায় কামরা থেকে বেরিয়ে রক্তের ফোঁটা অনুসরণ করে এগিয়ে চলল রাসেল।

ইন্সপেক্টর চোখের ইশারায় নির্দেশ করলেন। কামরার বাইরে দাঁড়ানো রাইফেলধারী কনস্টেবলটি পাঁচ-সাত হাত দূর থেকে অনুসরণ করে চলল রাসেলকে।

রক্তের ফোঁটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে শেডের শেষ মাথায়। সেখানে বড় একটা গেট। গেটটা খোলাই।

গেট অতিক্রম করে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল রাসেল। কনস্টেবলটিও সাত আট হাত পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্ল্যাটফর্মের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় পাশাপাশি চাপ চাপ রক্ত দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গেল রাসেল। রক্তের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে আশপাশের পাকা মেঝের দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকাল ও। জুতোর দাগ দেখা যাচ্ছে ধুলোয়।

নিহত লোক দুজনার পায়ে পুরানো জুতো দেখেছে রাসেল। সেগুলোর ছাপ চেনা গেল। আরও তিন জোড়া জুতোর দাগ দেখল ও। আগের গুলোর মতই। কিন্তু এসব ছাড়াও আর এক জোড়া জুতোর দাগ চোখে পড়ল ওর।

তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জুতোর তুলনায় এই জুতোর ছাপ দেখে বোঝা যায় জুতো জোড়া আকারে বড়। জুতোর নিচেটায় লম্বা লম্বা খাঁজ কাটা ছিল, সেইরকমই ছাপ পড়েছে।

প্ল্যাটফর্মের চারপাশে আর কোথাও কিছু নেই।

ফিরে এল রাসেল সেই কামরায়।

থানায় নিজস্ব আসনে বসে ইন্সপেক্টর আজমল খান রাসেলের সব কথা শুনে মোটেও খুশি হতে পারলেন না। বললেন, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু আপনাকে ও আপনার ড্রাইভার জলিলকে আমরা পেয়েছি দুটো লাশের সাথে। লোক দু'জনকে যে আপনি বা আপনারা খুন করেননি তার প্রমাণ কি? তাছাড়া এই সব ভয়ঙ্কর ডাকাতির ব্যাপারে আপনার মত অল্পবয়স্ক একজন ছাত্র এত বেশি আগ্রহী কেন?'

মৃদু হাসিটুকু এতক্ষণ পর মুছে গেল মুখ থেকে রাসেলের। শান্ত গলাতেই প্রশ্ন করল ও, 'মাফ করবেন। পাল্টা প্রশ্ন আছে আমার। আপনারাই বা এত বেশি আগ্রহী কেন ডাকাতি, খুন, চুরি, রাহাজানি ইত্যাদি সম্পর্কে।'

হাঁ হয়ে গেল ইন্সপেক্টর আজমল খানের মুখ। ছোকরা বলে কি? মাথা খারাপ নাকি?

রেগেমেগে তিনি বললেন, 'আপনি কি ঠাট্টা করছেন আমার সাথে? জানেন না আমরা সরকারী চাকুরে? অন্যায়, অপরাধ, জুলুম রোধ করার জন্যে··· ।'

বাধা দিল রাসেল। বলল, 'অন্যায়, অপরাধ জুলুম ইত্যাদি রোধ করবার জন্যে আপনারা সরকারের টাকা নেন, মানে বেতন নেন। আমি নিই না। আপনার সাথে এই পার্থক্য আমার। আমিও অন্যায়, অপরাধ, জুলুম রোধ করতে চাই। এর বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার থাকতে পারে না। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমারও তো দায়িত্ব, কর্তব্য বোধ, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি আছে। যাকগে, আপনি বরং স্পেশাল পুলিস অফিসার মি. সিম্পসনকে ফোন করুন ঢাকায়। আমার সম্পর্কে তিনি সব জানাবেন আপনাকে। আর শুনুন, বলবেন, কুয়াশাকে ওই বিশেষ ট্রেনে দেখা গেছে। সোনাডাঙা থেকে উঠেছিল সে। কিন্তু ধুমনগরে ট্রেন যখন পৌছোয় তখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

রাসেলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ইন্সপেক্টর আজমল খান।

'ছেলেটি কে?'

এই একটিই প্রশ্ন আজমল খানের।

শহীদের খোঁজখবর নেবার জন্যে রাসেল প্রায়ই যায় একবার করে শহীদের

বাড়িতে।

শহীদ খান বর্তমানে একাকী বাড়ির ভিতরই দিন কাটায়। প্লাস্টিক সার্জারীর পর বিলেত থেকে দেশে ফিরে বই-পত্র এবং ঘুম নিয়েই আছে সে। বাইরে মোটেই বের হয় না। দেখাসাক্ষাতও করে না সকলের সাথে। রাসেল যায়, মি. সিম্পসন মাঝেমধ্যে যান এবং দু'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কারও সাথে সে দেখা করে না।

ছেড়ে দিয়েছে শহীদ গোয়েন্দাগিরি। মুক্তিযুদ্ধে সব গেছে তার। স্ত্রী মহুয়া, বোন লীনা, প্রাণের চেয়ে কম প্রিয় নয় গফুর, বাল্যবন্ধু কামাল—কেউ বাঁচেনি।

সব হারিয়ে পাথর হয়ে গেছে যেন শহীদ। হাসে না সে। কথা বলে খুব কম। রাজ্যের বই নিয়ে পড়ে থাকে বাড়ির ভিতর। দুনিয়ার কোন খবরই রাখে না।

শহীদের বাড়িতেই মি. সিম্পসনের সাথে পরিচয় রাসেলের। শহীদই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সম্ভবত আড়ালে মি. সিম্পসনের কাছে রাসেলের প্রশংসাও করেছিল শহীদ।

মি. সিম্পসন দেখা হলেই নানান ধরনের ক্রাইম সম্পর্কে আলোচনা করতে চান রাসেলের সাথে।

ফোনে খানিকক্ষণ কথা বলার পরই ইন্সপেক্টর আজমল খান রিসিভারটা রাসেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শান্ত এবং মিষ্টি স্বরে বললেন, 'মি. সিম্পসন আপনার সাথে কথা বলতে চান, মি. রাসেল।'

রিসিভার কানে ঠেকাল রাসেল। অপরপ্রান্ত থেকে মি. সিম্পসনের গলা শোনা গেল, 'কেমন আছ, রাসেল?'

'ভালই,' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল রাসেল।

'কুয়াশাকে দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

মি. সিম্পসন জানালেন, 'ইন্সপেক্টর আজমলকে বলে দিয়েছি। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবেন না তিনি। এবং সব ব্যাপারে তোমার পরামর্শ নেবেন। আমি বিকেলেই পৌঁছে যাব। তোমার কি মনে হয়, রাসেল? কুয়াশা এই খুন আর ডাকাতির সাথে জড়িত?'

'প্রমাণ না পেলে বলি কি করে?'

'তা ঠিক। ঠিক আছে দেখা হলে কথা হবে। ছাড়ছি।' ফোন ছেড়ে দিল রাসেল।

অফিসরুমে প্রবেশ করলেন ক্রমান্বয়ে মি. হায়দার, মি. শরীফ, জিয়া সাহেব, মোশাররফ, লতিফ এবং সাদা পোশাক পরা দু'জন পুলিস ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টর আজমল খান রাসেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা জানবার আপনিই জেনে নিন, মি. রাসেল। তারপর আমি…।'

চেয়ার দেয়া হলো। বসলেন সবাই। মি. হায়দার ডায়েরী লেখালেন একটা। ফোনে খবর পেয়ে বাংলা ব্যাঙ্ক থেকে ছুটে এসেছেন মি. হায়দার। ইন্সপেক্টর আজমল খান প্রশ্ন করতে মি. হায়দার এবং মি. শরীফ দুজনই জানালেন যে তাঁরা কাউকে বিশেষভাবে সন্দেহ করেন না।

ডায়েরী লেখা শেষ হবার পরে রাসেল মি. শরীফের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনারা অজ্ঞান হলেন কিভাবে?'

'চা পান করছিলাম আমরা। দু'এক চুমুক পান করার পরই আমরা জ্ঞান হারাই।' বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিলেন মি. শরীফ।

'চা কোথা থেকে এল?'

লতিফ ঢোক গিলল পরপর কয়েকবার। তারপর বলল, 'স্টোভ ছিল আমাদের সাথে, স্যার। আমিই তৈরি করি চা। চা'র পাতা, দুধ, চিনি সব সঙ্গে নিয়েছিলাম আমি।'

রাসেল বলল, 'কোন রকম বিষ মেশানো ছিল চায়ে। হয়তো চিনিতেও ছিল। কিংবা চা'র পাতা বা দুধেও থাকতে পারে। যাকগে। গোটা ব্যাপারটা এমন ভাবে ঘটেছে যে স্বভাবতই মনে হয় ডাকাতরা আগে থেকে সব জানত।'

'তার মানে? আপনি কি বলতে চান?'

প্রশ্নটা মি. হায়দারের।

রাসেল বলল, 'আমি বলতে চাই বাংলা ব্যাঙ্কের কোন কর্মচারী ডাকাতদেরকে সবরকম তথ্য আগে থেকেই সরবরাহ করেছিল। তা না হলে এমন নিখুঁত ভাবে তারা টাকা নিয়ে চম্পট দিতে পারত না।'

'কিন্তু তা অসম্ভব!'

প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মি. হায়দার, 'একমাত্র আমি ছাড়া আজ সকালের আগে আর কেউ জানত না যে ব্যাঙ্ক থেকে আজ টাকা ঢাকায় যাচ্ছে। কোন ট্রেনে যাচ্ছে তা জানা তো একেবারেই অসম্ভব। আমার কর্মচারীদের কোন ভূমিকা এই ডাকাতির সাথে থাকতে পারে না। তারা যখন আমার মুখ থেকে খবরটা পায় তখন থেকে আমার চোখের আড়ালে এদের একজনও কোথাও যায়নি। সোজা স্টেশনে আসে তারা। তারপর ট্রেনে ওঠে। ডাকাতি যে আমার কর্মচারীরা করেনি তাতে সন্দেহ নেই। অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে এদের সবাইকে। এদের সাথে দুজন পুলিস কর্মচারীও ছিলেন। তাঁরাও জ্ঞান হারিয়েছিলেন। আমার কর্মচারীরা ভাড়াটে লোক মারফত এই ডাকাতির ব্যবস্থা করেছে বলে আপনারা সন্দেহ করে থাকলেও তা যুক্তিতে টেকে না। ভাড়াটে লোকদেরকে খবর পাঠাল তারা কখন? সকালে তারা নিজেরাই কথাটা জানতে পারে। তারপর তাদের সুযোগ ছিল না ভাড়াটে ডাকাতদেরকে খবর পাঠাবার।'

রাসেল হেসে ফেলল। বলল, 'এমনও তো হতে পারে যে আপনি যখন এদেরকে খবরটা দেন তার আগেই এদের কেউ খবরটা জেনে ফেলেছিল?'

'অসম্ভব!' জোর দিয়ে বললেন মি. হায়দার। 'আমি কাউকেই এ খবর জানাইনি।

'ভাল করে ভেবে দেখুন। আজকে ঢাকায় টাকা যাবে একথা আপনি কাউকে বলেননি?'

'না। বলিনি।' ভেবে না দেখেই মি. হায়দার জোরের সাথে বললেন।

রাসেল বলল, 'বেশ। আপনাদেরকে প্রশ্ন করে বিশেষ কিছু জানা যাবে বলে মনে হয় না। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। তবে পরে হয়তো আপনাদের সাথে আমি দেখা করব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাসেল।

'চললেন, মি. রাসেল?' ইন্সপেক্টর আজমল খান জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। মি. সিম্পসন বিকেলে আসবেন। ওঁকে বলবেন আমি সোনাডাঙ্গার জামানদের বাড়িতে আছি।' কথাগুলো বলে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল রাসেল।

'ও কে?' জিজ্ঞেস করলেন মি. হায়দার।

'কিছু যদি মনে না করেন তাহলে প্রশ্নের উত্তরটা আমি দেব কি, স্যার?'

বিনয়ে নুয়ে পড়ে জানতে চাইল মোশাররফ।

ইন্সপেক্টর আজমল খান মি. হায়দারের প্রশ্নের উত্তরে কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মি. শরীফ বললেন, 'ছেলেটার নাম রাসেল। ও-ই তো জঙ্গলে গিয়েছিল?'

'জ্বী, স্যার,' উত্তর দিল লতিফ।

মি. হায়দার ইন্সপেক্টরের দিকে তখনও তাকিয়ে আছেন। ইন্সপেক্টরকে উত্তর দিতে না দেখে আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের ব্যাপারে, থানা পুলিসের ব্যাপারে ওর কি ভূমিকা, ইন্সপেক্টর সাহেব?'

রাসেলের উপর মি. হায়দার বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টর কি বলবেন ভেবে না পেয়ে বলে ফেললেন, 'ও, মানে, মি. রাসেল একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

মি. হায়দার এবং মি. শরীফ ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারও মুখে কোন কথা ফুটল না।

বিকেল বেলা সোনাডাঙ্গায় এলেন মি. সিম্পসন। নিজেই দেখা করলেন তিনি রাসেলের সাথে। অনেক আলাপ হলো দু'জনে।

মি. সিম্পসন কুয়াশার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। রাসেল কুয়াশাকে দেখেছে একথা প্রকাশ করলেও ডাকাতি এবং খুনের ব্যাপারে কুয়াশাকে সে জড়াল না।

সবশেষে রাসেল বলল, 'কুয়াশার একটা ভূমিকা এ ব্যাপারে অবশ্যই আছে। তবে প্রমাণ না পেয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না আমি, মি. সিম্পসন।'

রাসেল চায়নি, কিন্তু স্বইচ্ছায় একটি রিভলভার রাসেলের টেবিলে রেখে গেলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'বড় ভয়ঙ্কর লোক এরা রাসেল। আত্মরক্ষার জন্যেও তোমার অস্ত্র দরকার। বিশেষ করে এখুনি তুমি ঢাকায় ফিরছ না যখন।'

'এই রহস্যের সমাধান না হওয়া অবধি তো থাকবই,' হেসে ফেলে বলল রাসেল।

'আমিও তাই চাই, রাসেল। কুয়াশাকে গ্রেফতার করার জন্যে তোমার সাহায্যেরও আমার দরকার।'

উত্তর দিল না রাসেল। মৃদু হাসল শুধু।

রাত নামল।

সোনাডাঙ্গার স্টার হোটেলের সামনে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেল কয়েকজন লোককে। লোকগুলোকে বিশেষ ভাবে কেউ লক্ষ না করলেও একজন হোটেলের ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল তাদের দিকে।

রাত ন'টার দিকে দু'জন লোক ম্যানেজারের কামরায় ঢুকে পড়ল।

লোক দুজন গুণ্ডা পাণ্ডাদের মতই দেখতে। একজন একটু বেঁটে। কিন্তু লোহার মত শক্ত তার মাংসপেশী। অন্যজন খুব লম্বা। সে একাই পাঁচ-সাতজন লোককে সামলাতে পারে।

'কি চাই?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল প্রৌঢ় ম্যানেজার।

'নতুন একজন বোর্ডার এসেছে আপনার হোটেলে। তার রুম নাম্বারটা দিন।'

'কেন?'

এবার ধমকে উঠল বেঁটে, 'যা বললাম তাই করুন। কৈফিয়ৎ দিতে পারব না।'

লম্বা লোকটা পকেট থেকে বের করল একটা পিস্তল। সেটা ম্যানেজারকে ইঙ্গিতে দেখাল।

ম্যানেজার ঢোক গিলে বলল, 'দোতলার সাত নাম্বার রুম···।'

লোক দুজন বেরিয়ে গেল।

ম্যানেজারের কামরার বাইরে অপেক্ষা করছিল আরও চারজন লোক। মোট ছয়জন লোক সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র দুজন।

দরজায় নক করতে খুলে গেল প্রায় সাথে সাথে।

লম্বা, রোগা একটি লোক পিট পিট করে তাকাল ওদের দিকে দরজা খুলে দিয়ে। ঢোলা প্যান্ট পরনে। মাথায় হ্যাট।

বেঁটে লম্বার দিকে তাকাল। বলল, 'এ আবার কে রে?' লম্বা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'এ রুমে কুয়াশা থাকে?'

'ইয়েস। হামি তার ফ্রেণ্ড, স্যানন ডি.কস্টা। হাপনারা কি চান?'

'শুধু দরজাটা খোলা রাখো।'

বেঁটে কথাটা বলেই সিঁড়ির দিকে ফিরে চলল।

সিঁড়ির উপর অপেক্ষা করছিল চারজন লোক। তাদের মধ্যে একজন লোক মুখোশ পরিহিত। বেঁটে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সসম্মানে বলল, 'হুজুর, কুয়াশার রূম পেয়েছি। চলুন।'

মুখোশ পরিহিত হুজুরকে সাথে নিয়ে ওরা সবাই এবার সাত নাম্বার রূমের সামনে এসে দাঁড়াল।

ডি.কস্টা ইতিমধ্যে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। তাকে ধরে রেখেছে লম্বা। চেঁচামেচি শুনে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল কুয়াশা। মোটা চুরুট কুয়াশার মুখে। চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন। ভারি গম্ভীর গলায় সে বলে উঠল, 'কিসের এত হৈ চৈ?'

মুখোশ পরিহিত রহস্যময় লোকটি বলে উঠল, 'আপনিই তো কুয়াশা? আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'এই রকম সং সেজে এসেছেন কেন? কি লাভ? আপনাকে তো পরিষ্কার চিনতে পারছি আমি।'

মুখোশ পরিহিত লোকটি বলল, 'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল কুয়াশা।

মুখোশ পরিহিত বলল, 'যাকগে, আপনার সাথে আমি…'

'কোন কথা নেই আপনার সাথে আমার।'

কুয়াশা মুখোশ পরিহিতের অনুচর লম্বার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক ঘুসিতে তোদের সব কজনের হাড় ভেঙে দিতে পারি তা জানিস! ছেড়ে দে আমার লোককে।'

লম্বা ঢোক গিলল। ছেড়ে দিল সে ডি.কস্টার হাত।

ডি.কস্টা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বলল, 'উহাডেরকে সমুচিট শাস্টি ডিয়া ডিব নাকি, মি. কুয়াশা?'

কুয়াশা কিছু বলবার আগেই মুখোশ পরিহিত কুয়াশার উদ্দেশে বলে উঠল, 'দেখুন, আপনি মারাত্মক ভুল করছেন। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই। যা হবার হয়ে গেছে। আসুন মিটমাট করে ফেলি। কোথায় সরিয়েছেন টাকাগুলো? আমরা বরং সমান অর্ধেক ভাগে ভাগ করে নিই আসুন…।'

'ভালয় ভালয় পালান,' ধমকে উঠল কুয়াশা, 'তা না হলে পস্তাতে হবে, যান।'

কুয়াশার কথা শেষ হতেই ডি.কস্টা দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

'ঠিক আছে, দেখে নেব আমি। আমার নামও…!'

যথাসময়ে নিজেকে সামলে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল মুখোশ পরিহিত। না,

কেউ নেই আশপাশে।

এদিকে কুয়াশা ড্রয়িংরুম থেকে বেডরুমে ঢোকার সাথে সাথে পাঁচজন লোক পাঁচ দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আচমকা।

প্রচণ্ড আঘাত লাগল মাথায়। ঘুরে গেল কুয়াশার মাথা।

'কি হলো, মি. কুয়াশা?' পাশের রুম থেকে শিস দেয়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করল ডি.কস্টা।

কুয়াশা প্রচণ্ড একটা লাথি চালাল সামনের দিকে। কিন্তু লাগল না লাথি। চোখ দুটো খুলতে পারছে না সে মাথার অসহ্য ব্যথায়। আচমকা নড়ে উঠল তার বিশাল দেহটা আবার।

যেন কেঁপে উঠল প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষ। আবার আঘাত করেছে শত্রু মাথায়।

জ্ঞান হারাল কুয়াশা মাথায় লোহার রডের ঘা খেয়ে।

ডি.কস্টা রাদামের খোসা ছাড়িয়ে জড়ো করছিল টেবিলে। পিছনে পদশব্দ হতে সে বলল, 'লোকগুলোকে কেমন জব্দ করে ভেগিয়ে ডিলাম, টাই না?'

পিছন থেকে লোহার রডের ঘা খেয়ে জব্দ হয়ে গেল ডি.কস্টা।

পরদিন সকালে আমড়াগ্রাম থানায় গিয়ে রাসেল জানতে পারল লতিফ সম্পর্কে নানা খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে যে তার অতীত জীবনে কোনরকম কালো দাগ নেই। চিরকালই সে সৎ প্রকৃতির লোক। চোর-ডাকাতদের সাথে তার কোন যোগাযোগ কোন দিনই ছিল না।

লতিফ চা তৈরি করেছিল বলে পুলিসের নজর তার উপরই পড়েছে সবার আগে।

ইন্সপেক্টরকে রাসেল জিজ্ঞেস করল, 'মি. হায়দার এবং মি. শরীফ সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?'

'খোঁজ নেয়া হচ্ছে। বিকেলের মধ্যেই হয়তো খবর পাব।'

মি. সিম্পসন গতকাল ফিরে গেছেন ঢাকায়। আজ সকালেই আবার আসবেন তিনি।

থানা থেকে বেরিয়ে সোনাডাঙ্গায় ফিরে এল রাসেল।

বাংলা ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল রাসেল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লতিফ রাইফেল হাতে। তাকে দেখে এগিয়ে গেল রাসেল।

পদশব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল লতিফ। রাসেলকে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল তার। জোর করে একটু হেসে সে জানতে চাইল, 'কেমন আছেন, স্যার?'

'ভালই আছি। আমাকে দেখে খুব ভয় পেয়েছ, না?'

থতমত খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল লতিফ রাসেলের দিকে।

আশ্বাস দিয়ে হাসল রাসেল। বলল, 'ভয় নেই, লতিফ। সত্যি কথা বলো, কোন ভয় নেই তোমার।'

'স্যার, বিশ্বাস করুন, খোদার কসম বলছি, চায়ের সাথে আমি কিছুই মেশাইনি।'

'বেশ। বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। কে মেশাতে পারে বলে মনে হয় তোমার? কাউকে সন্দেহ করো?'

'ব্যাপারটার কোন কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার। চা, দুধ, চিনি—সব কিনেছি আমি ওই যে, ওই দোকানটা থেকে। ওগুলো প্যাকেটের ভিতর ছিল চিনিটুকু ছাড়া। এক মুহূর্তের জন্যেও কাছ ছাড়া করিনি আমি ব্যাগটা। একটা ব্যাগের ভিতরই ছিল ওগুলো।'

লতিফ অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইল রাসেলের দিকে।

রাসেলকে একটু চিন্তিত মনে হলো। একমুহূর্ত পর ও বলল, 'ঠিক আছে। এ ব্যাপারে পরে আরও কথা হবে তোমার সাথে। আচ্ছা ব্যাঙ্কের কার কার গাড়ি আছে, লতিফ?'

'মি. শরীফের গাড়ি আছে। মি. হায়দারেরও আছে। মি. হায়দার শ্বশুরের কাছ থেকে পেয়েছেন গাড়িটা।'

'সোনাডাঙ্গায় কালো গাড়ি আছে কারও?'

'হ্যাঁ স্যার। কালো গাড়িটাই মিসেস হায়দারের।'

'ঠিক আছে। তুমি তোমার কাজ করো। আবার দেখা করব একদিন।'

পা বাড়াল রাসেল। ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'লতিফ।'

চিনতে পারল রাসেল গলাটা। মি. হায়দারের গলা। রাসেলের সাথে কি কি কথা হলো সে সম্পর্কে জানতে চাইবেন হয়তো তিনি।

আঙুল বাড়িয়ে চা'র পাতা, দুধ এবং চিনির দোকানটা দেখিয়ে দিয়েছিল লতিফ। বাজারের পয়লা দোকান ওটা। আগে শুধু গুঁড়ো চায়ের পাতা বিক্রি হত। এখন দুধ চিনিও পাওয়া যায়।

বাজারে ভিড় খুব কম। বেলা কম হয়নি। দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল রাসেল।

দোকানের ভিতর দুই কি তিনজন মাত্র খরিদ্দার। তাদের মধ্যে একজন মহিলা।

মহিলা অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু চোখমুখ ম্লান, বিষণ্ণ।

দোকানের মালিকের সাথে কথা বলছিলেন মহিলা। দোকানের মালিক বুড়ো। একটাও দাঁত নেই তাঁর।

মহিলাকে দোকানের মালিক বলছিলেন, 'দেশে আর টেকা যাবে না, মিসেস হায়দার। সরকারের কত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল দেখুন দেখি! একটা দুটো টাকা নয়—সতেরো লাখ, বাপরে!'

মহিলা ম্লান মুখে বললেন, 'জিনিসগুলো পাঠিয়ে দিতে ভুলবেন না। বিকেলে চা হবে না তাহলে।'

'ছোকরাটা এলেই পাঠিয়ে দেব, মিসেস হায়দার।'

মালিক বুড়ো তাকালেন রাসেলের দিকে। মিসেস হায়দার দোকান ছেড়ে নিচে নামলেন।

'এই যে, ভাবী, কেমন আছেন?'

এক ভদ্রলোক মিসেস হায়দারকে দেখে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল ওরা দুজন দোকানের বাইরে।

মালিক ভদ্রলোক রাসেলকে দেখেই চিনলেন। হাসলেন তিনি। বললেন, 'কেমন আছ, বাবা? শুনেছিলাম ঢাকায় চলে গেছ··· ।'

'যাওয়া হলো না।'

রাসেল বলল, 'ওই মহিলা মি. হায়দারের স্ত্রী, তাই না, কাকা?'

'হ্যাঁ, বাবা। ডাকাতির কথা শুনেছ বুঝি?'

রাসেল বলল, 'হ্যাঁ। শুধু শুনিনি, দেখেছিও। পুলিসকে অনুসন্ধানের কাজে সাহায্যও করছি আমি।'

'সে তো ভাল কথা!'

কেমন যেন কালো হয়ে গেল বুড়োর চোখমুখ। রাসেল বলল, 'যে-চা খেয়ে মি. শরীফরা জ্ঞান হারিয়েছিলেন সেই চা, চিনি এবং দুধ এই দোকান থেকেই কিনেছিল লতিফ। কথাটা সত্যি, কাকা?'

'কিনেছিল···কিন্তু বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, সাতকুলে কেউ নেই আমার, তুমি কি মনে করো এই ডাকাতির সাথে আমি জড়িত···?'

'তা হয়তো নয়,' বলল রাসেল, 'হয়তো এখান থেকে কিনে নিয়ে যাবার পর কোন একসময় ওষুধ মেশানো হয়েছিল।'

বুড়ো বললেন, 'লতিফ ব্যাঙ্কের জন্যে চা, দুধ সবসময় আমার দোকান থেকেই নেয়। কিন্তু চিনি ছাড়া সবই প্যাকেট করা থাকে। চিনিতেও কিছু মেশানো ছিল বলে মনে করি না, বাবা। অন্তত আমার এখানে কিছু মেশানো হয়নি।'

'মিসেস হায়দার এই দোকানে ছিলেন লতিফ যখন জিনিসগুলো কেনে?'

'ছিলেন। কিন্তু মিসেস হায়দার রোজ অমন কয়েকবারই আসেন।'

'ঠিক আছে। চলি, কাকা।'

মালিক বুড়োর সাথে কথা বললেও রাসেলের মনোযোগ ছিল মিসেস হায়দারের দিকে। যে ভদ্রলোকের সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তিনি সে ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। উল্টো পথে পা বাড়ালেন মিসেস হায়দার। বাজারের ভিতর ঢুকছেন তিনি। খানিকটা দূর থেকে অনুসরণ করল রাসেল মিসেস হায়দারকে।

মিনিট দশেক মিসেস হায়দারের পিছন পিছন ঘুরে বেশ একটু অবাকই হলো রাসেল। মহিলা কিনছেন না কিছুই। শুধু এক দোকান থেকে আর এক দোকানে যাচ্ছেন। জিনিসপত্র দেখছেন, নাড়াচাড়া করছেন, দাম করছেন, কিন্তু না কিনে বেরিয়ে আসছেন।

রীতিমত বিরক্ত বোধ করল রাসেল। কিন্তু মনটাও কেমন খুঁত খুঁত করতে লাগল। আরও সামনে থেকে নজর রাখা দরকার বুঝতে পারল সে।

মিসেস হায়দারের সাথে এবার রাসেল একটি মনিহারী দোকানে ঢুকল। দোকানদার খবরের কাগজ পড়ছিল। মিসেস হায়দারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। রাসেল বলল, 'টুথপেস্ট দিন তো।'

টুথপেস্ট কিনেও দোকান থেকে বের হলো না রাসেল। এটা সেটা দেখতে লাগল। দাম জিজ্ঞেস করতে লাগল। যদিও ওর সম্পূর্ণ মনোযোগ রয়েছে মিসেস হায়দারের উপর।

ধরা পড়ে গেলেন মিসেস হায়দার। রাসেলের তীক্ষ্ণ দুই চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেন না তিনি। দোকানের নানা জিনিস নাড়াচাড়া করতে করতে একটা কাঠ পেন্সিল আর একটা বল পয়েন্ট পেন ভরে নিলেন তিনি ভ্যানিটি ব্যাগে এদিক-ওদিক তাকিয়ে।

অবিশ্বাস্য ঘটনা। চুরি করছেন মিসেস হায়দার! দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি দ্রুত। খানিক পর রাসেলও বের হলো।

আরও দশ মিনিট কাটল। মিসেস হায়দার এই দশ মিনিটের মধ্যে দুই দোকান থেকে আরও চুরি করলেন একটি লেডিস রুমাল এবং একটি নেইল কাটার।

গোটা বাজারটা একবার চক্কর দিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন মিসেস হায়দার।

দুপুরের খানিক আগে বাড়ি ফিরে এল রাসেল। ওর রুমে মি. সিম্পসন এসে বসে আছেন।

মি. সিম্পসন রাসেলকে দেখে বললেন, 'আমড়াগ্রাম স্টেশনের আশপাশে দুটো গাড়ির চাকার ছাপ পাওয়া গেছে। একটি ফোক্সওয়াগেনের, আর একটি মরিসের। কালো গাড়িটা পাওয়া গেছে কৈলাশপুরের এক জঙ্গলের ধারে। আমাদের সন্দেহ ওই গাড়ি করেই ডাকাতরা টাকা নিয়ে ভেগেছে।'

রাসেল বলল, 'না। কালো গাড়িটা করে ডাকাতরা টাকা নিয়ে যায়নি। মরিস করেই নিয়ে গেছে। এবং কালো ফোক্সওয়াগেনটা কার জানেন?'

'কার?'

'বাংলা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মি. হায়দারের স্ত্রীর।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'বলো কি, রাসেল!'

রাসেল বলল, 'কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে মি. হায়দার ডাকাতির সাথে সংশ্লিষ্ট।'

'আচ্ছা, রাসেল, ডাকাতি না হয় হলো। কিন্তু লাশ দুটো কাদের? নিজেদের মধ্যে ডাকাতরা মারামারি করে...।'

হেসে ফেলল রাসেল। বলল, 'মনে হয় না। ডাকাতি যারা করেছে তারা টাকা রাখতে পারেনি। সে টাকাও ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতদেরকে বোকা বানিয়ে, তাদের দুজন লোককে খুন করে আর কেউ টাকা নিয়ে ভেগেছে, মি. সিম্পসন।'

'গুড! তোমার ধারণার সাথে আমি একমত। কিন্তু তথ্য প্রমাণ দেখে আমার কি মনে হয় জানো? মি. হায়দার এ ব্যাপারে কতটুকু জড়িত জানা না গেলেও মিসেস হায়দার যে এই রহস্যের অনেক কিছুই জানেন তা পরিষ্কার। ভাবছি মহিলাকে গ্রেফতার করব কিনা।'

উঠে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন।

রাসেল বলল, 'মরিসটার খোঁজ করুন। ডাকাতদের ওপর যে টেক্কা মেরেছে সে ওই মরিসে করেই এসেছিল। গাড়িটা পাওয়া গেলে অনেকটা কাজ হবে।'

'বিকেলের দিকে থানায় একবার এসো না।'

'আসব।'

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মি. সিম্পসন।

দুপুরের পরপরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলো রাসেল।

কুয়াশার জ্ঞান ফিরল পরদিন বেলা বারোটার দিকে। চোখ মেলে কিছু দেখতে না পেয়ে ও বুঝতে পারল জায়গাটা অন্ধকার। এখন কি রাত? উঠে বসার চেষ্টা করল সে।

সব কথা মনে পড়ে গেল। হাত-পা বেঁধে রেখেছে। কেউ কি আছে এখানে?

কাশল কুয়াশা শব্দ করে।

কেউ সাড়া দিল না।

হাত-পায়ের বাঁধন পরীক্ষা করে কুয়াশা বুঝল বেশ শক্ত করেই বাঁধা হয়েছে। চেষ্টা চালাল সে বাঁধন ঢিল করার।

মাথাটা এখনও ব্যথা করছে। সারা শরীরে কেমন যেন একটা অবসাদ। ইঞ্জেকশন দিয়েছে কেউ টের পেল কুয়াশা। ঘুমিয়ে ছিল সে ওষুধের প্রভাবে। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সে? ডি.কস্টা কোথায়? মিসেস হায়দারের কথাও মনে পড়ল সেই সাথে। বেচারীকে হয়তো পুলিস নাজেহাল করছে। তাকে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যেই কুয়াশা রয়ে গেছে সোনাডাঙ্গায়। তা না হলে চলে যেত সে।

বাঁধন খুলে ফেলল কুয়াশা দশ মিনিটেই।

সাধারণ একটি কামরা। দরজাটা মজবুত। কিন্তু ভাঙা খুবই সহজ।

বাইরে লোক আছে। কিন্তু সময় নষ্ট করল না কুয়াশা। ভেঙে ফেলল সে কাঁধের এক প্রচণ্ড ধাক্কায়।

উঠানে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। বারান্দায় বেরিয়ে এল কুয়াশা।

দু'জন লোক পাশের দরজা দিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। শব্দ শুনেছে তারা। লাফ দিয়ে লোক দুজনার দিকে এগিয়ে গেল কুয়াশা। দুজনকে দুই ঘুসিতে ভূপাতিত করল কুয়াশা।

সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির দিকে লম্বা পা ফেলল সে।

জঙ্গলের পথ ধরে হন হন করে এগিয়ে চলেছে কুয়াশা। আচমকা রিভলভার হাতে পথ রোধ করে দাঁড়াল মুখোশপরা রহস্যময় সেই লোকটা।

বনভূমি সচকিত করে দিয়ে প্রাণখুলে হেসে উঠল মুখোশধারী।

কুয়াশা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'কোথায় পালাবে, বাছাধন?' মুখোশ পরিহিত বলে উঠল, 'পালাবার কোন উপায় নেই। এবার বলো কোথায় রেখেছ আমার টাকা?'

'তোমার টাকা?' হেসে ফেলে বলল কুয়াশা।

'নিশ্চয়ই আমার। ডাকাতি করেছে আমার লোক, আমার নির্দেশে। সে টাকা আমারই। নয় তো…।'

'তোমার লোকের ওপর ডাকাতি করেছি আমি,' কুয়াশা বলল, 'সুতরাং সে টাকা আমার। তোমার যুক্তিই মেনে নিচ্ছি আমি—টাকা যার কাছে থাকে তার…।'

খেপে গেল মুখোশধারী।

দাঁতে দাঁত চাপল সে। কট কট করে শব্দ হলো। বলল, 'চালাকি করার চেষ্টা কোরো না, কুয়াশা। আমাকে তুমি চেনো না। টাকা দেবে কিনা বলো। তা না হলে মরতে হবে তোমাকে। এক মিনিট সময় দিচ্ছি। উত্তর না পেলে গুলি করব।'

রাসেল এই মাত্র এদিকে এসে পৌঁছেছে। আড়ালে আত্মগোপন করে সব কথাই শুনছে সে।

রাসেলের হাতেও রিভলভার। মুখোশ পরিহিত লোকটার কথা শেষ হতেই দুজনার মধ্যবর্তী একটি গাছের আড়াল থেকে রিভলভার ফেলে দেবার নির্দেশ দিল সে মুখোশধারীকে। কাজ হতেই বেরিয়ে এল ও, 'দুজনকেই হাতে নাতে ধরেছি।'

কঠোর স্বরে বলল রাসেল, 'পালাবার চেষ্টা করবেন না কেউ, সাবধান!'

কুয়াশা পিছিয়ে যাচ্ছে।

রাসেল তাকাল মুখোশ পরিহিতের দিকে। পিছিয়ে যাচ্ছে সে-ও।

'সাবধান!'

কুয়াশার দিকে রিভলভার তাক করে বলল রাসেল। কুয়াশা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝট করে তাকাল রাসেল মুখোশ পরিহিতের দিকে। সে তখনও পিছিয়ে যাচ্ছে। গুলি করার জন্যে রিভলভার তুলল রাসেল এবার। বলল, 'আর এক পা পিছিয়েছ কি গুলি

করব…!'

দাঁড়িয়ে পড়ল মুখোশধারী।

রাসেল তাকাল কুয়াশার দিকে।

দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা।

রাসেল আবার তাকাল মুখোশধারীর দিকে। পিছিয়ে যাচ্ছে সে আবার।

রাসেল আবার রিভলভার তাক করল।

দাঁড়িয়ে পড়ল মুখোশধারী। কিন্তু এরপর আর রাসেল কুয়াশার দিকে তাকাবার সময় পেল না।

মাত্র পাঁচ হাত দূরে ছিল কুয়াশা। আচমকা প্রচণ্ড এক লাফ মেরে রাসেলের প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়ল সে। সেই সাথে ভীষণ এক ঘুসি খেল রাসেল কানের নিচে।

ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল রাসেল। তারপর আর ওর মনে নেই কিছু।

জ্ঞান ফেরার পর রাসেল দেখল বিকেল হয়ে গেছে। আশেপাশে কুয়াশা বা মুখোশধারী সেই লোকটি–কেউ নেই।

বাড়ির পথ ধরল রাসেল।

বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার খানিক পর মি. হায়দারের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাসেল। কলিংবেল টিপতে চাকর ছেলেটা দরজা খুলে কোন প্রশ্ন না শুনেই জানিয়ে দিল, 'সাহেব বাড়ি নেই।'

'তোমার বিবি সাহেব আছেন? আমি তার সাথে দেখা করতে চাই।'

ড্রয়িংরুমে বসাল চাকরটা রাসেলকে।

সুন্দর, সুসজ্জিত বসার ঘর। সোফা সেট আছে। টি.ভি.ও আছে।

খানিক পর মিসেস হায়দার পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন, 'কাকে চাই?'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাসেল। চাকর ছেলেটা মিসেস হায়দারের সাথে ফিরে এসেছে আবার।

মৃদু হেসে রাসেল বলল, 'আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। প্রাইভেট কথা। ধরুন, আপনার বাজারে যাবার কারণ সম্পর্কে আমি কিছু জানতে চাই।'

সভয়ে তাকিয়ে রইলেন মিসেস হায়দার রাসেলের দিকে। দেখতে দেখতে দুই চোখ ভরে উঠল তাঁর পানিতে। কোনমতে তিনি চাকর ছেলেটার উদ্দেশে বললেন, 'মন্টু, তুই ভিতরে যা।'

মন্টু চলে গেল। রাসেল বলল, 'বসুন আপনি।'

মিসেস হায়দার নড়লেন না। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে তিনি শুধু বললেন, 'আপনিও তাহলে জানেন!'

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা কি? ক্লিপটোম্যানিয়া?'

ক্লিপটোম্যানিয়া এক প্রকার রোগ। টাকা পয়সার কোন অভাব না থাকলেও অল্প দামের ছোটখাট জিনিস চুরি করা এই রোগের লক্ষণ। এই প্রকৃতির রোগীরা কোনমতেই এই কুকর্ম থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না।

'হ্যাঁ,' বললেন মিসেস হায়দার, 'দয়া করে আমার স্বামীকে এ ব্যাপারে কিছু জানাবেন না। আমি আপনাকে···টাকা যদি চান, দেব।'

ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিসেস হায়দার। তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠল মিনতির চিহ্ন।

রাসেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল মিসেস হায়দারকে, লজ্জায়, অনুশোচনায় মাথা নিচু করে তিনি বললেন, 'অনেকদিনের বদভ্যাস এটা আমার। চিকিৎসা চলছে। কিন্তু এই রোগ সারতে দেরি হয়।'

'কে চিকিৎসা করছেন আপনার?'

'ডা. ওমর আবদুল্লা। ঢাকার ধানমণ্ডিতে তাঁর চেম্বার। হপ্তায় একদিন যাই তাঁর কাছে আমি।'

রাসেল বলল, 'কিন্তু আপনার কাছে এসেছি আমি অন্য কারণে। ব্যাঙ্কের টাকা ডাকাতি করার কাজে আপনার কালো গাড়িটা ব্যবহার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কি বলবার আছে আপনার।'

অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন মিসেস হায়দার। তারপর বলে উঠলেন, 'আমার গাড়ি! অসম্ভব! গ্যারেজে আমার গাড়ি পড়ে আছে গত দু'মাস থেকে অচল অবস্থায়!'

রাসেল বলল, 'আপনার কথা ঠিক নয়। গাড়িটা কৈলাসপুরে পেয়েছে পুলিস।'

'ভুল করছেন আপনি!'

মিসেস হায়দার জোর দিয়ে বললেন, 'আসুন আপনি আমার সাথে। গ্যারেজেই দেখবেন রয়েছে গাড়িটা।'

কিন্তু গ্যারেজ খোলার পর দেখা গেল গাড়ি নেই।

দশ

বৈঠকখানায় ফিরে এসে রাসেল কঠোরস্বরেই বলল, 'মিসেস হায়দার, আপনি ভুল করছেন! মিথ্যে কথা বলে··· ।'

মিসেস হায়দার বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমি এসবের কিছুই জানি না!'

'আপনি জানেন!'

প্রায় ধমকে উঠল রাসেল। ধমক খেয়ে ভেঙে পড়লেন মহিলা। গাল বেয়ে টপ

টপ করে দুই ফোঁটা পানি পড়ল মেঝেতে। চোখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন, 'বেশ, শুনুন। যা জানি বলব। কিন্তু ডাকাতির ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানি না আমি। চুরি করার এই বদ অভ্যাসের জন্যে আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে একজন লোক···।'

'কে সে?'

'জানি না। পিয়ন একদিন একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠির সাথে কয়েকটা ফটো। আমি যখন বিভিন্ন জিনিস চুরি করছি তখনই তোলা হয়েছে ছবিগুলো। চিঠিতে পাঁচ হাজার টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে আমার স্বামীর কাছে ফটোগুলো পাঠানো হবে বলে হুমকি দেয় পত্রলেখক।'

'কোথা থেকে এসেছিল চিঠিটা?'

'ঢাকা থেকে। ঠিকানা ছিল না। টাকা পাঠাবার ঠিকানা ছিল। পোস্ট অফিস বক্স নং এক হাজার পাঁচশো পাঁচ।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর মিসেস হায়দার বললেন, 'আজ অবধি বিশ হাজার টাকা গেছে আমার। পাঁচ হাজার করে চারবার দিয়েছি। কিন্তু শেষ যে চিঠিটা পেয়েছিলাম তাতে টাকার দাবি করা হয়নি। সে চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল ব্যাঙ্ক থেকে কবে, কোন ট্রেনে সতেরো লাখ টাকা ঢাকায় যাবে।'

উত্তর দিতে ইতস্তত করছেন মিসেস হায়দার। রাসেল বলল, 'মিথ্যে বলবেন না।'

'দিয়েছিলাম।'

প্রায় কেঁদে ফেললেন মিসেস হায়দার। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'আমার স্বামীর কাছ থেকে কৌশলে সব তথ্য জেনে নিয়েছিলাম। পরে ভেবেছিলাম সব কথা জানিয়ে দিই স্বামীকে। কিন্তু সাহস পাইনি।'

রাসেল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল মাথা নিচু করে। তারপর বলল, 'আর একটা প্রশ্ন। তথ্যগুলো পত্রলেখককে ছাড়া আর কাউকে জানিয়েছিলেন কি আপনি?'

'না।'

ফেরার পথে বাংলা ব্যাঙ্কের সামনে দিয়ে আসার সময় লতিফের সাথে দেখা করল রাসেল।

একথা-সেকথার পর রাসেল জিজ্ঞেস করল, 'যে ব্যাগটায় চা'র পাতা, দুধ, চিনি ছিল সেটা একবারও কাছ ছাড়া করোনি তুমি ট্রেনে, লতিফ?'

'না···হ্যাঁ, একবার মাত্র, স্যার! আরে, ভুলে গিয়েছিলাম আমি! বাথরুমে ঢুকেছিলাম একবার। ট্রেন তখন ছাড়েনি। বাথরুমে থাকতে থাকতেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। আট-দশ মিনিট পর বেরিয়ে আসি আমি বাথরুম থেকে। ব্যাগটা যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানেই ছিল।'

'আর সবাই কে কোথায় বসেছিল?'

'মি. শরীফ বসেছিলেন ব্যাগের পাশে। আমি বাথরুম থেকে বেরুবার পর সেখান থেকে উঠে তিনি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ান।'

'ঠিক মনে আছে তোমার?'

'জ্বী, স্যার।'

রাসেল কি যেন ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'মি. শরীফ ব্যাঙ্কের ভিতর আছেন? ওঁকে গিয়ে বলো আমি দেখা করতে চাই।'

'মি. শরীফ ছুটি নিয়েছেন, স্যার। যেদিন ডাকাতি হলো তারপর দিন থেকে তিনি তো ব্যাঙ্কে আসেন না।'

লতিফের কাছ থেকে মি. শরীফের বাড়ি কোন দিকে জেনে নিয়ে পা বাড়াল রাসেল।

মি. শরীফের বাড়িটা পাড়ার সবচেয়ে বড় বাড়ি। তিনতলা। অনেকগুলো কামরা। পাড়ার শেষ প্রান্তে মি. শরীফের ছাতা তৈরি করার কারখানা আছে একটা। ছাতার ব্যবসা করেই পয়সা করেছেন তিনি।

কলিংবেলের শব্দে দরজা খুলে দিল যুবতী এক চাকরানী। মি. শরীফ অবিবাহিত তা রাসেল জানত। যুবতী চাকরানী দেখে মনে মনে একটু হাসল ও।

ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল চাকরানী রাসেলকে। সুন্দর রুচির পরিচয় পাওয়া যায় ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্রের দিকে তাকালে।

দেয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র শোভা পাচ্ছে। ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা ফটোও ঝুলছে। একটি ছবির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল রাসেল।

অনেক দিনের পুরানো ফটোটা। মিসেস হায়দার এবং মি. শরীফ পাশাপাশি বসে আছেন একটা খোলা মাঠে। ওদের দুজনেরই হাতে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট। দুজনই হাসছে।

ফটোটার দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রাসেল। শরীফ কখন রুমে ঢুকেছেন খেয়াল করেনি ও।

'কি দেখছেন?'

চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রাসেল। মৃদু হাসল ও। বলল, 'আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করব, মি. শরীফ।'

সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসলেন মি. শরীফ। বললেন, 'কতদূর এগোলেন কেসটার ব্যাপারে, মি. রাসেল?'

'সামান্য। জানা গেছে ডাকাতিতে যে গাড়ি দুটো ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে একটি গাড়ির মালিক মিসেস হায়দার। মহিলার সাথে তো ভাল পরিচয় আছে আপনার?'

'সুফিয়া? নিশ্চয়ই। ও আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল স্টুডেন্ট লাইফে। আমরা

একসাথে পড়তাম। এমন কি, আপনাকে বলতে আর আপত্তি কি, আমাদের বিয়ে হবার কথাবার্তাও চলছিল। কিন্তু···যাকগে সে-সব কথা। আপনি বলছেন ওর গাড়ি ডাকাতিতে ব্যবহার করা হয়েছে! বিশ্বাস করা কঠিন···।'

বিস্ময় ফুটে উঠল মি. শরীফের চোখমুখে।

'অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি।'

'ভারি আশ্চর্য বলতে হয় তাহলে! ডাকাত গুণ্ডা এদের সাথে কিসের সম্পর্ক সুফিয়ার? বিশ্বাস হয় না আজকাল সে এত নিচে নেমে গেছে। অভাব কি তার? হায়দার ভাল টাকা রোজগার করে। চাকরি ছাড়াও পাটের ব্যবসা আছে তার, পার্টনারশিপ বিজনেস···!'

রাসেল বাধা দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, মিসেস হায়দারের সাথে আপনার বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়নি কেন?'

'খুব সহজ কারণেই হয়নি,' বললেন মি. শরীফ, 'হায়দারও আমার বন্ধু। আমিই সুফিয়ার সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিই। আমার চেয়ে হায়দারকেই সুফিয়ার ভাল লাগে···।'

সেদিন সন্ধ্যার পর ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবার পর লতিফ ফোন করল বিশেষ এক নাম্বারে।

অপরপ্রান্ত থেকে ভারি গলা ভেসে এল, 'হ্যালো?'

লতিফ বলল, 'আমি লতিফ বলছি, স্যার।'

'কি ব্যাপার লতিফ?'

লতিফ বলল, 'স্যার···।'

ইতস্তত করতে লাগল লতিফ।

অপরপ্রান্ত থেকে ভারি কণ্ঠস্বর বলল, 'কি ব্যাপার, লতিফ? কি হয়েছে? কি বলতে চাও তুমি?'

লতিফ ঢোক গিলছে ঘন ঘন।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল।

'স্যার···।'

'বলো।'

লতিফ আবার ঢোক গিলল। তারপর বলে ফেলল, 'স্যার, আমি জানি।'

অপরপ্রান্ত থেকে কোন উত্তর এল না তখুনি।

কেটে গেল আবার কয়েকটা উত্তেজনাপূর্ণ সেকেণ্ড।

লতিফ আবার বলল, 'আমাকে সামান্য ভাগ দেবেন না, স্যার?'

অপরপ্রান্ত থেকে এবার উত্তর ভেসে এল, 'দেব, লতিফ। কিন্তু সাবধান! কেউ যেন আর না জানে একথা। তুমি বটতলার ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে রাত

বারোটার পর। আমি যাব। কত টাকা চাও, লতিফ।'

'আপনি দয়া করে যা দেবেন স্যার...'

'এক লাখ?'

'তার বেশি হজম করতে পারব না, স্যার, আমি...'।'

'ঠিক আছে। রাত বারোটায়। বটতলার ফাঁকা রাস্তায়। কেমন?'

রিসিভার রেখে কপালের ঘাম মুছল লতিফ জামার আস্তীন দিয়ে।

রাত বারোটা।

জায়গাটার নাম বটতলা। প্রকাণ্ড কয়েকটা বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে। সেজন্যেই জায়গাটার নাম বটতলা। গ্রামের শেষ প্রান্ত এই বটতলা। চারদিকে আর কিছু নেই। ধু-ধু করছে খোলা মাঠ। মাঠের মাঝখান দিয়ে ইঁট বিছানো রাস্তা। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় বটগাছ।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব।

দূরে দেখা যাচ্ছে একটা গাড়ির দুটো হেড লাইট।

দ্রুত এগিয়ে আসছে গাড়িটা মাঠের মাঝখানের ইঁট বিছানো রাস্তা ধরে।

রাস্তার একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক।

লোকটা লতিফ।

গাড়িটা এগিয়ে আসছে। হেড লাইটের উজ্জ্বল আলো পড়ছে লতিফের সারা গায়ে। চোখ মেলে তাকাতে পারছে না সে ভাল করে।

এক পা পিছিয়ে এল লতিফ রাস্তা থেকে। গাড়ির স্পীড যেন বেড়ে গেল হঠাৎ। সতর্ক হয়ে উঠল লতিফ। একটা হাত তুলে গাড়িটাকে থামার ইঙ্গিত দিল সে।

এসে পড়েছে গাড়িটা।

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল লতিফ। গাড়ির চালক যে গাড়ি থামাবে না তা সে হঠাৎ বুঝতে পারল। দ্রুত পিছিয়ে এল লতিফ কয়েক পা।

কিন্তু গাড়িটাও লতিফের দিকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল লতিফ।

ফাঁকা মাঠের মধ্যে চলে এসেছে গাড়িটা। ফাঁকা মাঠের উপর দিয়েই প্রাণপণে ছুটছে লতিফ। কিন্তু যন্ত্রের সাথে দৌড়ে সে পারবে কেন!

ক্রমশ দূরত্ব কমে আসছে।

এঁকেবেঁকে ছুটছে লতিফ। এঁকেবেঁকেই ছুটে আসছে যন্ত্রদানব লতিফের পিছু পিছু।

বটগাছগুলোর আড়াল থেকে কখন যেন বেরিয়ে এসেছে দুটো মটর সাইকেল। ঝড়ের বেগে মটর সাইকেল দুটো ছুটছে মটর গাড়িটাকে লক্ষ্য করে।

লতিফ পিছন ফিরে দেখল গাড়িটা আর মাত্র দশ পনেরো হাত পিছনে রয়েছে! আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে চাইছে তার সর্ব শরীর। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে সে।

এমন সময় গুলির শব্দ হলো।

পরমুহূর্তে ছিটকে পড়ে গেল লতিফ মাঠের মাঝখানে।

ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে ছুটে গেল মটর গাড়িটা। এঁকেবেঁকে যাচ্ছে গাড়িটা। ঝাঁকুনি খাচ্ছে ভীষণ।

মটর সাইকেল দুটো মটর গাড়ির দশ হাতের মধ্যে চলে এসেছে।

সামনের মটর সাইকেল থেকে আবার গুলি করা হলো।

মটর গাড়ির পিছনের চাকায় লাগল গুলি। সশব্দে বাতাস বেরিয়ে আসছে চাকা ফুটো হয়ে যাওয়ায়।

ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা।

পরমুহূর্তে গাড়িটার দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল দুটি মটর সাইকেল।

দু'জন মটর সাইকেল চালকের মধ্যে একজন রাসেল। রাসেলের গলাই শোনা গেল।

মটর গাড়ির চালককে উদ্দেশ্য করে কঠিন কণ্ঠে রাসেল বলে উঠল, 'ভাল মানুষের মত বেরিয়ে আসুন, মি. শরীফ।'

'কোন রকম চালাকীর চেষ্টা করবেন না!' গাড়ির অপর পাশের জানালার ধারে দাঁড়ানো দ্বিতীয় মটর সাইকেলের চালক মি. সিম্পসন বলে উঠলেন।

খুলে গেল গাড়ির দরজা। বেরিয়ে এলেন মি. শরীফ। ম্লান, ঠাণ্ডা গলায় তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বোকামি করে ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু আপনাদের কোন লাভ হবে না আমাকে ধরে। টাকাগুলো আপনারা পাবেন না।'

আধখানা একটি ইঁটের সাথে টক্কর লেগে হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়েছিল লতিফ।

হাঁটুতে ব্যথা লেগেছে তার। মি. শরীফের গাড়ি করে তাকে প্রথমেই পৌঁছে দিল রাসেল বাড়িতে।

এগারো

মি. সিম্পসন প্রচুর প্রশংসা করলেন রাসেলের।

কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে একা রাসেলেরই।

মি. শরীফ প্রতিহিংসাবশত ডাকাতির সাথে মিসেস হায়দারকে জড়াতে চেয়েছেন এ সন্দেহ সহজ কারণেই হয়েছিল ওর।

মিসেস হায়দারের গাড়ি চুরি করে ডাকাতদেরকে মি. শরীফ সরবরাহ করতে পারেন—এরকম একটা সন্দেহের ভিত্তিতেই রাসেল লতিফকে দিয়ে ফোন করায়।

লতিফের ফোন পেয়ে সব কথা স্বীকার করে ফেলেন মি. শরীফ।

থানায় নিয়ে আসার পর মি. শরীফ আবার সবকথা স্বীকার করলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল তার সতেরো লাখ টাকা হস্তগত করা। এই কাজে পুলিসের সন্দেহ যাতে মি. হায়দার এবং তার স্ত্রীর প্রতি পড়ে সেজন্যে গাড়িটা চুরি করে ভাড়াটে

ডাকাতদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। মি. শরীফ স্বীকার করলেন—তিনিই গত বছরখানেক ধরে মিসেস হায়দারকে ব্ল্যাকমেল করে আসছিলেন।

কিন্তু সতেরো লাখ টাকা মি. শরীফ পাননি। ভাড়াটে ডাকাতদের সাথে আধাআধি ভাগে টাকা ভাগ করার কথা ছিল তার। আমড়াগ্রাম স্টেশনে কি ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে মি. শরীফ কিছুই জানেন না। যে দুজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে তারা তাঁর ভাড়া করা ছয়জন ডাকাতদের মধ্যে দুজন। বাকি চারজন পালিয়েছে। মি. শরীফের ধারণা তারা চারজনই টাকা নিয়ে ভেগেছে নিজেদের দুই সঙ্গীকে খুন করে।

মি. শরীফকে চালান করে দেয়া হলো ধুমনগর থানায় সেই রাতেই।

মি. সিম্পসন বললেন, 'ওই চারজন ডাকাতই তাহলে টাকা নিয়ে পালিয়েছে।'

দ্বিমত প্রকাশ করল রাসেল, 'অসম্ভব! বেবী ট্যাক্সির ড্রাইভার যা দেখেছে তা মিথ্যা হতে পারে না। টাকা তারা নিয়ে যায়নি। টাকা নিয়েছে অন্য কেউ। যে দুজন মারা গেছে তারা স্টেশনেই ছিল বা চলন্ত ট্রেন থেকে তারা আমড়াগ্রাম স্টেশনে লাফিয়ে নেমেছিল। অপর তিনজন ছিল ট্রেনেই। তারা ধুমনগরেই নামে। নেমে একটি বেবী ট্যাক্সি করে আসে আমড়াগ্রাম স্টেশনে।'

'ছয়জন বলছিলে? বাকি একজন?'

রাসেল বলল, 'সে আমড়াগ্রাম স্টেশনের পাশেই ছিল কালো ফোক্সওয়াগেন গাড়ি নিয়ে। যাকগে, বেবী ট্যাক্সি করে লোক তিনজন রওনা হবার পাঁচ মিনিট পরই আমি রওনা হই। আমি আসার আগে, এমন কি লোক তিনজন এসে পৌঁছুবার আগেই এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যে ঘটনার কথা আমরা কেউ জানি না। যে লোক দুজন হলুদ ব্যাগ কুড়িয়ে নিচ্ছিল প্ল্যাটফর্ম থেকে, তাদের দুজনকে কেউ খুন করে টাকা নিয়ে ভেগেছে। এই হলো আমার ধারণা।'

'কিন্তু কে সেই লোক?'

রাসেল অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'জানি না কে সেই লোক। তবে জানতে আমি পারব।'

রাসেলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মি. সিম্পসন বললেন, 'কুয়াশা কি সেই লোক হতে পারে না, রাসেল?'

রাসেলের উত্তর দেয়া হলো না। বেজে উঠল ফোন। ইন্সপেক্টর আজমল খান রিসিভার তুললেন। এক মুহূর্ত পর রিসিভারটা বাড়িয়ে ধরলেন তিনি রাসেলের দিকে, বললেন, 'এক মহিলা আপনাকে চাইছেন।'

কে ফোন করল তাকে?

ভাবতে ভাবতে রিসিভার কানে ঠেকাল রাসেল। বলল, 'হ্যালো, আমি রাসেল আহমেদ বলছি…।'

মিনিট খানেক একমনে চুপচাপ অপর প্রান্তের কথাগুলো শুনল রাসেল।

অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল রাসেলের মুখের চেহারা। ধন্যবাদ বলে রিসিভার

ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'ঢাকায় যেতে হবে, মি. সিম্পসন। গাড়ির ব্যবস্থা করুন। সতেরো লাখ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হলেও হতে পারে।'

সেদিনই ভোর ছ'টায় ঢাকায় ফিরল ওরা।

স্নান, আহার, বিশ্রাম করার পর বেলা সাড়ে দশটায় মি. সিম্পসনকে ছাড়াই র সেল ধানমণ্ডিতে এল।

সতেরো নাম্বার রোডের পঁচিশ বাই পঁচিশ নাম্বার বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল রাসেল।

বিরাট গেট বাড়িটার। ঝকঝকে পিতলের অক্ষরে লেখা রয়েছে—ডক্টর ওমর আবদুল্লা।

নামের নিচে লেখা—সাইকিয়াট্রিস্ট।

একজন দারোয়ান গেট খুলে দিয়ে বলল, 'কাকে চান, হুজুর? ডাক্তার সাহেব তো নেই।'

'নেই মানে? কখন…।'

'হপ্তায় দু'দিন চেম্বারে বসেন তিনি। সোমবার আর শনিবার।'

রাসেল জানতে চাইল, 'ওঁর বাড়ি কোথায়?'

'বাড়ি? বাড়ি তো চিনি না, হুজুর। আমি এই চেম্বার পাহারা দিই।'

পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে জিজ্ঞেস করেও ডা. ওমর আবদুল্লার বাড়ির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আগামী পরশু শনিবার।

রাসেল চিন্তিত ভাবে ফিরে এল মি. সিম্পসনের অফিসে।

চা পান করতে করতে রাসেল বলল, 'মিসেস হায়দারকে একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ব্যাঙ্কের টাকা ঢাকায় যাবে একথা ব্ল্যাকমেলার পত্রলেখক ছাড়া আর কাউকে তিনি বলেছিলেন কিনা। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন—না। কিন্তু তখন কথাটা মনে কি পড়েনি মহিলার। গতরাতে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় আমাকে ফোন করেছিলেন। কথাটা তিনি তাঁর মানসিক রোগের চিকিৎসক ডা. ওমর আবদুল্লাকে বলেছিলেন। ভদ্রলোক সাইকিয়াট্রিস্ট।'

মি. সিম্পসন গম্ভীর মুখে বললেন, 'ডা. ওমর আবদুল্লা? সাইকিয়াট্রিস্ট?'

গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি।

রাসেল বলল, 'দু'দিন দেরি হয়ে ভালই হলো। মিসেস হায়দারকে কাজে লাগানো যাবে।'

'কিভাবে?' জানতে চাইলেন মি. সিম্পসন।

'বলছি।' বলতে শুরু করল রাসেল।

শনিবার। রাত আটটা বাজে।

ধানমণ্ডি সতেরো নাম্বার রোডের দুই মাথায় দুটো পুলিস ভ্যান এসে থামল।

পঁচিশ বাই পঁচিশ নাম্বার বাড়ির পেছনের সরু মেথর-প্যাসেজে পজিশন নিল প্রায় পনেরো জন রাইফেলধারী পুলিস। সবশেষে বাড়িটার সামনে একটা জীপ এসে দাঁড়াল।

জীপ থেকে নামলেন মি. সিম্পসন। এবং তার সাথে পাঁচজন পুলিস ইন্সপেক্টর। জীপ থেকে নেমে মি. সিম্পসন হাতঘড়ি দেখলেন। আটটা বেজে দশ। পাঁচজন ইন্সপেক্টরের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'আধঘন্টার মধ্যে রাসেল সাহেব ফিরে না এলে ভিতরে ঢুকব আমরা।'

ডা. ওমর আবদুল্লার ওয়েটিং রূমে মাত্র তিনজন মানুষ। একজন মহিলা। দুজন পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে একজন রাসেল। অপরজনকে রাসেল চেনে না। মহিলাটিও রাসেলের অপরিচিতা।

মিসেস হায়দার চেম্বারে ঢুকেছেন পনেরো মিনিট আগে। তিনি বের হলেই রাসেলের ডাক পড়বে ভিতরে। কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে ও আগেই।

আরও তিন মিনিট পর বের হলেন মিসেস হায়দার। রাসেলের সাথে চোখাচোখি হতে মৃদু মাথা নাড়লেন তিনি। তারপর বেরিয়ে গেলেন ওয়েটিং রূম থেকে।

ডা. ওমর আবদুল্লার সেক্রেটারি বসেছিলেন একটি চেয়ারে। তাকালেন তিনি রাসেলের দিকে। বললেন, 'এবার আপনি যান, মি. জামান।'

ছদ্মনাম ব্যবহার ইচ্ছা করেই করেছে এখানে রাসেল।

চেম্বারের দিকে পা বাড়াল রাসেল। খোলা দরজার পর সরু প্যাসেজ।

প্যাসেজ ধরে সোজা এগিয়ে চলল রাসেল।

প্যাসেজের শেষ মাথায় মোটা সেগুন কাঠের পালিশ করা দরজা। ছোট ছোট প্লাস্টিকের অক্ষরে লেখা—চেম্বার।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই খুলে গেল দরজাটা। ভারি পর্দা সামনে।

পকেটের রিভলভার বাইরে থেকে স্পর্শ করে ভারি পর্দা সরিয়ে গট গট করে এগিয়ে গেল রাসেল।

প্রকাণ্ড এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল চেম্বারের এক কোণায়।

টেবিলের উপর কাগজপত্র, নানা রকম ছোটখাট যন্ত্র, অ্যাশট্রে, সিগারেটের প্যাকেট এবং একটি কালো মলাটের খাতা। টেবিলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারে বসে রয়েছেন ডা. ওমর আবদুল্লা।

বয়স্ক লোক ডাক্তার। প্রায় ষাটের মত বয়স। গালের মাংসে অনেকগুলো ভাঁজ পড়েছে। দাড়ি আছে, সযত্নে সমান করে কাটা। কাঁচা পাকা এক জোড়া গোঁফ। মুখটা প্রকাণ্ড। কাঁচা পাকা একরাশ চুল মাথায়। চোখে রিমলেস চশমা। দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝকঝক করছে। মৃদু হেসে রাসেলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বসো।'

বসল রাসেল একটা চেয়ার টেনে। সর্ব শরীর টান টান হয়ে আছে ওর। মনটা দমে গেছে নিরাশায়। এ লোক যে কুয়াশা নয় তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল।

'আপনিই ডা. ওমর?' প্রশ্নটা ইচ্ছা করেই করল রাসেল।

হাসলেন ডাক্তার। বললেন, 'সন্দেহ হয়?'

'আপনি আমাকে চেনেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল রাসেল।

'এ প্রশ্ন কেন?' ডা. ওমর হাসছেন।

'পরিচয় না থাকলে কেউ "বসুন" না বলে বসো বলে না।' রাসেল বলল, 'অবশ্য আপনি বয়স্ক মানুষ। কিন্তু সত্যিই কি আপনি বয়স্ক মানুষ?'

এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে ফেললেন ডা. ওমর।

এক মুহূর্ত দেরি হলো না রাসেলের এবার কুয়াশার উচ্চহাসি চিনতে। এরকম হাসি একজনকেই হাসতে দেখেছে রাসেল। কুয়াশা ছাড়া এমন ভারি, ভরাট গলায় আর কে হাসতে পারে?

'কেমন আছো রাসেল?' জিজ্ঞেস করল ডা. আবদুল্লা ওরফে কুয়াশা। মি. সিম্পসনকে আবার নিয়ে এসেছ কেন সাথে করে?'

রাসেল বাঁকা একটু হাসল। বলল, 'ভেবেছিলেন চোরের ওপর বাটপারি করে চুপচাপ সতেরো লাখ টাকা হজম করে ফেলবেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়, মি. কুয়াশা।'

হাসছে কুয়াশা। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল, 'সতেরো লাখ টাকা চুরি করি আর বাটপারি করি—প্রমাণ করতে পারবে?'

'কেন করেছেন এমন জঘন্য কাজ আপনি?'

রাগে কেঁপে উঠতে চাইছে রাসেলের সর্বশরীর, 'শুধু টাকা নয়। আপনি দুজন লোককেও খুন করেছেন।'

কুয়াশা হাসছে। রাসেল থামতে সে বলে উঠল, 'কেন করেছি জানতে চাও, তাই না? শোনো। দেশে পাঁচটা হাসপাতাল আছে আমার। বিনা পয়সায় গরীব মানুষদের চিকিৎসা হয় সেখানে। দুটো কলেজ আছে। ছাত্রদের বেতন নেয়া হয় না বললেই চলে। বীরাঙ্গনাদের জন্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছি তিনটে। গবেষণাগারে পাঁচশো লোককে চাকরি দিতে হয়েছে। পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানীরাও সেখানে কাজ করছেন। তাদের থাকা খাওয়ার খরচ আছে। খরচের আরও তালিকা তোমাকে দিতে পারি। এত টাকা আসবে কোত্থেকে? কে আমাকে দেবে? ডাকাতি না করে আমার উপায় কি?'

এক মুহূর্ত থামল কুয়াশা। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'আমড়াগ্রাম স্টেশনে যে লোক দুজনকে মেরেছি তাদের জন্যে কোন অনুশোচনা নেই আমার। ইচ্ছা করলে ওদেরকে না খুন করেও টাকাগুলো আনতে পারতাম। কিন্তু ওদেরকে খুন করার জন্যে আমি গত এক বছর ধরে খুঁজছিলাম। কেন জানো? দখলদার পাক-বাহিনীর আমলে ওরা দুজনই ছিল আলবদর বাহিনীর জল্লাদ। প্রায় পঞ্চাশজন লোককে ওরা ছোরা দিয়ে জবাই করেছে।'

'কিন্তু আইন বলে একটা জিনিস আছে সব দেশেই।' রাসেল বলল, 'ওদেরকে আপনি খুন করবার কে? আর ডাকাতি করার স্বপক্ষে যা বলছেন তা স্রেফ আপনার গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছুই নয়। কে বলেছে হাসপাতাল চালাতে স্কুল-কলেজ চালাতে, গবেষণা করতে?'

কুয়াশা বলল, 'কেউ বলেনি। আমার ইচ্ছে হয়, তাই চালাই। আইনের কথা বলছ? তুমি ছেলেমানুষ হলেও নিশ্চয়ই জানো যে সব কিছুই নির্ভর করে শক্তি, বুদ্ধি এবং ইচ্ছার ওপর। আমার শক্তি, বুদ্ধি যে কোন লোকের চেয়ে বেশি। তাই আমার ইচ্ছা মত আমি যা খুশি তাই করে বেড়াই। আইনের প্রতি আমার করুণা হয়। যে আইন মানুষকে কষ্ট দেয়, অপরাধীকে মুক্তি দেয়...।'

বাধা দিল রাসেল, 'আপনার নিজস্ব মতামত শুনতে চাই না আমি, মি. কুয়াশা। আমি জানতে চাই সতেরো লাখ টাকা কোথায় রেখেছেন?'

কুয়াশা রাসেলের এই ছেলেমানুষি প্রশ্ন শুনে হেসে উঠল। বলল, 'টাকা আমার গোপন আস্তানায় আছে। খরচ হয়ে গেছে লাখ পাঁচেক। কিন্তু সে টাকা ফেরত দিতে পারব না, ভাই।'

'ফেরত আপনি দেবেন না তা জানি,' বলল রাসেল, 'জোর করে ফেরত নেব বলেই এসেছি। খুনের আসামী আপনি...।'

'মিথ্যা কথা।' বলল কুয়াশা, 'ধোপে টিকবে না তোমাদের অভিযোগ। তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে না।'

একটু থেমে কুয়াশা বলল, 'যে গাড়ি করে আমি টাকা নিয়ে এসেছি সে গাড়ির প্রতিটি পার্টস ছড়িয়ে পড়েছে আলাদা আলাদা একটা একটা করে সারা বাংলাদেশে। বডিটাও নেই। গলিয়ে ফেলেছি। যে জুতো জোড়া পায়ে ছিল, যে দস্তানা জোড়া হাতে ছিল, যে রিভলভারটা দিয়ে গুলি করেছিলাম—সব নষ্ট করে ফেলেছি। এই পৃথিবীতে সে-সবের কোন হদিস পাওয়া যাবে না। কেউ দেখেছে আমাকে টাকা নিতে? গুলি করতে?'

কথা বলতে বলতে রাসেলের পিছন দিককার উঁচু দেয়ালের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল কুয়াশা। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'মি. সিম্পসন দলবল নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকছেন, রাসেল।'

পিছন দিকে তাকাল রাসেল। একটি হাত ঢোকাল পকেটের ভিতর।

উঁচু দেয়ালে পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে চারটে টি. ভি.র পর্দা।

বাড়ির চারদিকের ছবি ফুটে উঠেছে টি. ভি.র পর্দাগুলোয়।

পকেট থেকে রিভলভার বের করে ফেলেছে রাসেল কুয়াশার অগোচরে।

টেবিলের উপর রিভলভারসহ হাতটা তুলে রাসেল বলল, 'হ্যাঁ। সব প্রমাণ আপনি নষ্ট করে ফেলেছেন। কিন্তু তবু একটি প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে আছে। আপনার টেবিলের উপরই লুকানো আছে একটি টেপরেকর্ড। আপনার সব কথা টেপ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মাথার উপর হাত তুলুন, মি. কুয়াশা। তা না হলে

আমিও গুলি করব।'

দ্রুত টেবিলের উপর চোখ বুলিয়ে নিল কুয়াশা। হাসি মুছে গেছে তার মুখ থেকে।

'দেরি করছেন আপনি, মি. কুয়াশা। গুলি করব আমি।' কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল রাসেল।

কুয়াশা তাকাল রাসেলের চোখ জোড়ার দিকে। সন্দেহ রইল না কুয়াশার মনে। এ ছেলে হাসতে হাসতে গুলি করতে পারে।

ধীরে ধীরে হাত তুলল কুয়াশা মাথার উপর। টেবিলের ওপর দৃষ্টি পড়ল ওর। কালো মলাটের মোটা খাতাটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

নড়ছে কুয়াশার ডান পা-টা।

টের পাচ্ছে না রাসেল।

টেবিলের পায়ায় একটি বোতাম। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বোতামটায় চাপ দিল কুয়াশা।

চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল রাসেল চেয়ারসহ।

ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে রাসেল। ও যে চেয়ারটায় বসেছিল সেই চেয়ারটাও নেই। চেয়ারটার জায়গায় দেখা যাচ্ছে গভীর এক গর্ত।

টেবিলের উপরকার কলিংবেলটা টিপে ধরল কুয়াশা। তাকাল টি. ভি. পর্দাগুলোর দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর চেম্বারে প্রবেশ করল সেক্রেটারি।

'গুপ্ত পথে নেমে যাও সাদেক। টেবিলের ওপর থেকে কালো খাতাটা নাও সাথে। জলদি।'

উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। বেরিয়ে গেল সাদেক চেম্বার থেকে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে। টেবিলের সামনে বসে পড়ে কুয়াশা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ঝটপট খুলে ফেলল কয়েকটা বোতাম। সেগুলো পকেটে ফেলে বেরিয়ে গেল সে চেম্বার থেকে।

রাসেল যে গর্তের ভিতর চেয়ারসহ অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখানে আবার শোভা পাচ্ছে চেয়ারটা। কিন্তু এখন সে চেয়ারে রাসেল নেই।

মি. সিম্পসন এক মিনিট পরই প্রবেশ করলেন চেম্বারে। টি. ভি. সেটগুলো তখনও অন করা রয়েছে।

ঘণ্টা দুয়েক তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন মি. সিম্পসন। কিন্তু সতেরো নাম্বার রোডের পঁচিশ বাই পঁচিশ নাম্বার বাড়িটায় একটি প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেল না।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য ঠেকল মি. সিম্পসনের কাছে।

কিন্তু তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন একথা মেনে না নেয়ার আর কোন উপায় রইল না।

কুয়াশা ৪২

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪

এক

পীচঢালা সরল রাস্তাটা সোজা রূপালী গ্রামের দিকে চলে গেছে। রূপালী গ্রামের পরই ক্যান্টনমেন্ট। কিন্তু সেদিকে অর্থাৎ রূপালী গ্রামের দিকে না গিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল সাদা রঙের হাল মডেলের টয়োটা করোলা।

পীচঢালা রাস্তার দু'পাশে কলোনি। কলোনি এলাকা শেষ হবার পর একপাশে খোলা মাঠ, অপর পাশে পাশাপাশি কয়েকটা বড় ফ্যাক্টরী-কারখানার উঁচু প্রাচীর। টয়োটা করোলা ছুটে চলেছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে।

পনেরো মিনিট পর বক্সনগরে পৌছুল গাড়িটা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঘরে ফেরার পালা এখন পাখিদের। গাছে গাছে জমায়েত হয়েছে বেশিরভাগ, কিচিরমিচির শুরু করেছে। টয়োটা করোলা এগিয়ে চলেছে এবার মেঠো পথ ধরে। দু'পাশের ঝোপ-ঝাড়, ছোট-বড় গাছ। আরও খানিক আগে দু'পাশের জঙ্গল বেশ ঘন। রাস্তা উঁচুনিচু। কোথাও নেমে গেছে ঢালু হয়ে, আবার ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ছোটখাট মাটির ঢিবিও অনেকগুলো। ঢিবিগুলোর পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে পথ। এখান থেকে পথ ক্রমশ সরু হয়ে গেছে।

ব্রেক কষে গাড়ি থামাল কুচবিহারী। অভ্যাসবশত রিয়ার ভিউমিররে একবার তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর গাড়ির স্টার্ট বন্ধ না করেই গাড়ি থেকে নামল। পিছন দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

মিনিট দুয়েক পিছন দিকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলো কুচবিহারী। কেউ তাকে অনুসরণ করে আসেনি এখানে। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার গাড়িতে উঠে বসল সে।

রাস্তা থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে পঁচিশ তিরিশ গজ দূরে গিয়ে আবার ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল সে। এবার স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে নিচে নেমে গাড়ি লক করে পায়ে হেঁটে মেঠো পথে ফিরে এল।

পঞ্চাশোত্তীর্ণ কুচবিহারীর গায়ের রঙ ঠিক কালো না, অনেকটা জ্যোতিহীন, লাবণ্যহীন ছাইয়ের মত। প্রকাণ্ড মাথা। ছোট ছোট হাত। প্রকাণ্ড শরীর। দেখে মনেই হয় না টাকার একজন বিরাট ধনী লোক সে। পরনে প্যান্ট-শার্ট। খুব একটা দামী কাপড় কোনকালেই পরে না সে। কৃপণ হিসেবে তার বদনাম আছে।

মেঠো পথ ধরে কুচবিহারী এবার পায়ে হেঁটেই এগিয়ে চলল। খানিকদূর যাবার পর পথটা শেষ হলো। পথের শেষে আরও ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু

একটা পথের চিহ্ন সোজা চলে গেছে বহুদূর।

হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে কুচবিহারী চলার গতি দ্রুত করল। মিনিট পাঁচেক দ্রুত তালে হাঁটার পর ডান দিকে মোড় নিয়ে আর একটা সরু পথের চিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলল।

সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু এখনও সন্ধ্যার কালিমা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েনি। দিনের শেষ আলোটুকু থাকতে থাকতেই একটা অতি প্রাচীন দোতলা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল।

কবে, কতযুগ আগে কে এই গভীর জঙ্গলে মন্দিরটি তৈরি করেছিল তা আজ আর কেউ বলতে পারে না। খুব কম লোকই জানে এই মন্দিরের কথা। বক্সনগরের এই গভীর ঘন জঙ্গলে যে প্রাচীন একটা মন্দির আছে তা অনেকে কল্পনাই করতে পারে না। বক্সনগরের আশপাশের গ্রামের মানুষরা মন্দিরটা সম্পর্কে জানলেও ভয়ে তারা দিনের বেলাও এদিকে আসে না।

মন্দিরটা দেখলে ভয় লাগারই কথা। এককালে বেশ সৌন্দর্য ছিল এই মন্দিরের। কিন্তু বড় এবং ছোট তিনটে মিনারই ধসে পড়েছে। মন্দিরের দেয়ালের চুনবালি-সুরকি খসে গেছে, প্রাচীন কালের ছোট আকারের লাল লাল ইটগুলো যেন দাঁত বের করে ভেঙচাচ্ছে। মন্দিরের ভিতরে এবং বাইরে মানুষ সমান উঁচু ঝোপঝাড় আগাছা এবং ঘাস জন্মেছে। দেয়ালে, পাঁচিলে শ্যাওলা জন্মেছে। বড় গম্বুজটার ভাঙা অংশের গা ঘেঁষে বেড়ে উঠেছে একটা বট গাছ। মন্দিরটার দিকে তাকালে গা ছমছম করে ওঠে। প্রকাণ্ড একটা গেট ছিল ভিতরে। কিন্তু হা হা করছে গেটটা। কাঠের ভারী পাল্লা দুটো পোকায় খেয়ে ফেলেছিল, তারপর বাতাসে খসে পড়ে পচে গেছে।

মন্দিরের উঠান পেরিয়ে উঁচু বারান্দা। বারান্দার উপর উঠেই একটা দরজা। দরজা টপকে ভিতরে পা দেবার মত দুঃসাহস খুব কম লোকেরই হবে। দোরগোড়া থেকেই দেখা যায় কালীমূর্তিটা। প্রকাণ্ড একটা লাল জিভ বের করে মা কালী বড় বড় চোখ বের করে সরাসরি দরজার দিকেই তাকিয়ে আছেন। দোরগোড়ায় গিয়ে যে দাঁড়াবে তার সাথেই চোখাচোখি হবে কালীমূর্তির।

কালীমূর্তির পায়ের সামনে পড়ে আছে একটা প্রকাণ্ড ভোজালি। সে ধার নেই ভোজালিটায়, মরচে ধরেছে বহুকাল আগেই। মেঝের কালচে রঙ দেখে বোঝা যায় রক্তের স্রোত বয়ে যেত এককালে এখানে। নরবলি হত ধুম-ধামের সাথেই।

কুচবিহারী দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে কালীমূর্তির দুই চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ একইভাবে তাকিয়ে থাকার পর দু'হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে কপালে তুলল সে। চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে কিছু বলল খানিকক্ষণ। তারপর সরে গেল দরজার সামনে থেকে।

বারান্দা ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল কুচবিহারী। কাঠের সিঁড়ি। কাঠে পোকা ধরেছে, ধুলো জমেছে। কুচবিহারী ভারী শরীরটা নিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে

উপরের বারান্দায় উঠে এল।

দোতলায় তিনটে মাত্র কামরা। দুটো কামরা খোলা হয় না। দরজা লাগানো বড় বড় তালায় মরচে ধরেছে। শেষ কামরাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুচবিহারী। এই কামরার দরজায় নতুন একটা তালা ঝুলছে। পকেট থেকে চাবি বের করে তালাটা খুলল কুচবিহারী।

কামরাটা যে এমন সুন্দরভাবে সুসজ্জিত তা বাইরে থেকে কল্পনাও করা যায় না। স্প্রিঙের খাট, সেগুন কাঠের আলমারি, টেবিল, চেয়ার, আলনা, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি কামরার ভিতর রয়েছে। রয়েছে একটা ফোন। বহু টাকা খরচ করে কারও মনে কোন রকম সন্দেহ জাগার কোন সুযোগ না দিয়ে কয়েক বছর আগে এই মন্দিরে ফোন আনিয়েছিল সে। ইলেকট্রিসিটিও আনিয়েছিল সে-সময়। কিন্তু ইলেকট্রিক আলো জ্বালে না কুচবিহারী। কারও মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হোক তা সে চায় না। ইলেকট্রিক আলো বহু দূর থেকে দেখা যায় তা সে জানে।

জানালা তিনটে খুলে দিয়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল কুচবিহারী। পকেট থেকে বের করল একটা রূপোর কৌটা, সিগারেট কেস, একশো টাকা নোটের একটা বাণ্ডিল, এবং দেশলাই।

সন্ধ্যা নেমেছে। কামরার ভিতর অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। দুটো হ্যারিকেন জ্বালাল কুচবিহারী। ড্রয়ার থেকে একটা পাঁচ ব্যাটারি টর্চ বের করে রাখল টেবিলের উপর। তারপর একটা হ্যারিকেন নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দায় এসে জঙ্গলের দিকে এক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। বারান্দার একটা ইঁটের থামের সাথে হ্যারিকেনটা ঝুলিয়ে দিয়ে কামরার ভিতর ফিরে এসে গায়ের শার্টটা খুলে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে বসল আস্তে আস্তে।

খানিক পর রূপোর কৌটা খুলে দু'খিলি পান গালে পুরল কুচবিহারী। পান খেতে খেতে হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল সে। সাতটা বাজতে খুব বেশি দেরি নেই। টাকার বাণ্ডিলটা তুলে রবারের বাঁধনটা খুলে নোটগুলো ধীরে সুস্থে গুণতে লাগল সে এবার।

একশো টাকার মোট চল্লিশটা নোট। চার হাজার টাকা। পান চিবাতে চিবাতে কান খাড়া করে কিছু যেন শোনার চেষ্টা করল কুচবিহারী। ভুল হয়নি তার। কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছে। কেউ উঠে আসছে উপরে।

চেয়ার ত্যাগ করে কামরা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল কুচবিহারী। সিঁড়ি টপকে বারান্দায় পা দিল একজন লম্বা-চওড়া লোক। হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় দেখা গেল নবাগত লোকটার পরনে লুঙ্গি এবং শার্ট। কুচবিহারীর মতই স্বাস্থ্য তার।

কুচবিহারী লোকটাকে দেখে থাম থেকে হ্যারিকেনটা নামাতে নামাতে বিরক্তির সুরে বলল, 'আধঘণ্টা দেরি করলে যে, নওশের?'

দাঁত বের করে হাসল নওশের। শব্দ হলো না। হাসলেও তার দু'চোখে সন্দেহের ছায়া পড়েছে। কুচবিহারীর সামনে এসে দাঁড়াল সে। আড়চোখে দেখে

নিল খোলা দরজা পথে কামরার ভিতরটা।

'এমন সময় আজ ডাকলেন কেন, বিহারী সাহেব?' নওশের আবদুল্লার গলায় অভিযোগ।

'দরকার আছে। এসো কামরার ভেতর।'

কুচবিহারী হ্যারিকেন নিয়ে কামরার ভিতর ঢুকল। পিছু পিছু দোরগোড়া অবধি এল নওশের। ভিতরে ঢুকতে ইতস্তত করছে সে। তীক্ষ্ণ চোখে কামরার ভিতরটা দেখে নিল সে। কুচবিহারী ছাড়া কামরার ভিতর আর কাউকে দেখতে না পেলেও সন্দেহ দূর হলো না তার। সতর্ক এবং সন্দিহান মন নিয়ে ভিতরে ঢুকল সে।

'বসো।'

বসল নওশের একটা কাঠের চেয়ারে।

'জায়গাটা ভাল নয়। রাত ছাড়া কি কাজটা হত না? তাছাড়া কি এমন দরকার পড়ল আপনার?'

'ভয় লাগছে নাকি?' কথাটা বলে হাঃ হাঃ করে হাসল কুচবিহারী। নওশের আবদুল্লাহর চোখে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো। হাসি থামিয়ে কুচবিহারী বলল, 'হাসছি বড় দুঃখে, বুঝলে নওশের! তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে এমন অসময়ে এখানে তোমাকে ডেকেছি বলে তুমি রীতিমত ভয় পেয়েছ। অথচ ভয় পাবার কথা তোমাকে আমার। আমাকে তুমি ভয় পাবে কেন?'

কর্কশ শোনাল নওশেরের গলা, 'কে বলল আপনাকে ভয় লাগছে আমার? ওসব বাজে কথা বাদ দিন। আপনি খুব ভাল করেই জানেন দুনিয়ার কাউকে আমি ভয় করি না। একথা জানেন বলেই মাসে মাসে চার হাজার করে টাকা দিচ্ছেন আমাকে।'

গম্ভীর এবং বিকৃত হয়ে উঠল কুচবিহারীর মুখ। কিন্তু কোন কথা বলল না সে। চুপ করে বসে রইল নওশেরের দিকে তাকিয়ে। নওশেরও তাকিয়ে আছে তার দিকে।

গম্ভীর ভাবেই কুচবিহারী বলে উঠল, 'মাসে চার হাজার টাকা আমার কাছে কিছুই নয়, নওশের। একথাও তুমি জানো।'

'তা জানি। তা জানি বলেই চার হাজারের কম দাবি করিনি আমি।'

রূপোর কৌটা থেকে পান বের করতে করতে কুচবিহারী বলল, 'তোমার টাকা টেবিলের ওপর রয়েছে। পকেটে ভরো। তারপরে আলাপ করব।'

দ্রুত টাকার বাণ্ডিলটা শার্টের সাইড পকেটে ভরে ফেলে নওশের আবদুল্লাহ জানতে চাইল, 'কিসের আলাপ?'

'বিশেষ একটা আলাপ আছে তোমার সাথে আমার, নওশের। প্রত্যেক মাসের দু' তারিখে বেলা বারোটার সময় তোমাকে টাকা দেবার জন্যে এখানে আসি আমি। আজ কেন এই সময় এসেছি জানো? ওই আলাপটা করব বলে।'

আবার সন্দেহ দেখা দিল নওশেরের চোখে। দ্রুত কামরার চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। দরজার দিকে মুখ করে বসেছে সে ইচ্ছা করেই।

দরজার বাইরে বারান্দাটা অন্ধকারে ঢাকা। সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বলে উঠল, 'কি আলাপ?'

কুচবিহারী গালে পান পুরে চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল, 'খুন খারাবিতে তুমি অভিজ্ঞ কিনা জানতে চাই আমি, নওশের।'

চমকে উঠে বারান্দার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নওশের তাকাল কুচবিহারীর দিকে, 'তার মানে? কি বলতে চান আপনি, বিহারী সাহেব?'

'বলতে চাই খুন-টুন করেছ কখনও আগে? নাকি শুধু ব্ল্যাকমেইল করেই জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছ?'

'কেন?'

'কি কেন?'

'এসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন আমাকে আজ?'

'দরকার আছে বলেই করছি।'

নওশের ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চাপা গলায় বলল, 'দরকার হলে খুন করতে পারি আমিও। টাকা পয়সার ব্যাপারে গোলমাল করলে আপনাকেও করব।'

'না, না—আমাকে নয়!' দ্রুত বলে উঠল কুচবিহারী, 'আমাকে নয়! আমিই খুন করাব। দেখিয়ে দেব কাদেরকে সারাতে হবে। তুমি পারবে কিনা তাই জানতে চাইছি।' নওশের তাকিয়ে থাকে কুচবিহারীর দিকে। জবাব দেয় না।

'আমার বিশ্বাস তুমি পারবে। তবু জিজ্ঞেস করে নিলাম।' কুচবিহারী নওশেরের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে।

এতক্ষণ পর একটু যেন স্বস্তি পায় নওশের। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায় সে, 'খুলে বলুন, বিহারী সাহেব।'

'পারবে? রাজি তাহলে?'

'আগে শুনি।'

কুচবিহারীও সিগারেট ধরায়। একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। টিকটিকিটার খোঁজে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কুচবিহারী বলে, 'আমার দুই বন্ধু আছে। তারা আমার একটা ব্যবসার অংশীদারও বটে। ওরা আজকাল আমাকে একদম বিশ্বাস করে না। ফলে নানারকম বিপদের আশঙ্কা করছি আমি। বড় দুশ্চিন্তায় আছি, নওশের। এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবার একটাই উপায়। ওদেরকে সরিয়ে ফেললেই সব মিটে যায়, মুক্ত হই দুশ্চিন্তা থেকে। কাজটা তোমাকে করতেই হয়। বদলে অবশ্য আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করব। কত টাকা চাও বলো।'

'বন্ধুদের পরিচয় দিন।' সিগারেটে টান দিয়ে কথাটা বলে নওশের।

'একজনের নাম আজমল রব্বানী। একে তুমি চিনলেও চিনতে পারো। ডলির স্বামী। ডলির সাথে আমার অবৈধ সম্পর্ক আছে একথা যখন তুমি জানতে পেরেছ তখন নিশ্চয়ই ডলির স্বামীর পরিচয় তোমার অজানা নেই। আর একজনের নাম

শরীফ চাকলাদার। এর বউ-ছেলেমেয়ে নেই। বলো এবার, কত টাকা?'

'দুই।'

বড় বড় চোখ মেলে তাকাল কুচবিহারী, 'দুই? দুই হাজার খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না, নওশের?'

'হাজার নয়—লাখ। দুই লাখ। বেশি মনে করলে বেশি। আমার ধারণা দু'জন মানুষের প্রাণের দাম দু'কোটির চেয়েও বেশি। নামমাত্র টাকা চেয়েছি আমি, বিহারী সাহেব। এর কমে পারব না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। দু'লাখই দেব। কিন্তু কাজটা হতে হবে নিখুঁত। কোনমতে যেন বেঁচে না যায় ওরা। এমন একটা উপায় বের করবে তুমি যাতে ব্যর্থ না হও। পয়লা সুযোগেই যেন খতম হয়ে যায় দুজনেই। আর খুব সাবধানে কাজটা করতে হবে তোমাকে। পুলিস ব্যাটারা শিকারী কুকুরের মত। তোমাকে ধরতে পারলে আমিও ফেঁসে যাব···।'

'অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে আমাকে। বাকি অর্ধেক কাজ শেষ হলে দেবেন। টাকার প্রথম অংশ অর্থাৎ একলাখ টাকা আমাকে যেদিন দেবেন সেদিন থেকে এক হপ্তার মধ্যে আমি কাজ শেষ করব। আর পুলিস-ফুলিসের ব্যাপারে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ধরা পড়লে আমার ফাঁসি হবে। আপনার গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।'

কুচবিহারী বলল, 'বেশ, এক লাখ টাকা তোমাকে আমি আগামী কাল দেব। বিকেলে, চারটের সময়, এখানে এসো তুমি। আর একটা কথা।'

নওশের কথা না বলে তাকিয়ে রইল।

'ডলির ব্যাপারে তুমি আর আমাকে এভাবে টানা-হেঁচড়া কোরো না।'

নওশের মাথা নেড়ে আপত্তি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু কুচবিহারী বলে উঠল আবার, 'আগে শোনো। তোমাকে আমি এককালীন এক লাখ দিয়ে দেব। তাহলে হবে তো?'

নওশেরকে চিন্তা করতে দেখা গেল।

কুচবিহারী বলে উঠল, 'এক হপ্তা পর তুমি যখন ওদেরকে খতম করার দরুন বাকি একলাখ টাকা নিতে আসবে তখনই আরও একলাখ দিয়ে দেব আমি তোমাকে। কি বলো?'

'বেশ। তাই হবে। চুটিয়ে প্রেম করে যাবেন, কেউ বাধা দেবে না—তার জন্যে এক লাখ আর বন্ধুদেরকে খুন করার জন্যে দু'লাখ।' দাঁত বের করে হাসল নওশের কথাটা বলে।

দুই

একই দিন সন্ধ্যায় ধানমণ্ডির রব্বানী ভিলার পাতালপুরীর জলসাগরে জমে উঠেছে নাচ আর গান।

গ্লাসে গ্লাসে রঙিন মদ ঢালা হচ্ছে। ঢুলু ঢুলু চোখে আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদার বাঈজীদের কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গির নাচ দেখতে দেখতে কখনও 'বাহবা বাহবা' চিৎকার জুড়ে গড়িয়ে পড়ছে তাকিয়ার উপর, কখনও পকেট থেকে একশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিচ্ছে বাঈজীদের দিকে।

বাঁকা চোখে রহস্যময় ইঙ্গিত ফুটিয়ে নোটগুলো তুলে নিয়ে নর্তকীরা নত হয়ে সালাম জানাচ্ছে।

আজমল রব্বানী মাঝে মাঝেই মদের নেশায় হাত নেড়ে গলা ফাটিয়ে আদেশ করছেন, 'নাচো, আরও নাচো।'

চারজন নর্তকী নাচছে।

দুজন বাঈজী বসে আছে আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদারের দু'পাশে। ওদের গ্লাস শূন্য হবার আগেই কানায় কানায় সোমরস দিয়ে ভরে দিচ্ছে যুবতী মেয়ে দুটো।

নর্তকীদের পরনে কাপড়-চোপড় নিতান্তই কম। প্রায় উলঙ্গই বলা যায় চার যুবতীকে।

আজমল রব্বানীর বাড়ির এই জলসাঘরে বাইরের কোন লোকের প্রবেশ নিষেধ। তার বেডরুমের আলমারির পিছনে গুপ্ত একটা সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলে একটা করিডরে পৌঁছানো যায়। করিডরের শেষ মাথায় এই জলসাঘর। রোজ সন্ধ্যার পর আজমল রব্বানীর এই জলসাঘরে বাঈজীদের আগমন ঘটে। শোনা যায় নূপুরের ধ্বনি, তবলার আওয়াজ, খিল খিল হাসি, চুড়ির টুংটাং এবং মদের গ্লাস ভাঙার ঝন ঝন শব্দ।

শরীফ চাকলাদারও আগে এই জলসাঘরে প্রবেশ করার অধিকার পেত না। এই জলসাঘরের একমাত্র রাজা ছিল আজমল রব্বানী স্বয়ং। কাউকে সে নিমন্ত্রণ করত না। একাই সে মদ খেত, বাঈজীদের নাচ দেখত। কিন্তু ইদানীং শরীফ চাকলাদারের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে। দুজন এখন দুজনকে পরিষ্কার চেনে। শরীফ চাকলাদারের সাহায্য তার দরকার। কুচবিহারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে শরীফ চাকলাদারকে হাত করতে হবে। তাই তাকে এই জলসাঘরে আজকাল নিয়ে আসে সে।

রোজই সন্ধ্যার পর জলসাঘর সরগরম হয়ে ওঠে। আজমল রব্বানী বিশ্বাস করে, জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করাটাই বড় কথা। একথা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে বলেই প্রখ্যাত বাঈজী ঝুমা বাঈকে সে মাস আটেক আগে বিয়ে করেছে অথচ বিয়ে করার বয়স তার নেই। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেছে আজ পঁচিশ বছর আগে। বাহান্ন বছর বয়স, বাড়িতে ছাব্বিশ বছরের যুবক ছেলে, অথচ একটা বাঈজীকে বিয়ে করতে দ্বিধা বোধ করেনি সে। ঝুমা বাঈ এখন ডলি নামে পরিচিত। আজমল রব্বানী নতুন নাম দিয়েছে তার।

বাঈজী ঝুমা বাঈকে বিয়ে করেও যদি ভদ্র এবং সুন্দর জীবন-যাপন করত

আজমল রব্বানী তবু একটা কথা ছিল। ঝুমা বাঈকে বিয়ে করে মাস খানেক সব ভুলে ছিল সে। কিন্তু মাস খানেক কাটার পরই আবার যা তাই। আবার জলসাঘরে ফিরে এল সে। আবার শুরু হলো মদ খাওয়া, বাঈজী নাচানো।

মদের নেশায় চুর হয়ে নাচ দেখছে ওরা। বাঈজীরা হাসছে। দ্রুত তালে নাচছে তারা। শরীফ চাকলাদার তার পাশে বসা যুবতীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল এক সময়। আজমল রব্বানীর পাশে বসা মেয়েটা খিল খিল করে হেসে উঠল শরীফ চাকলাদারের কাণ্ড দেখে। আজমল রব্বানী তাকাল মেয়েটার দিকে। মেয়েটার গাল টিপে দিয়ে জড়িত কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'কি সুন্দরী, মদ ঢালছ না কেন?'

মেয়েটা গ্লাস ভর্তি করে দিল। গ্লাসটা আজমল রব্বানী মুখের কাছে তুলতেই পাশের কামরা থেকে ভেসে এল বেলের শব্দ, 'ক্রিং ক্রিং ক্রিং।'

আজমল রব্বানীর অবস্থা জাতে মাতাল তালে ঠিক-এর মত। ফোনের বেল ঠিকই শুনতে পেল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে শরীফ চাকলাদারের দিকে। মেয়েটা কাতুকুতু দিচ্ছে পেটে আর শরীফ চাকলাদার বেদম হাসছে। বিরক্তির রেখা ফুটল আজমল রব্বানীর কপালে। উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে। পাশ থেকে মেয়েটা বলে উঠল, 'কি হলো, হুজুর!'

'চুপ রও!' ধমকে উঠল আজমল রব্বানী। চুপসে গেল মেয়েটা। আজমল রব্বানী টলতে টলতে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

তিন মিনিট পরই ফিরে এল আজমল রব্বানী পাশের কামরা থেকে। জলসাঘরে পা দিয়েই স্পষ্ট গলায় সে আদেশ করল, 'নাচ থামাও।'

সাথে সাথে স্থির হলো বাঈজীদের পা। নাচ থামল, তবলা থামল, নূপুরের শব্দ থামল। কেবল শোনা যেতে লাগল শরীফ চাকলাদারের বেদম হাসি।

'থামুন!' বজ্রকণ্ঠে বলে উঠল আজমল রব্বানী। হাসতে হাসতে চাকলাদার তাকাল আজমল রব্বানীর দিকে। তার অগ্নিমূর্তি দেখে মেয়েটার কোল থেকে মাথা তুলে সিধে হয়ে বসার চেষ্টা করল সে। মিলিয়ে গেছে মুখের হাসি।

আজমল রব্বানী এগিয়ে এল, 'তোমরা যাও। ফিরোজা বাঈ, ড্রইংরুমে একজন লোক বসে আছে। তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যেয়ো।'

বিনা বাক্যব্যয়ে বাঈজীরা এবং তবলচি জলসাঘর ত্যাগ করে বেরিয়ে গেল। শরীফ চাকলাদারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসল আজমল রব্বানী। বলল, 'কি, শরীফ সাহেব, আউট হয়ে গেছেন নাকি?'

'না-না। ব্যাপার কি বলুন দেখি? হঠাৎ অমন চণ্ডমূর্তি ধরেছিলেন কেন?'

আজমল রব্বানীর নেশা ভেঙে গেছে পুরোপুরি। খানিক আগে বেহেড মাতাল ছিল সে তা বোঝাই যাচ্ছে না। মোটা গদীর ওপর বিছানো সাদা ধবধবে চাদরের উপর বসে দু'হাত দিয়ে মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সে বলল, 'ওপার থেকে আমাদের ইনফর্মার এসেছে!'

যাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো কথাটায়। টুটে গেল শরীফ চাকলাদারের নেশা। সিধে হয়ে বসল সে। বলল, 'তাই নাকি!'

অপেক্ষা করছিল ওরা ক'দিন থেকেই। সীমান্তের ওপার থেকে একজন লোক আসার কথা। লোকটা দূত হিসেবে কাজ করে কুচবিহারীর। গোপনে আমদানি হয় যেসব জিনিস সে-সব জিনিসের পরিমাণ, সে-সব জিনিস কবে, কিভাবে পৌঁছুবে তা আগে ভাগে জানিয়ে যায় কুচবিহারীকে এই লোক। এই লোকটাকে টাকা দিয়ে আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদার বশ করেছে। কুচবিহারীকে যে তথ্য লোকটা জানাবে তা এদেরকেও জানাবে, জানাবে কুচবিহারীকে জানাবার আগেই।

'এবার সত্যি সত্যি কুচবিহারীর হারামীপনা প্রমাণ হবে,' বলল চাকলাদার।

আজমল রব্বানী কথা বলল না। দরজা দিয়ে জলসাঘরে প্রবেশ করল একজন অবাঙালী লোক।

'আসুন, আসুন! খবর কি, নানকানীজী?'

নানকানী বচকমল হাড্ডিসার দেহটা নিয়ে দ্রুত মেঝেতে পাতা বিছানার কিনারায় এসে দাঁড়াল। তারপর দুই হাত একত্রিত করে বুক অবধি তুলে একটু নত হয়ে নমস্কার করল। বলল, 'খবর বহুত ভাল আছে, রাব্বানী আওর চাকলাদার সাব।'

'বসো বসো! চাকলাদার, নানকানীকে "তুমি"-ই বলো।'

নানকানী বিছানার কিনারায় বসল। ঢোলা সালোয়ার এবং কোর্তায় রোগা পটকা দেহটা ঢাকা তার। ট্রের ওপর রাখা মদের বোতল এবং গ্লাসের দিকে চোখ পড়তে আনন্দে চকচক করে উঠল তার চোখ দুটো, 'মুঝে ভি পিনেকা শওখ…!'

'আলবৎ, আলবৎ!'

আজমল রব্বানী গ্লাসে মদ ঢেলে দিল। প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিল নানকানী মদ ভর্তি গ্লাসটা। চুমুক দিয়ে নয়, ঢক ঢক করে পানীয় জল পান করার মত বিলিতি মদ গিলল সে। মদের গ্লাসটা শূন্য করে সশব্দে পর পর কয়েকটা ঢেকুর তুলে কোর্তার পকেট থেকে একটা আপেল বের করল সে।

আজমল রব্বানী ছোঁ মেরে একরকম কেড়েই নিল নানকানীর হাত থেকে রাঙা আপেলটা।

নানকানী দাঁত বের করে খিক খিক করে হাসতে লাগল।

আজমল রব্বানীর কোনদিকে খেয়াল নেই। সে চোখের সামনে আপেলটা তুলে ধরে গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করছে। আপেলটার দিকে ঝুঁকে পড়েছে শরীফ চাকলাদারও। নানকানী ওদের দু'জনের উদগ্র আগ্রহ দেখে খিকখিক করে হাসতে হাসতে পকেট থেকে আধ-খাওয়া আর একটা আপেল বের করে তাতে কামড় বসিয়ে দিল।

'পেয়েছি! ছুরি চাই।' আজমল রব্বানী পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা ছুরি বের করল।

আজমল রব্বানীর হাতে আপেলটা আপাত দৃষ্টিতে অক্ষত বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু আপেলটার খানিকটা জায়গা চারকোনা করে কাটা। চারকোনা করে কেটে টুকরোটা বিচ্ছিন্ন করে আপেলের ভিতর তথ্য সম্বলিত সেলোফিন ব্যাগ ঢুকিয়ে দিয়ে আবার চারকোনা অংশটুকু যথাস্থানে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আপেলটা এমন নিখুঁত ভাবে কাটা হয়েছে এবং পরে এমন নিপুণভাবে যথাস্থানে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যে গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা না করলে ধরে কার সাধ্য!

'কাটব তো, নানকানীজী?'

'জ্বী-হাঁ, জ্বী-হাঁ। হামার কাছে আরও ফল আছে। কুচবিহারী মোশায়কে নতুন ফল দেব।'

ছুরি দিয়ে আপেলটা কাটল আজমল রব্বানী। দেখা গেল একটা সেলোফিন পেপারে মোড়া সোনালী কাগজ। সেলোফিন কাগজটার ভিতর থেকে বের করা হলো সোনালী কাগজটা।

সোনালী কাগজটা ভাঁজ করা। আট ভাঁজ করা কাগজটার ভাঁজ খুলতে দেখা গেল কয়েকটা ছবি আঁকা রয়েছে। সোনালী কাগজের ওপর ছোট ছোট সাতটা হনুমানের ছবি। লাল। প্রতিটি হনুমানের নাভির জায়গায় সোনালী ফোঁটা একটা করে। ফোঁটাগুলোর মাঝখানে লেখা, 'দুই পাউণ্ড!'

সাতটা হনুমানের মাথার উপর লেখা রয়েছেঃ 6th May +Dhaka Airport + MIDNIGHT CODE WORD: KANGAROO.

সাতটা হনুমানের নিচে দুটো কাঠের বাক্স পাশাপাশি আঁকা। বাক্স দুটোর গায়ের ওপর লেখাঃ 11th May + Dhaka Airport + 7 P.M. CODE WORD: DELIVERY NET 50 Pounds.

শরীফ চাকলাদার পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে সোনালী কাগজের ছবি এবং লেখাগুলো হুবহু নকল করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। আজমল রব্বানী দাঁত বের করে হাসতে হাসতে পকেট থেকে বের করল একশো টাকার দশখানা নোট। নানকানী বচকমলের চোখ জোড়া চকচক করে উঠল। প্রায় ছোঁ মেরেই আজমল রব্বানীর হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে কোর্তার ভিতরের পকেটে ভরল সে।

'আমরা খুব খুশি হয়েছি, বচকমল,' নিজের আঁকা এবং লেখা হাতের কাগজটা আজমল রব্বানীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল শরীফ চাকলাদার।

আজমল রব্বানী সোনালী কাগজটা ভরল সেলোফিন পেপারের মোড়কে। সেটা নানকানী বচকমলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে জানতে চাইল, 'কুচবিহারী মশায়কে কখন এটা দিচ্ছেন আপনি?'

'ঘণ্টাখানেক পর।'

'ঠিক?'

'আলবৎ ঠিক।'

আজমল রব্বানী উঠে দাঁড়াল শরীফ চাকলাদারের দেয়া কাগজটা হাতে নিয়ে, 'তাহলে আপনাকে আর দেরি করিয়ে দেব না।'

উঠে দাঁড়াল নানকানী।

শরীফ চাকলাদার বসেই রইল। বিদায় দেবার জন্যে নানকানীকে নিয়ে জলসাঘর থেকে বেরিয়ে গেল আজমল রব্বানী।

দু'ঘণ্টা পর দেখা গেল জলসাঘরের পাশের কামরায় দুটো চেয়ারে বসে নীরবে সিগারেট টানছে আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদার। ওদের সামনে একটা টেবিল। টেবিলের উপর একটা ফোন।

নানকানী বচকমল বিদায় নেবার পর থেকে এই কামরায় টেলিফোন সামনে নিয়ে বসে আছে ওরা। একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছে চুপচাপ। অ্যাশট্রে ভরে গেছে সিগারেটের টুকরোয়। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কামরার ভিতরটা। মাঝে মাঝে দুজনেই তাকাচ্ছে ফোনটার দিকে। ওরা আশা করছে ফোনটা যে-কোন মুহূর্তে বেজে উঠবে।

কুচবিহারী ভকতরাম ওপারের দূত মারফত খবরাদি পাবার সাথে সাথেই ফোন করে থাকে আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদারকে। শরীফ চাকলাদারকে বাড়িতে ফোন করে পাবে না কুচবিহারী। কারণ সে আজমল রব্বানীর সাথেই রয়েছে। আগে কুচবিহারী অবশ্য আজমল রব্বানীকেই ফোন করবে। তাই সব সময় করে। কারণ তিন জনের মিলিত ব্যবসার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পুঁজি কুচবিহারীর, শতকরা তিরিশ ভাগ আজমল রব্বানীর এবং কুড়ি ভাগ শরীফ চাকলাদারের। ব্যবসাটা পুরোপুরি দেখাশোনা করে কুচবিহারী। এরা দু'জন শুধু লাভের ভাগ নিয়েই সন্তুষ্ট। লাভের পরিমাণও হিসেব করে নির্ধারণ করে কুচবিহারী। সে যে হিসেব দেয় সেই হিসেবই মেনে নিতে হয় এদেরকে। এতদিন তাই মেনে নিয়েছে এরা। কিন্তু ইদানীং আর মেনে নিতে চাইছে না। ইতিমধ্যে লাভের পরিমাণ কত তা নিয়ে তুমুল ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে গেছে কুচবিহারীর সাথে এদের। রীতিমত জানের ভয় দেখিয়েছে শরীফ চাকলাদার কুচবিহারীকে। পুঁজি তার সবচেয়ে কম হলেও আপত্তি, অভিযোগ সবচেয়ে তারই বেশি।

আড়াই ঘণ্টা পর ফোনের বেল বাজল। আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদার দুজনেই হাত বাড়াল। রিসিভারের দিকে। ছোঁ মেরে তুলে নিল আজমল রব্বানী রিসিভারটা ক্রেডল থেকে।

অপর প্রান্ত থেকে কুচবিহারীর গম্ভীর গলা ভেসে এল, 'হ্যালো?'

আজমল রব্বানী বলল, 'আমি রব্বানী বলছি। কি খবর, বিহারী সাহেব? এমন অসময়ে কি দরকার পড়ল?'

কুচবিহারী বলল, 'নমস্কার, রব্বানী সাহেব। সুখবর আছে।'

গম্ভীর গলায় বলল আজমল রব্বানী, 'বলুন।'

'খবর এসেছে ওপার থেকে। মাল আসছে।'

'কি মাল?'

'সোনা।'

আজমল রব্বানী আড়চোখে তাকাল শরীফ চাকলাদারের দিকে, শরীফ চাকলাদার চোখ টিপে মাথা নাড়ল।

আজমল রব্বানী কুচবিহারীকে প্রশ্ন করল, 'কি পরিমাণ?'

'সাত পাউণ্ড,' বলল কুচবিহারী।

'সাত পাউণ্ড মাত্র?'

ক্রোধ চেপে স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল আজমল রব্বানী। শরীফ চাকলাদার দাঁতে দাঁত চাপল। কুচবিহারী বলল, 'পরে আসছে আরও পঁচিশ পাউণ্ড।'

চুপ করে রইল আজমল রব্বানী। কুচবিহারী যে মিথ্যুক তা সে সন্দেহ করলেও এত সহজ সরল ভাবে এমন ডাহা মিথ্যে কথা বলে দেখে সর্ব শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গেল তার প্রতিহিংসায়।

'কবে আসছে মাল?'

'পরে জানা যাবে,' উত্তর দিল কুচবিহারী।

আজমল রব্বানী বলল, 'ঠিক আছে, দেখা হবে পরে।'

'নমস্কার।' ফোন ছেড়ে দিল কুচবিহারী।

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে আজমল রব্বানী চোখ মুখ ভয়াবহ রকম বিকৃত করে দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল, 'কুত্তার বাচ্চা, এক নম্বর বেঈমান! মরণ ঘনিয়েছে শালার।'

শরীফ চাকলাদার কিছু বলল না। কিন্তু সে তাকিয়ে আছে আজমল রব্বানীর দিকে। কি যেন ভাবছে সে। আজমল রব্বানী তাকাল তার দিকে, 'কিছু বলুন! আমাদেরকে বেঈমানটা এভাবে ঠকাবে আর আমরা সব জেনে শুনে চুপ করে থাকব?'

শরীফ চাকলাদার এতটুকু উত্তেজিত হয়নি। হেসে উঠল সে হঠাৎ। বলল, 'নতুন করে আমার বলবার কিছু নেই, রব্বানী সাহেব। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে আমাদেরকে। তা হলো, কুচবিহারীর বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় নিতে পারি না। আমরা তিনজন যে কারবার একত্রে করছি তা অবৈধ, বেআইনী। এই তিনজনের একজন যদি বেঈমানী করে তাহলে তার বিচার বাকি দুজনকেই করতে হবে। এবং অপরাধ ছোট বা বড় যাই হোক, শাস্তি হতে হবে মৃত্যু। জানেন তো, চোরা না শোনে ধর্মের কথা। কুচবিহারীকে অনুরোধ উপরোধ বা ভয়ডর দেখালে কোনও লাভ হবে না।'

'আপনি বলতে চান ওকে খুন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই?'

'হ্যাঁ, আমি তাই বলতে চাই।'

'ভয় দেখালেও এর থেকে কুচবিহারী সাবধান হবে না?'

শরীফ চাকলাদার আবার হাসল। বলল, 'কুচবিহারীকে আমরা যদি বলি যে আপনি চুরি করছেন, আমাদেরকে ঠকাচ্ছেন, এরপর থেকে সে-চেষ্টা করবেন না, করলে খুন করে ফেলব—তাহলে কুচবিহারী কি করবে জানেন?'

'কি করবে?'

'কুচবিহারী আমাদের দুজনকেই খুন করে ফেলবে। এ আমার স্থির বিশ্বাস। ইতিমধ্যেই সে হয়তো আমাদেরকে খুন করার জন্যে লোক লাগিয়েছে। ব্যবসার অন্যান্য ব্যাপারে তো তর্ক-বিতর্ক হচ্ছেই। আমরা যে ওর বেঈমানী ধরে ফেলেছি তা হয়তো ও টের পেয়েছে। সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।'

আজমল রব্বানী গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে তাকাল সে, চাপা কণ্ঠে বলল, 'বেশ, তাই করা হোক। ব্যাটাকে সরিয়ে দেয়া যাক দুনিয়া থেকে।'

কামরার জানালাগুলো খোলা। পর্দা ঝুলছে। একটা জানালার পর্দা একটু যেন নড়ে উঠল। সেদিকে তাকাল রব্বানী। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। ইচ্ছা হলো বাইরে বেরিয়ে বা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভাল করে করিডরটা দেখে আসে, কিন্তু শরীফ চাকলাদার তখনই কথা বলে উঠল বলে আজমল রব্বানীর আর যাওয়া হলো না। খানিক পর সে ভুলেই গেল ব্যাপারটা।

এদিকে জানালার পর্দা সামান্য একটু সরিয়ে একটা যুবতী তাকিয়ে আছে ওদের দুজনের দিকে, শুনছে ওদের প্রতিটি কথা।

শরীফ চাকলাদার বলল, 'খুব কৌশলে এবং পরিকল্পিতভাবে খুন করতে হবে কুচবিহারীকে। পুলিশ যেন বুঝতে না পারে কুচবিহারীকে কেউ খুন করেছে।'

'কিন্তু খুনটা করবে কে?'

'কেন, আমরা?'

'আমরা, মানে…আমরা কি পারব?'

'পারব না মানে? না পারলে চলবে কেন? আপনি কি টাকা দিয়ে খুনী ভাড়া করে কুচবিহারীকে খুন করতে চান?'

'সেটাই কি ভাল হত না?'

'মোটেই না। খুনী যদি পরে ধরা পড়ে? পুলিসের কাছে নির্ঘাৎ আমাদের নাম বলে দেবে।'

আজমল রব্বানীকে এবার সত্যি সত্যি চিন্তিত দেখাল।

'তবে তেমন বিশ্বস্ত লোক যদি পাই তাহলে আলাদা কথা। কাজটা নিজের হাতে করা খুব একটা সহজ নয়। ঝক্কি-ঝামেলা-ঝুঁকি সবই আছে। তেমন উপযুক্ত লোক পেলে তাকে দিয়েই করানো যাবে। কিন্তু সে রকম লোক পাচ্ছি কোথায়, বলুন? ধরে নিন শালাকে আমরাই খুন করব।'

'কবে নাগাদ…?'

'দিন তারিখ এখুনি ঠিক করার দরকার নেই। কিভাবে খুন করা হবে সেটা

চালাতে হবে আগে। তারপর দিন তারিখের প্রশ্ন।'

'গুলি করেই...।'

'বড় বেশি ভয় ধরা পড়ার। গুলির শব্দ চাপা দেবেন কিভাবে আপনি? তবে লোকালয়ের বাইরে যদি হয় তবে গুলি করা চলে। মোট কথা এ ব্যাপারে আপনাকে-আমাকে দুজনকেই প্রচুর ভাবনা চিন্তা করতে হবে। ভেবে চিন্তে তৈরি করতে হবে একটা নিখুঁত পরিকল্পনা।'

আজমল রব্বানী বলল, 'কিন্তু বেশি সময় নষ্ট করা আমাদের উচিত নয়। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন শালা আমাদেরকে ঠকাবে। এই যে আগামী ক'দিন পর মাল আসছে, শালা অর্ধেকই গাপ করে দিতে যাচ্ছে।'

শরীফ চাকলাদার বলল, 'এ মাল এসে পৌঁছুবার আগেই খুন করব আমরা ওকে।'

'সম্ভব?'

'চেষ্টা করলে সবই সম্ভব।' উঠে দাঁড়াল ওরা।

জানালার সামনে থেকে যুবতী সরে গেল দ্রুত। ওরা কেউ জানতেই পারল না ওদের ষড়যন্ত্রের কথা কেউ শুনে ফেলেছে।

তিন

কুচবিহারীর অত্যাধুনিক অট্টালিকাটি অভিজাত ধনী লোকদের এলাকা গুলশান মডেল টাউনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তিনতলা বিল্ডিংটা দেখতে ছোটখাট হলেও চারপাশের বাগান এবং সবুজ ঘাসে ঢাকা ফাঁকা জায়গাটুকু নিয়ে বাড়িটাকে প্রকাণ্ডই বলা চলে। অতবড় বাড়ি, কিন্তু লোক সে তুলনায় খুবই কম। কুচবিহারী, তার মেয়ে সুলতা এবং দুজন চাকর-চাকরানী ছাড়া আর কেউ নেই। সুলতার মা মারা গেছে আজ পনেরো বছর হলো। তখন ওরা বার্মায় থাকত! বার্মা থেকে ওরা বাংলাদেশে এসেছে মাত্র দু'বছর আগে।

কুচবিহারীর ব্যবসা এটা নয়। মৌলবী বাজারে তার গুঁড়ো মশলার ফ্যাক্টরী আছে। চকে আছে পাইকারী দরে মনিহারী দ্রব্য বিক্রির দোকান। জিঞ্জিরায় আছে গোটা চারেক ভেজাল কারখানা। চাল-ডাল-নুন-তেল-আলু-পেঁয়াজ প্রভৃতি কেনা-বেচার ব্যবসাটাই সবেচেয়ে প্রিয় কুচবিহারীর। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসাই আসল ব্যবসা, তার মতে। মানুষ আর কিছু কিনুক বা না কিনুক, খাবার জিনিস তাকে কিনতেই হবে। যাই হোক, কুচবিহারীর আরও নানার রকম ব্যবসা আছে। তার মধ্যে অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমেই সে সবচেয়ে বেশি মুনাফা লোটে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কুচবিহারী গতরাতে নওশেরের সাথে তার যে কথাবার্তা হয়েছিল সে-সম্পর্কে ভাবছিল। কেমন যেন খুঁত-খুঁত করছে তার মন।

নওশেরকে বিশ্বাস করা কি তার উচিত হয়েছে? যে লোক তার একটা দুর্বলতার সন্ধান পাবার পর থেকে তাকে ব্ল্যাকমেইল করে আসছে আজ বছর খানেক ধরে, তাকে কি বিশ্বাস করা ভাল?

চিন্তা করতে করতে বেশ একটু ভীত হয়ে উঠল কুচবিহারী। নওশেরের পক্ষে সবই সম্ভব মনে হলো তার। হয়তো টাকার লোভে সে রব্বানী এবং চাকলাদারকে খুন ঠিকই করবে কিন্তু তারপর আবার সে তার কাছে এসে টাকা চাইবে। টাকা না দিতে চাইলে ভয় দেখাবে সে যে রব্বানী এবং চাকলাদারকে খুন করার জন্যে তাকে টাকা দিয়েছে তা প্রকাশ করে দেবার। তাতে অবশ্যি নওশেরের নিজের বিপদও কম নয়। কিন্তু সে যে রকম চালু এবং বেপরোয়া লোক তাতে নিজেকে রক্ষা করার একটা ব্যবস্থা ঠিকই বের করবে সে।

মেজাজটা তেতো হয়ে গেল কুচবিহারীর। রাগের এবং ঝোঁকের মাথায় কাজটা করা ঠিক হয়নি। আরও ভাবনা-চিন্তা করার দরকার ছিল। রব্বানী এবং চাকলাদারকে খুন করতে হবে তা ঠিক। ওরা দুজন তাকে আর বিশ্বাস করছে না। যে কারবার একসাথে তারা করে তাতে একবার সন্দেহের বীজ ঢুকলে সর্বনাশ অনিবার্য। প্রশ্ন হচ্ছে, কার সর্বনাশ?

কুচবিহারী নিজের সর্বনাশ চায় না। চায় না বলেই সে খুন করতে বদ্ধ পরিকর ওদের দুজনকে। কিন্তু খুনের দায়িত্ব নওশেরকে দেয়াটা যে বোকামি হয়ে গেছে তা সে বেশ বুঝতে পারল। পেশাদার কোন খুনীকে একাজে নিযুক্ত করা উচিত ছিল তার। ভাত ছড়ালে যেমন কাকের অভাব হয় না তেমনি টাকা খরচ করলে খুনীরও অভাব হয় না। এক ঢিলে দু' পাখি ঘায়েল করা যেত। নওশেরকেও খুন করা যেত, রব্বানী আর চাকলাদারকেও খুন করা যেত।

দরজায় টোকা পড়তে বিছানা ছেড়ে উঠল কুচবিহারী। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল মাত্র আটটা বেজেছে। এত সকালে কেন ডাকাডাকি তাকে? কেউ এল নাকি?

'কে?' বিরক্তির সুরে জানতে চাইল কুচবিহারী।

সুলতার গলা ভেসে এল বাইরে থেকে, 'বাবা, আমি সুলতা।'

শান্ত হলো কুচবিহারী, বলল, 'কেন, মা?' দরজা খুলে দিল কুচবিহারী।

'তোমার সাথে একজন লোক দেখা করতে এসেছেন, বাবা।'

কুচবিহারী মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। সুলতা যে কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট তা সে বুঝতে পারল। আজমল রব্বানী বা শরীফ চাকলাদারকে সুলতা যে ভাল চোখে দেখে না তা-ও সে জানে। সুলতা তাকে বহুবার পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, বাবা, ওদের সাথে কিসের ব্যবসা করো তুমি? ওদেরকে ভাল লোক বলে মনে হয় না আমার। কুচবিহারী মেয়ের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে এতদিন।

'কে এসেছে, মা? রব্বানী সাহেব?'

'না। আগে কখনও দেখিনি। নাম বলল নওশের আবদুল্লাহ। লোকটা কে,

বাবা? চেহারাটা ভয়ঙ্কর।'

কুচবিহারীর মুখে কথা নেই। নওশেরের সাহস দেখে স্তম্ভিত সে। এ বাড়িতে না আসার জন্যে কুচবিহারী তাকে একশোবার নিষেধ করে রেখেছে। তবু কোন্ সাহসে এসেছে সে?

'কি হলো, বাবা? কে ওই লোক? তুমি অমন করে কি ভাবছ হঠাৎ?'

সুলতা অবাক হয়ে গেছে বাবার হঠাৎ পরিবর্তনে।

'ও কিছু নয়, মা। তুমি তোমার কামরায় যাও। তা নওশেরকে বসিয়েছ তো?'

'হনুমানজী বসিয়েছে ড্রয়িংরুমে। কিন্তু লোকটা কে তা তো বললে না, বাবা?'

কুচবিহারী জোর করে হাসল, 'বলল, কত রকম লোকের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয় মা ব্যবসার খাতিরে, তা আর কি বলব। ওর পরিচয় জেনে তুমি কি করবে বলো? যাকগে, কলেজে যাচ্ছ তো ঠিক মত?'

'সে কি, বাবা! তোমাকে গতকাল বললাম না কলেজে গোলমাল হয়েছে, কলেজ বন্ধ...!'

হেসে ফেলল কুচবিহারী, 'ভুলে গেছি, মা। কলেজে গোলমাল, না? তবে যেয়ো না। কিন্তু কলেজ বন্ধ বলে পড়াশুনায় যেন ঢিলে দিয়ো না...।' বলতে বলতে কুচবিহারী পা বাড়াল বাথরুমের দিকে।

মুখ হাত ধুয়ে ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকল কুচবিহারী। নওশের আবদুল্লা একটা সোফায় বসে আছে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে সে ঠোঁট দুটো গোল করে উপরের দিকে। ধোঁয়ার রিঙ ছুটে যাচ্ছে সিলিংয়ের দিকে। কুচবিহারী ভিতরে ঢুকতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, কথা না বলে একটু শুধু হাসল।

চোখমুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর কুচবিহারীর। নওশেরের সামনে এসে দাঁড়াল সে, বসল না। বলল, 'নওশের?'

নওশের আবার তাকাল। কুচবিহারীর গাম্ভীর্য দেখেও না দেখার ভান করে হাসল আবার। বলল, 'বসুন, বিহারী সাহেব। খারাপ খবর আছে।'

'নওশের, মনে নেই এ বাড়িতে আসতে মানা করেছিলাম তোমাকে?'

দাঁত বের করে হাসল নওশের। বলল, 'ও, তাই বুঝি রেগে গেছেন? কিন্তু মানা করলেও থাকতে পারলাম না, বিহারী সাহেব। হাজার হোক, আপনার সাথে সম্পর্ক আমার আগের চেয়েও গভীর হয়েছে। আপনার বিপদের খবর পেয়ে চুপ করে বসে থাকি কি করে বলুন? খবরটা শোনা মাত্র পড়িমড়ি করে ছুটে এসেছি। তা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, বিহারী সাহেব।'

বসল কুচবিহারী, 'কেন এসেছ তুমি এই সক্কালবেলা?'

'শান্ত হোন, বিহারী সাহেব। কিছু একটা বলব বলেই এসেছি। কিন্তু তার আগে মাথা ঠাণ্ডা করুন। এখন আপনার বিপদের সময়। মাথা গরম করলে বিপদ থেকে মুক্তি পাবেন না। ব্যস্ত হবেন না। বলছি। তার আগে বলুন, আমাদের কথা

কেউ শুনছে না তো?'

একদৃষ্টিতে কুচবিহারী তাকিয়ে আছে নওশেরের দিকে, চোখ না সরিয়েই সে বলল, 'না। কি বলবে বলো। কেউ শুনছে না তোমার কথা।'

'তবে বলি। বলার আগে একটা কথা জেনে রাখুন। যে খবরটা আপনাকে বলব তা আমি কোত্থেকে, কিভাবে জেনেছি তা জিজ্ঞেস করবেন না। জিজ্ঞেস করলে আমার কাছ থেকে উত্তর পাবেন না।'

'বকবক কোরো না, নওশের। তোমার বকবকানি শোনার মত সময় আমার নেই…'

কুচবিহারীকে থামিয়ে দিয়ে নওশের হেসে উঠল, বলল, 'বেশ, শুনুন। আপনার বন্ধুরা একটা ষড়যন্ত্র করেছে। সে ষড়যন্ত্রের কথা, দুর্ভাগ্যবশত, আমি জানতে পেরেছি।'

'আবোল তাবোল বোকো না, নওশের।'

সাবধান করে দিয়ে বিরক্তির সাথে বলল আবার কুচবিহারী, 'যা বলবে পরিষ্কার করে বলো। কাদের কথা বলছ? কে ষড়যন্ত্র করেছে? কার বিরুদ্ধে?'

'ষড়যন্ত্রটা করেছে আপনার দুই বন্ধু। আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদার। কার বিরুদ্ধে? বুঝতে পারছেন না কার বিরুদ্ধে?' কুচবিহারীর দু'চোখে বিরক্তির চিহ্ন। অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে।

নওশের আবার বলল, 'আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে তারা। আপনি যেমন তাদেরকে খুন করতে চান তারাও তেমনি…।'

'আস্তে…!' চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল কুচবিহারী।

হাঃ হাঃ করে হঠাৎ হেসে উঠল নওশের। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কুচবিহারী তাকিয়ে রইল। নওশের হাসি থামিয়ে আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'আগেই আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করে নিয়েছি আমাদের কথা কেউ শুনছে কিনা…।'

'দেয়ালেরও কান আছে, নওশের। যা বলবে আস্তে আস্তে বলো। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে ওরা একথা কে বলল তোমাকে?'

'এ প্রশ্ন করবেন না। কি ভাবে জেনেছি, কে বলেছে তা আপনাকে বলব না। ওরা ষড়যন্ত্র করেছে আপনাকে খুন করার।'

'অসম্ভব! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

কুচবিহারীর কথা শেষ হতেই সোফা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল নওশের, 'আমি জানতাম এ কথাই বলবেন আপনি। যাকগে, আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম। পরে আমাকে দুষবেন না যেন।'

'উঠে দাঁড়ালে যে?'

'কাজ আছে আমার। আপনি যা বিশ্বাসই করেন না, সে ব্যাপারে কি আর আলাপ চলে?'

'আচ্ছা, বসো। ধরা যাক, ওরা আমাকে খুন করতেই চায়। কিন্তু তাতে ক্ষতি

কি? তোমার সাথে আমার চুক্তি তো হয়েই গেছে। ওদেরকে তুমি খুন করতে রাজি নও এখন?'

'রাজি নই কে বলল? টাকা পেলে নওশের সব করতে পারে।

'তবে? ওরা আমাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছে একথা শুনে আমার ভয় পাবার কি আছে?'

'নেই? ধরুন, আমি ওদেরকে খুন করার আগেই ওরা যদি আপনাকে খুন করে বসে?'

'তার মানে!' কুচবিহারীর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। নওশের আরাম করে বসল আবার।

'আপনাকে আমি কথা দিয়েছি এক হপ্তার মধ্যে ওদেরকে খুন করব। মনে আছে তো কথাটা? ধরুন, তার আগেই যদি ওরা…।'

'না, একহপ্তা অনেক দিন। তার আগেই, মানে, আজকালকের মধ্যে তুমি ওদেরকে শেষ করে ফেলো।'

'শেষ করে ফেলো বললেই তো আর শেষ করা যায় না, বিহারী সাহেব। নিজের নাক বাঁচিয়ে খুব সাবধানে কাজটা করতে হবে। কাজটা করে ধরা পড়ে গেলে ফাঁসি হবে আমার। সুতরাং ভেবেচিন্তে একটা নিখুঁত উপায় বের করতে হবে আগে। সেজন্যে সময় লাগবেই। এক হপ্তার মধ্যে কথা দিয়েছি, তারও বেশি সময় লাগার কথা। দু'একদিনের মধ্যে তো একেবারেই অসম্ভব।'

'তাহলে? ওরা যদি তার আগেই…।'

নওশেরকে গম্ভীর দেখাল, 'হ্যাঁ, সেটাই আসল প্রশ্ন। তার আগেই যদি ওরা আপনাকে খুন করার চেষ্টা করে?'

'তুমি জানো না কবে কিভাবে ওরা আমাকে…'

নওশের বলল, 'না, তা জানি না। তা জানলে তো এত সমস্যার সৃষ্টি হত না। তবে যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হচ্ছে দু' একদিনের মধ্যেই চেষ্টা করবে ওরা।'

অধৈর্য গলায় কুচবিহারী বলে উঠল, 'তুমি কি ওদেরকে আজকালকের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারো না? আরও বেশি টাকা দিলে?…'

'কত টাকা?' চকচক করে উঠল নওশেরের চোখ দুটো লোভে।

'পঞ্চাশ হাজার।'

'ভেবে দেখি।' ভাবতে লাগল নওশের।

কুচবিহারী উঠে দাঁড়াল। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। কার্পেটের উপর পায়চারি করতে শুরু করল সে। একসময় নওশেরের সামনে দাঁড়াল সে, 'বলল, ভেবে দেখার এর মধ্যে কিছু নেই, নওশের। তুমিই বহুবার বলেছ টাকা পেলে তোমার পক্ষে সবই করা সম্ভব। এক হপ্তার মধ্যে ওদেরকে তোমার খুন করার কথা, তার জায়গায় আগামীকালই তোমাকে কাজটা করতে বলছি। এ জন্যে পঞ্চাশ হাজার বেশি দেব তোমাকে।'

মুখ তুলে নওশের বলল, 'ঠিক আছে। আপনার কথা মতই কাজ হবে। আগামী

কাল রাত বারোটার মধ্যে ওদেরকে খতম করব আমি। টাকা?'

কুচবিহারী বলল, 'সোয়া লাখ, না? কালকে যেমন কথা হয়েছিল, চারটের সময় মন্দিরে যেয়ো। আমি টাকা নিয়ে অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।'

'বেশ। বাকি সোয়া লাখ আর মাসিক বরাদ্দের বদলে এককালীন এক লাখ, মোট সোয়া দুই লাখ টাকা আগামী পরশুদিন পাচ্ছি তো?'

'নিশ্চয়ই পাচ্ছ। পরশু দিন বিকেল পাঁচটায় মন্দিরে টাকা নিয়ে যাব আমি।'

শিস দিয়ে উঠে দাঁড়াল নওশের আবদুল্লা।

চার

আধঘন্টা পর নওশের আবদুল্লাকে দেখা গেল আজমল রব্বানীর ধানমণ্ডিস্থ বাড়ির বৈঠক খানায়।

ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে আজমল রব্বানী।

নওশের আবদুল্লা হাসছে।

শরীফ চাকলাদার খানিক আগে মাত্র পৌঁছেছে আজমল রব্বানীর ফোন পেয়ে। বিমূঢ় দেখাচ্ছে তাকে। আজমল রব্বানী এইমাত্র সব কথা বলেছে তাকে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল শরীফ চাকলাদারই, 'কিন্তু আপনার স্বার্থ কি? কুচবিহারী আপনাকে টাকা দেবে বলেছে আমাদের দুজনকে খুন করার জন্যে। আমাদেরকে খুন করে তার কাছ থেকে টাকা নেয়াটাই আপনার স্বার্থ। তা না করে আপনি আমাদের কাছে এসেছেন কি মনে করে?'

নওশের আবদুল্লাকে এতটুকু অপ্রতিভ দেখাল না। আগের মতই হাসছে সে। শরীফ চাকলাদারের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে উঠল, 'আগেই তো বললাম, অকারণে কাউকে আমি খুন করি না। টাকা পেলেই খুন করা আমার স্বভাব নয়। যাকে খুন করব সে খুন হবার মত কোন অন্যায় অপরাধ করেছে কিনা তা জানা দরকার আমার। আমি পেশাদার খুনী হলেও নিরীহ লোককে খুন করা আমার পেশা নয়। আপনাদের অপরাধ কি এ প্রশ্ন আমি কুচবিহারী সাহেবকে করেছিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দেননি। তাই আপনাদের কাছে এসেছি।'

'আমাদের কাছ থেকে কি আশা করো তুমি?'

নওশের আবদুল্লা বলল, 'কিছু আশা করি না। শুধু জানতে চাই কুচবিহারী সাহেব কেন আপনাদেরকে খুন করতে চান? আপনাদের সাথে তার বিরোধটা কোথায়?'

আজমল রব্বানী বলে উঠল, 'কুচবিহারীর সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা তিনজন একটা ব্যবসার অংশীদার। ব্যবসাটা কুচবিহারীই দেখা শোনা করে। কিছুদিন থেকে আমরা বুঝতে পারছি সে আমাদেরকে ভীষণ ঠকাচ্ছে। ফলে মনে মনে আমরা খেপে আছি। আমরা যে খেপে আছি তা কুচবিহারী সম্ভবত বুঝতে

পেরেছে। হয়তো সেজন্যেই আমাদেরকে খুন করতে চায়।'

নওশের ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন। সেজন্যেই সে খুন করতে চায় আপনাদেরকে।'

শরীফ চাকলাদার একটা সিগারেট ধরাল।

নওশের আবদুল্লা বলল, 'এখন দেখছি কুচবিহারী নিজের অপরাধ ঢাকার জন্যে আপনাদেরকে খুন করতে চাইছে। অথচ আমি ভেবেছিলাম অন্য রকম।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন?' জানতে চাইল শরীফ চাকলাদার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ফলে অনেকটা শান্ত বোধ করছে সে।

নওশের আবদুল্লাও পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনাদের দ্বারা মারাত্মক কোন ক্ষতি হচ্ছে কুচবিহারীর, তাই সে বাধ্য হয়ে আপনাদেরকে খুন করতে চাইছে। এখন দেখছি তা নয়। আসলে একটা অপরাধ ঢাকার জন্যে আর একটা অপরাধ করতে চাইছে সে। না, তার কথা মত কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অকারণে কোন নিরীহ লোককে আজ পর্যন্ত খুন করিনি আমি, করবও না কোনদিন।'

'তার মানে কুচবিহারীর প্রস্তাব আপনি প্রত্যাখান করবেন?' জানতে চাইল আজমল রব্বানী।

নওশের গম্ভীর গলায় বলল, 'নিশ্চয়। আমি যখন জেনেছি যে আপনারা নিরপরাধ তখন কি আর আপনাদেরকে খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব?'

শরীফ চাকলাদার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, বলল, 'আপনি বেশ বুদ্ধিমান লোক, নওশের আবদুল্লা। কুচবিহারী যে লোক ভাল নয় তা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ। লোকটা সত্যিই ভাল নয়। কিন্তু আপনাদের সাথে দেখা না করলে আমি তা জানতেই পারতাম না। হয়তো তার কথায় আপনাদেরকে আমি খুন করে ফেলতাম। এক হাতে তুড়ি দিয়েই ঘটে যেত ব্যাপারটা।'

শরীফ চাকলাদার এবং আজমল রব্বানীর বুক কেঁপে উঠল ভয়ে।

শরীফ চাকলাদার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ঢোক গিলল, তারপর বলল, 'কুচবিহারী সম্পর্কে আপনিও আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন, নওশের আবদুল্লা। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে সে এমন একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না। অথচ কথাটা সত্যি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে···।'

শরীফ চাকলাদার মাঝপথে থেমে আজমল রব্বানীর দিকে তাকাল। আজমল রব্বানী মৃদু মাথা নাড়ল। শরীফ চাকলাদার নীরব ইঙ্গিত পেয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আপনি যদি তার কথা মত কাজ না করেন তাহলে সে আর একজন লোককে লাগাবে। অর্থাৎ আমাদেরকে খুন করার চেষ্টা করবেই।'

নওশের আবদুল্লাকে চিন্তিত দেখাল। বলল, 'আমিও সে কথাই ভাবছি।'

'তাহলে তো বিপদের কথা···।'

আজমল রব্বানীর কথার মাঝখানে শরীফ চাকলাদার বলে উঠল, 'ভাবতে গেলে সত্যি বিপদের কথাই বটে। কিন্তু এই বিপদ থেকে নওশের আবদুল্লা আমাদেরকে মুক্ত রাখতে পারেন।'

নওশের আবদুল্লা সিগারেটের ধোঁয়া উপর দিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে জানতে চাইল, 'তার মানে?'

'তার মানে আমাদের কথা মত কাজ করুন।'

'কি কাজ?'

'নওশেরকে অবাক হতে দেখা গেল। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।'

'কুচবিহারী লোক ভাল নয়। আমাদের মত নিরীহ লোককে সে খুন করতে চায়। সুতরাং ওর শাস্তি পাওয়া দরকার। নওশের আবদুল্লা, আপনি কুচবিহারীকে খুন করুন। যত টাকা লাগে আমরা দেব।'

আজমল রব্বানী চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'চমৎকার! এটাই একমাত্র রাস্তা। শরীফ সাহেব, সত্যি আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না।'

শরীফ চাকলাদার তাকিয়ে আছে নওশেরের দিকে।

'ভেবে দেখার কি আছে এর মধ্যে? কুচবিহারীকে খুন করতে না চাওয়ার কোন কারণ নেই আপনার। সে যে নিরীহ বা নিরপরাধ নয় তা আপনিই প্রমাণ করেছেন। টাকা পয়সার কথা ভাবছেন? টাকার কথা···।'

শরীফ চাকলাদারের কথার মাঝখানে আজমল রব্বানী বলল, 'টাকার কথা ভাবতে হবে না। আমাদের দুজনকে খুন করার জন্যে কুচবিহারী আড়াই লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল, তাই না? ঠিক আছে, আমরাও আড়াই লাখ টাকা দেব। সুবিধেটুকু আপনারই, আড়াই লাখ টাকা পাবেন অথচ খুন করতে হবে একজনকে, দুজনকে নয়।'

নওশের আবদুল্লা হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদার নওশেরের এমন অট্টহাসির কারণ বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইল তার দিকে।

হাসি থামতে নওশের আবদুল্লা বলল, 'আপনাদের প্রস্তাবটা সত্যি লোভনীয়।'

'রাজি তাহলে আপনি?' শরীফ চাকলাদার সাগ্রহে জানতে চাইল।

করমর্দনের জন্যে নওশের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রাজি!'

একগাদা টাকার বাণ্ডিল নিয়ে নিজের কামরায় বসে বসে হিসেব কষছিল কুচবিহারী। হিসেব শেষ করে অ্যাটাচী কেসে টাকার বাণ্ডিলগুলো ভরে ফেলল সে। এমন সময় ফোন এল।

ফোন করেছে নওশের আবদুল্লা। রিসিভার কানে তুলে কুচবিহারী বলল, 'কাকে

চাই?'

'আমি নওশের আবদুল্লা। আপনার সাথে জরুরী একটা আলাপ করার দরকার হয়েছে হঠাৎ, বিহারী সাহেব।'

'বিকেল চারটের সময় মন্দিরে এসো। যা বলবার ওখানেই বোলো।'

নওশের আবদুল্লা বলল, 'না, তার আগেই কথাবার্তা হওয়া দরকার আমাদের মধ্যে। ব্যাপারটা খুবই জরুরী।'

কুচবিহারীর চোখমুখ ক্রমশ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠছে। নিজের ভুল টের পাচ্ছে সে। নওশের আবদুল্লাকে মাথায় তুলে ফেলেছে সে।

'কি কথা? কি এমন কথা বলতে চাও যা দু'তিন ঘণ্টা পর বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? তোমার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারছি না। এমন ঘন ঘন বিরক্ত করলে...।'

নওশের আবদুল্লা অপর প্রান্ত থেকে মৃদু শব্দ করে হাসল, বলল, 'ফোনে সে কথা বলা যাবে না। আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি আপনার বাড়িতে এখুনি একবার...।'

চাপা গলায় দাঁতে দাঁত চেপে কুচবিহারী বলল, 'না। আমার এ-বাড়িতে তুমি এসো না।'

'তাহলে কথাটা বলব কোথায়?'

'মন্দিরে চারটের সময় যেয়ো। তখনই শুনব।'

নওশের আবদুল্লা বলল, 'আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না আসল ব্যাপারটা। যাকগে, আপনার কথাই থাকুক। তবে একটা কথা জানিয়ে দিই। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো?'

গম্ভীর গলা কুচবিহারীর, 'পাচ্ছি। কি বলবে বলো তাড়াতাড়ি।'

'মন্দিরে চারটের সময়ই দেখা হবে। সোয়া লাখ টাকা নিয়ে যাবার কথা আপনার মনে আছে তো? ও টাকায় হবে না, আরও বেশি টাকা নিয়ে যাবেন।'

কুচবিহারীর চোখ মুখ ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠল। চাপা গলায় প্রায় গর্জন করে উঠল সে, 'নওশের! এ তোমার কি ধরনের শয়তানি! আবার বেশি টাকার দাবি...।'

অপরপ্রান্ত থেকে নওশের আবদুল্লা শান্ত গলায় বলে উঠল, 'এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করে লাভ নেই, বিহারী সাহেব। আপনার বন্ধুরা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।'

'অ্যাঁ! তার মানে আজমল আর চাকলাদার...!'

'জ্বী হ্যাঁ। আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন ওরাও আমাকে সেই একই প্রস্তাব দিয়েছে। আপনি দু'জনের জন্যে যে টাকা দিতে চেয়েছেন ওরা একজনের জন্যে সেই পরিমাণ টাকা দিতে চেয়েছেন। এখন আপনিই বলুন, আমি কি করি? যে কাজের জন্যে আপনি এবং আপনার বন্ধুরা আলাদা আলাদা প্রস্তাব আমাকে দিয়েছেন সে কাজ করা আমার পেশা। যে পার্টি আমাকে বেশি টাকা দেবে আমি

তার স্বার্থেই কাজ করি। এখন আপনিই বলুন···।'

কুচবিহারী বলল, 'নওশের, ভগবানের দোহাই, এবার তুমি থামো!'

নওশের চুপ করে গেছে। চুপ করে আছে কথাটা বলে কুচবিহারীও। দ্রুত চিন্তা করছে সে। কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বেশ অনেকক্ষণ পর আবার সে কথা বলল, 'কত দাবি এবার তোমার?'

'নিয়মানুযায়ী পাঁচ লাখই চাওয়া উচিত। কিন্তু আপনি আমার পুরানো খদ্দের। চার লাখ দিলেই চলবে।'

'ঠিক আছে। বিকেল চারটেয় মন্দিরে টাকা নিয়ে যাব আমি।'

এতটুকু ইতস্তত না করেই কুচবিহারী টাকা দিতে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু সন্দেহ হলো নওশেরের। কুচবিহারী দেড় লাখ টাকা বেশি দিতে রাজি হয়ে গেল এক কথায়!

'চার লাখ টাকার অর্ধেক দু'লাখ। দু'লাখ টাকাই নিয়ে যাচ্ছেন তো বিকেলে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। দু'লাখই নিয়ে যাব।' বিরক্ত হয়ে জানাল কুচবিহারী। এবং খটাশ করে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

পাঁচ

'এটোটা নির্ডয় হইবেন না, মিস্টার। ফর গড্স্ সেক, মিস্টার অথার, ওনলি টেরো টাকা সেভেন্টি পয়সা! প্লীজ!'

যার উদ্দেশ্যে ডি. কস্টা এত কাকুতি-মিনতি ভরে কথা বলছে, সে লোকটার মন গলল বলে মনে হলো না। ডি. কস্টার 'মিস্টার অথার' লোকটা দেখতে লম্বা চওড়া। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর উপর একটা কালো সার্জের ওয়েস্ট-কোট। কড়া ইস্তিরি দেয়া ধবধবে সাদা পাজামা। মোটা কালো ফ্রেমের চশমা চোখে। টিকালো নাক, তীক্ষ্ণ চেহারা। লোকটার হাতে একটা জ্বলন্ত চুরুট, বেশ অনেকখানি ছাই জমেছে সেটার মাথায়। উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে চেয়েছিল লোকটা। ডি. কস্টার কথা শেষ হতে ধীরে ধীরে চোখ নামাল। বলল, 'কি বলছিলে, ডি. কস্টা?'

চটে গিয়ে ডি. কস্টা মনে মনে বলল, 'রাইটার হয়ে ব্যাটা মাঠা কিনিয়া নিয়াছে! হামার সহিট ফোরটোয়েন্টিগিরি! ডুই বটসর বোকা বানাইয়া রাখিয়াছি, এইবার টোমার টাকাও ঢংস করিব! সর্বস্বাণ্ট করিয়া ছাড়িব, নইলে টোমার লেখা বন্ড হইবে না।'

কিন্তু প্রকাশ্যে ডি. কস্টা বিনয়ের অবতার। বলল, 'মিস্টার অথার, প্লীজ হেল্প মি! আই অ্যাম ইন গ্রেট ডেঞ্জার।'

'কেন, কি হয়েছে তোমার?'

'আমাশয় হইয়াছে। ডারুণ আমাশয়।'

'এই কথা বলেই না পরশু-দিন টাকা নিলে আমার কাছ থেকে?'

'সে টাকা খটম হইয়া গিয়াছে।'

'তারমানে ডাক্তারের কাছে যাওনি সেদিন?'

'ও নো, মাই ডিয়ার অথার। নেটিভ ডক্টরডের হামি রিলাই করিটে পারে না। হামি নিজেই মেডিসিন কিনিয়া খাইয়াছি।'

'কি ওষুধ খেয়েছ?'

'জাস্ট ওয়ান বটল বেংগলী ওয়াইন।'

'বাহ্, বেশ করেছ। সারেনি তাতে?'

'ও নো, আরও বাড়িয়াছে। নাউ আই নিড অ্যানাডার বটল...'

'আমার কাজ আছে, ডি. কস্টা। একটা মীটিং আছে, বেরোতে হবে এখুনি।'

'সে মীটিং আজ হইবে না।'

অবাক হয়ে গেল লোকটা, 'সে কথা তুমি জানলে কি করে? কোথায় মীটিং হবার কথা তুমি জানো?'

'নিশ্চয়। হাপনি ভুলিয়া গিয়াছেন, হামি একজন ওয়ার্লড ফেমাস প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'কোথায় মীটিং বলো দেখি?'

'প্রেস-ক্লাব। সন্ধ্যা সাটটায়।'

'আশ্চর্য! তুমি জানলে কি করে? মীটিং হবে না আজ?'

মাথা নাড়ল ডি. কস্টা, সবজান্তার হাসি হেসে বলল, 'লুক, মিস্টার অথার, আপনার ফাইভ টাকা রিকশা ভাড়া বাঁচাইয়া ডিলাম—সেই সাঠে যাটায়াটের কষ্ট সেভ করিয়া ডিলাম। ডিন, টেরো টাকা সেভেন্টি পয়সা ওনলি।' হাত পাতল ডি. কস্টা।

ডি. কস্টার এই অকাট্য যুক্তি গায়ে মাখল না লোকটা। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। বলল, 'দশটা পয়সা দিতে পারি।'

বিস্ফারিত হয়ে গেল ডি. কস্টার চোখ। 'হোয়াট! হামি আপনার ফাইভ টাকা সেভ করিয়া ডিলাম...'

'না হে! গেলে আমি বাসে যেতাম! এখান থেকে প্রেস-ক্লাবের ভাড়া পঁচিশ পয়সা। এই পঁচিশটা পয়সা তোমাকে দিতে পারতাম, কিন্তু মীটিং হোক বা না হোক বেরোতেই হচ্ছে আমাকে। মীটিং হচ্ছে না জানতে পারায় নেমে পড়ব আমি গুলিস্তানেই। এখান থেকে গুলিস্তানের ভাড়া উনিশ পয়সা। কাজেই ছয় পয়সার উপকার করেছ তুমি আমার। আর কষ্ট বেঁচেছে চার পয়সার। মোট দশ পয়সা। নেবে?'

ডি. কস্টাকে রক্তশূন্য মুখে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পা বাড়াল 'মিস্টার অথার' লোকটা। সংবিৎ ফিরে পেয়ে পিছু নিল ডি. কস্টা। মাছির মত ভ্যানর ভ্যানর শুরু করল লোকটার কানের কাছে। কিন্তু বিরক্ত হয়ে যে কিছু টাকা

ঝেড়ে দিয়ে খালাস পাবে এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না লোকটার মধ্যে। নির্বিকার। এবার প্রশংসায় তুষ্ট করার চেষ্টা করল ডি. কস্টা লোকটাকে, ভাল একটা গল্পের প্লট দেয়ার লোভ দেখাল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল সে। খপ করে ধরল লোকটার পাঞ্জাবীর আস্তিন।

'প্লীজ, মিস্টার রাইটার! প্লীজ, হেল্প মি। নইলে মারা যাইব। হামি ডাই করিলে হাপনি লুযার হইবেন।'

'কি রকম?'

'এ রকম একটা স্ট্রং ক্যারেক্টারের হিরো কোঠায় পাইবেন?'

'তুমি আমার বইয়ের হিরো নাকি?'

লোকটার চক্ষু চড়কগাছ। 'বাহ্, এমন একটা খবর তো জানা ছিল না? কুয়াশা, শহীদ, কামাল, এরা বুঝি সব তোমার পার্শ্ব-চরিত্র?'

'কামালের কঠা বাড ডিন–হি ইজ ডেড, শহীদ–ইন্‌ভ্যালিড, বাকি ঠাকিল কুয়াশা। টাহাকে হিরো বলিটে পারেন, কিম্বা টাহার ফ্রেণ্ড হিসাবে হামাকেও বলিটে পারেন। বাট কঠা সেটা নয়, ওনলি ঠারটিন টাকা সেভেন্টি পাইসা...'

'মদ খাওয়ার জন্যে একটি পয়সাও দেব না আমি তোমাকে! চলি। দেখা হবে আবার।'

হন হন করে হাঁটতে শুরু করল লোকটা। লাভ নেই জেনে দাঁড়িয়ে পড়ল ডি. কস্টা। কটমট করে তাকিয়ে রইল সে লোকটার গমন পথের দিকে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'অল্-রাইট! হামার নাম স্যানন ডি. কস্টা। টোমার রাইটিং হামি বাহির করিটেছি। ফটুর করিয়া ছাড়িয়া ডিব টোমাকে।'

ক্রমে ক্রমে লোকটার বুক পকেটে রাখা মানি ব্যাগটা ভেসে উঠল ডি. কস্টার মানস-চক্ষে। মুচকি হাসি খেলে গেল ঠোঁটের কোণে। অতি সন্তর্পণে অনুসরণ শুরু করল সে।

প্রেস-ক্লাবের দিকে না গিয়ে গুলিস্তান বিল্ডিং এর সামনেই লোকটাকে নামতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ডি. কস্টা। যাক, বেমালুম মিথ্যে কথাটা গিলেছে তাহলে ব্যাটা। নইলে অন্য ফিকির বের করতে হত ওকে প্রেস-ক্লাবে যাওয়া থেকে বিরত করতে। লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছে লোকটা। বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের এই ভিড়ভাড়াক্কার মধ্যে কোন অসুবিধেই হবে না ওর মানি ব্যাগটা বের করে নিতে। দ্রুত পা চালাল ডি. কস্টা।

কাছাকাছি গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ডি. কস্টাকে। ফুটপাথের একটা বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা, বই ঘাঁটছে। নাহ্, পছন্দ হলো না, আবার হাঁটতে শুরু করেছে। এক মিনিটের মধ্যেই লোকটার একেবারে পিঠের কাছে চলে এল ডি. কস্টা। আর পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ সামনে কি যেন দেখে থমকে দাঁড়াল লোকটা। থমকে দাঁড়াল ডি. কস্টাও। হাত বাড়াতে গিয়েছিল, সামলে নিয়ে ছোট একটা লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল

কয়েক পা। সামনের দিকে চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর। যেন ভূত দেখছে সে। বুকে একটা ক্রস চিহ্ন এঁকে আরেক লাফে গিয়ে দাঁড়াল সে লাইট পোস্টের আড়ালে।

রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডি. কস্টার হাঁড়ির তলার মত ফর্সা মুখটা।

বিড় বিড় করে আপন মনে বলছে সে। 'মাই গড! ও মাই গড! এটো পরিশ্রম করিয়া ডুই বটসর যাহা টেকাইয়া রাখিয়াছি সব ভেস্টে গেল আজ! আর রাখা গেল না! ও ক্রিস্ট! সকালে উঠিয়া আয়নায় নিজের মুখটা কেন ডেখিলাম!'

উঁকি দিল ডি. কস্টা লাইট পোস্টের আড়াল থেকে। পর মুহূর্তেই মুখটা আড়ালে টেনে নিল আবার। বিড়বিড় করে বলল, 'গড, সেভ মাই সোউল! আর কোন পঠ নাই। নিজের এটোবড় সর্বনাশ হামি দেখিটে পারিব না।'

চোখ বন্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ডি. কস্টা লাইট পোস্টের আড়ালে।

ঠিক সাত হাত তফাতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ডি. কস্টার 'মিস্টার অথার' লোকটা। তার চার হাত তফাতে এদিকে মুখ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর একজন লোক।

দ্বিতীয় লোকটা কামাল।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা। হঠাৎ আচমকা কামাল লোকটাকে লক্ষ্য করে এবং লোকটা কামালকে লক্ষ্য করে লাফ দিল বিদ্যুৎবেগে। চোখের পলকে দেখা গেল দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে দুহাতে।

বুকে বুক ঠেকিয়ে পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখল ওরা ঝাড়া ষাট সেকেণ্ড। তারপর খানিক দূরে সরে চেয়ে রইল পরস্পরের মুখের দিকে ঝাড়া তিরিশ সেকেণ্ড। দুই জোড়া চোখে অবিশ্বাস। আবার জড়িয়ে ধরল দুজন দুজনকে। পনেরো সেকেণ্ড।

প্রথমে মুখ খুলল কামালই। আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুমি…তুমি…তুমি বেঁচে আছ! অথচ আমি জানি, আমরা সবাই জানি মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছ…'

লোকটা কামালকে ছেড়ে দিলেও কামালের একটা হাত ছাড়েনি। শক্ত করে চেপে ধরে আছে হাতটা, যেন ছেড়ে দিলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে কামাল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কি আশ্চর্য, কামাল! আমিও তো শুনেছি তুমি–তোমরা, মানে, তুমি, মহুয়াদি, লীনা সবাই মারা গেছ মুক্তি যুদ্ধে…'

'অদ্ভুত ব্যাপার! আজ সকালেও তোমার সম্পর্কে কথা হচ্ছিল মহুয়াদির সাথে…'

কামালের দুই কাঁধে হাত রাখল লোকটা। 'সত্যিই অদ্ভুত! তোমাকে আবার জীবিত দেখতে পাচ্ছি এটা যেন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না। গত বছরও মুজিবনগরে গিয়ে তোমাকে স্মৃতিস্তম্ভে ফুলের মালা দিয়ে মোনাজাত করে এসেছি।'

কামাল বলল, 'কিন্তু এমন ব্যাপার ঘটল কি করে বলো তো? তুমি জানো

আমরা মারা গেছি, আমরা জানি তুমি মারা গেছ···এই যে অসম্ভব···আচ্ছা, আমরা মারা গেছি এ খবর তোমাকে দিল কে?'

'আমি মারা গেছি, এ খবরটাই বা তোমরা কার কাছে পেলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা।

কামাল বলল, 'কেন, ডি. কস্টা দিয়েছে খবরটা। স্বাধীনতার পর ঢাকায় ফিরে এলাম, খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলো ডি. কস্টা। কাঁদবার কারণ জিজ্ঞেস করায় আরও জোরে জোরে কাঁদতে লাগল সে। অনেক করে বোঝাবার পর থামল শেষ পর্যন্ত। এবং তোমার মৃত্যু সংবাদ দিল।'

লোকটা উত্তেজিত হয়ে আরও শক্ত করে ধরল কামালের কাঁধ। 'কী সাংঘাতিক! কী সাংঘাতিক! ডি. কস্টা ঠিক একই ভাবে কাঁদতে কাঁদতে আমার বাড়িতেও গিয়েছিল। অনেক চেষ্টায় ওকে থামাই। বহু কষ্টে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ওর কাছ থেকে জানা গেল মুক্তিযুদ্ধের সময় ওর চোখের সামনে মারা গেছ তুমি, মহুয়াদি আর লীনা। ভয়ানক ভাবে আহত হয়ে যদিও শহীদ বেঁচে গেছে, প্রিয়জনের মৃত্যুতে পাথর হয়ে গেছে সে। কারও সাথে দেখা করে না। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে পঁচিশটা টাকা ধার চাইল ব্যাটা। দিয়েছিলাম।'

'বলো কি! আমার কাছ থেকে নিয়েছে পঞ্চাশ টাকা।' কামাল স্তম্ভিত। স্তম্ভিত লোকটাও।

অনেকক্ষণ পর কামাল বলল, 'কিন্তু দোস্ত, ডি. কস্টার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ কি বলো তো?'

'সে কথাই তো ভাববার চেষ্টা করছি।'

কামাল বলল, 'লোকটা হারামীর হাড়। স্রেফ ঠাট্টা করে মজা পাবার জন্যে এই কাণ্ড করেছে। ঠিক আছে ব্যাটাকে পেয়ে নিই একবার সামনে। এমন শিক্ষা দেব যে···'

'কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে যে গত দু'বছরের বেশি আমরা ঢাকায় আছি অথচ তোমার সাথে বা তোমাদের কারও সাথে আমার দেখাই হলো না!'

'হবে কি করে? প্রায় পৌনে দু'বছর বিদেশে কাটিয়ে এলাম তো আমরা। ফিরেছি সাতদিন হলো। শহীদ অবশ্য ফিরেছে প্রায় তিন মাস আগে! ওর সাথে কোথাও দেখা হয়নি তোমার?'

'উঁহুঁ! যাইনি আমি। ডি. কস্টা বলেছিল কারও সাথে দেখা করে না ও আর। শোকে, দুঃখে পাথর হয়ে গেছে।'

কামাল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ডি. কস্টার মরণ ঘনিয়েছে। একবার সামনে পেয়ে নিই, তারপর ওর একদিন কি আমার একদিন।'

লোকটা বলল, 'ইস্, কী ভয়ানক লোক! ঠিক আছে; এর শাস্তি ওর পাওনা

রইল। কিভাবে ওকে শায়েস্তা করতে হয় তা জানা আছে আমার! আমি লোকটাকে হাতে মারব না, মারব কলমে। ওর সম্পর্কে এমন কথা লিখব যে রাস্তায় বের হওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে বাছা ধনের।'

'স্টপ্ ইট! আই সে, স্টপ্ ইট!' আচমকা ডি. কস্টার গলা শোনা গেল।

লাইট পোস্টের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল উত্তেজিত ডি. কস্টা। হাত নেড়ে রীতিমত হুমকি দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'হামাকে হাপনারা চিনটে পারেন নাই! হামার নাম স্যানন ডি. কস্টা। মি. কুয়াশা ইজ মাই বেস্ট ফ্রেণ্ড! হামি কাহাকেও কুছ পরোয়া করি না!'

'এই যে, রাসকেল!' গর্জে উঠল কামাল।

ততোধিক উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ডি. কস্টা, 'ইউ শাট্ আপ্! কিছু বলি না ডেখিয়া হাপনারা হামাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিটে স্টার্ট করিয়া ডিয়াছেন। আই ওয়ার্ন ইউ! সাবঢান করিয়া ডিটেছি, হামার নামে যদি কখনও আজেবাজে কঠা লিখেন টা হইলে হামি উকিলের নোটিস ডিব···।'

কামালের বন্ধু লোকটা এবার কথা বলে উঠল, 'চেঁচিয়ো না, আস্তে কথা বলো। দোষ করেছ আবার গলা ফাটিয়ে যা তা বকছ—লজ্জা করে না তোমার? জবাব দাও, কেন তুমি আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলে।'

'হাপনার লেখা বন্ড করিটে। ওনলি টু স্টপ ইউ মিস্টার অথার। হাপনি হাপনার পুস্টকের মেধ্যে যে ভাবে দেখাইয়াছেন হামি কি সে রকম লোক? হাপনি এমন সব কঠা লিখেন যে রাস্টায় বাহির হইটে পারি না। এভরি পুস্টকে হাপনি হামার সম্পর্কে এমন সব বাজে কঠা লেখেন যে লজ্জায় হামি কারও কাছে মুখ ডেখাইটে পারি না। হাপনারা বাংলাডেশের লিবারেশনের জন্যে ওয়ার করিটে গেলেন। বহুট লোক মরিল, বহুট লোক নিখোঁজ হইল। কিন্তু হাপনারা ঠিকই ঠাকিলেন। অ্যাট দ্যাট টাইম হামার মাঠায় বুডটি আসিল। আশা করিলাম ডেখা না হইলে স্টপ হইবে স্যানন সিরিজ। টাইম লস্ না করিয়া হামি মি. কামালের সাঠে ডেখা করিয়া আপনার ডেথ-নিউজ ডিলাম এবং···। লেট দ্যাট গো, ডিন, পাঁচটা টাকা ডিন।'

কামাল এবং কামালের লেখক বন্ধু দুজনেই অবাক হয়ে একযোগে বলে উঠল, 'কিসের টাকা?'

'উকিলের নোটিস ডিব, তার ফিঁ বাবড পাঁচ টাকা।

কোন রকমে হাসি সংবরণ করল ওরা।

কামাল বলল, 'কচু দেব। যাও, ভাগো।'

'ঠিক হ্যায়। টাকা না ডিবেন নাই ডিবেন। বাট, রিমেম্বার ইট, মিস্টার রাইটার, এরপর যডি কোন বুকে হামার সম্পর্কে খারাপ কোন কঠা লিখিবেন টো মহা মুশকিল বাঢাইয়া ডিব। কেস করিব হামি, রিমেম্বার ইট!'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল কামালের বন্ধুর। সে ডি. কস্টাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কেন আমাদের দুজনকেই এমন খবর দিয়েছিলে তা তো বুঝলাম, কিন্তু

একবারও কি তুমি ভাবনি যে আমাদের সাথে রাস্তা ঘাটে-কখনও দেখা হয়ে যেতে পারে?'

ম্লান কণ্ঠে ডি. কস্টা বলল, 'গত টিন মাস যাবট কি কঠোর পরিশ্রম যে করিয়াছি টাহা আর কি বলিব। সডা সর্বডা চেষ্টা করিয়াছি যাহাটে পরস্পরের সহিট মোলাকাত না হয়।'

'বুঝেছি!' কামাল বলল, 'প্রায়ই তুমি নানা কারণ দেখিয়ে নানা অজুহাত তুলে, বিপদের কথা বলে শহীদকে এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় টেনে নিয়ে গেছ…।'

'ইয়েস, টা করিয়াছি। কারণ ওই রাস্তা ধরিয়া গেলে মিস্টার রাইটারের সাঠে ডেখা হইয়া যাইটে পারিট।'

হঠাৎ প্রশ্ন করল কামালের বন্ধু, 'কামাল, তোমাদের আজ প্রেস-ক্লাবের মীটিং-এ যাওয়ার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল। ওখানেই তো যাচ্ছিলাম। শহীদ নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'বোঝা গেল এবার।'

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল ডি. কস্টা, 'লেট দ্যাট গো, এবার কাজের কঠা হোক। পাঁচটা টাকা ডিবেন কি ডিবেন না? ওনলি দুটো রাস্তা খোলা আছে হাপনাডের সামনে। হয় রাজি হয়ে যান যে হামার নামে খারাপ কিছু লিখবেন না, নয়ট পাঁচটা টাকা ডিন, উকিলের নোটিস ডিব আমি…।'

কামালের বন্ধু জানতে চাইল, 'আমার পিছু পিছু আসছিলে কেন শুনি?'

'পিক-পকেট…থুড়ি, ওসব টো ছাড়িয়া ডিয়াছি, ইউ নো।'

'বাজে কথা। তুমি মদ খাবার জন্যে টাকা চেয়েছিলে। দিইনি বলে আমার পকেট মারার জন্যে পিছু পিছু আসছিলে তাই না?'

কামাল বলে উঠল, 'এ-কথাটা পরবর্তী বইয়ে লিখতে ভুলো না।'

ডি. কস্টা আতঙ্কিত, 'হোয়াট!'

কামালের বন্ধু বলল, 'এ কথা তো লিখতেই হবে। যা সত্যি তা লেখা আমার কর্তব্য।'

ডি. কস্টা কামাল এবং কামালের বন্ধুর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ সে দুই হাত জোড় করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'ফরগিভ মি, মিস্টার অথার! ডোহাই হাপনার, হামার প্রেস্টিজ আর পাংচার করিবেন না। আপনার জন্যে হামি রাস্তায় বাহির হইটে পারি না! হামার মান সম্মান, নাম-ঢাম সব ডুবিয়া যাইটেছে। প্লীজ, ফর গডস্ সেক, হামাকে মাফ করিয়া ডিন। ডেকুন, হামি পকেট-পিকিং ছাড়িয়া ডিয়াছি। হামি মড খাওয়া ছাড়িয়া ডিয়াছি। টবু যডি হাপনি…।'

'মদ খাওয়া ছাড়োনি। মিথ্যে কথা বলাও…'

'বিলিভ মি, সব ছাড়িয়া ডিব। প্লীজ, হামাকে ওনলি একটা চান্স ডিয়া ডেকুন। হামাকে ভাল হইটে হেলপ্ করুন…।'

কামাল বলল, 'সত্যি তুমি মদ খাওয়া আর মিথ্যে কথা বলা ছেড়ে দেবে?'

'আপন গড, ছাড়িয়া ডিব। ওয়ার্ড অফ অনার!'

কামালের বন্ধু বলল, 'বেশ। তোমার সম্পর্কে যা সত্যি নয় তা আর লিখব না।'

'থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু!'

করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল ডি. কস্টা একগাল হেসে। করমর্দনের শেষে হাত পাতল সে ওদের দুজনের সামনে। বিনীতভাবে বলল, 'এই উপলক্ষ্যে, ফর ডা লাস্ট টাইম, হামাকে এক বোটল বেঙ্গলি ওয়াইন পান করিবার অনুমটি ডিন। মড না, অ্যাজ এ মেডিসিন। ইউ নো।'

কামাল এবং কামালের বন্ধু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

হাত বাড়িয়েই রেখেছে ডি. কস্টা, 'ডিন, টেরো টাকা সেভেনটি পয়সা পকেট হইটে বাহির করুন। একজনের নিকট হইটে নিলে বড় বেশি টর্চার হইয়া যায়, ডুইজনে ভাগাভাগি করিয়া ডিন। এক-একজনের ভাগে পড়িবে সিক্স টাকা এইট্টি ফাইভ পয়সা ওনলি। ডিন।'

ছয়

পরদিন এক চিমটি নস্যি নাকে ফেলে স্ট্যাণ্ড থেকে টুপিটা তুলে মাথায় পরে বেরিয়ে এল ডি. কস্টা আস্তানার বাইরে। গ্যারেজ থেকে ছোট অস্টিনটা নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। কুয়াশা ওকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে কুচবিহারীর বাড়ির ওপর নজর রাখতে। আধমাইলের মধ্যেই কুচবিহারীর প্রকাণ্ড বাড়ি। মুখোমুখি রাস্তার ওপারের বাড়িটা আণ্ডার কনস্ট্রাকশন। কুচবিহারীর বাড়ির প্রাচীর প্রায় দু'মানুষ সমান উঁচু। বাইরে থেকে ভিতরের কিছু দেখার উপায় নেই। কিন্তু বিপরীত বাড়িটা একতলা। ছাদে ওঠার সিঁড়ি এখনও তৈরি হয়নি। বাড়িটার নির্মাণ কাজ আপাতত স্থগিত আছে। কারণ সিমেন্টের দাম কালোবাজারে একশো টাকা, তাও পাওয়া যায় না। ডি. কস্টা তার ছোট অস্টিনটা নিয়ে এই আপাতত পরিত্যক্ত বাড়ির ভিতর ঢুকল বেলা আড়াইটার সময়।

বাড়িটার উঠানে গাড়ি রেখে একটা কামরার ভিতর ঢুকল ডি. কস্টা। গত চার-পাঁচ দিন ধরে দুপুরের পর থেকে এই কামরায় বসে বসে রাস্তার অপর পারে কুচবিহারীর বাড়ির ওপর নজর রাখছে সে কুশায়ার নির্দেশে। কুচবিহারীর গতিবিধির উপর নজর রাখাই তার প্রধান কর্তব্য। কুচবিহারীর সাথে যারা দেখা করতে আসে তাদের চেহারা মনে রাখারও নির্দেশ আছে।

বেলা ঠিক তিনটের সময় একটা ফোর্ড গাড়ি কুচবিহারীর বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

জানালা দিয়ে গাড়িটাকে দেখেই রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল ডি. কস্টা। কারণ

আছে। এই গাড়িটাকে গত তিন দিন থেকে রোজ বেলা তিনটের সময় কুচবিহারীর বাড়িতে ঢুকতে দেখছে সে। গাড়িটার ড্রাইভিং সীটে বসে আছে বিশালদেহী এক বার্মীজ।

হর্ন শুনে কুচবিহারীর দারোয়ান খুলে দিল দরজা। গাড়িটা গেট পেরিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকতে দারোয়ান বন্ধ করে দিল দরজা। ডি. কস্টার চোখের আড়ালে পড়ে গেল গাড়িটা।

এদিকে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে থামল ফোর্ড। বার্মীজ লোকটা ধীরেসুস্থে নামল গাড়ি থেকে। দারোয়ান বিনয়ের সাথে বলল, 'আসুন, হুজুর!'

দারোয়ানের পিছু পিছু চলল বার্মীজ দৈত্য। লোকটার বেশভূষা, মুখাবয়ব, হাঁটার এবং তাকাবার ভাবভঙ্গি দেখে সন্দেহ থাকে না যে ব্যক্তিত্ব, মান-সম্মান এবং অর্থ সবই তার বিপুল পরিমাণে আছে। চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই দামী চুরুটের সুগন্ধে।

দারোয়ানের পিছু পিছু চুরুটের নীল ধোঁয়া উড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রাশভারী বার্মীজ লোকটা বাড়ির ভিতর। তার ফোর্ড দাঁড়িয়ে রইল গাড়ি বারান্দায়।

উঠানে বা গাড়ি বারান্দার আশপাশে কেউ এখন নেই। গাড়িটার পিছনের বনেটটা আস্তে আস্তে ভিতর থেকে কেউ তুলছে উপর দিকে। খানিক পরই দেখা গেল-বনেটটা বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে, ভিতর থেকে মাথা বের করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে একটি যুবক। যুবকটি রাসেল ভিন্ন আর কেউ নয়। রাসেল বার্মীজ লোকটাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা।

আস্তে আস্তে গাড়ির পিছনের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল রাসেল।

এদিকে ডি. কস্টা অস্থির হয়ে উঠেছে। বার্মীজ লোকটার পরিচয় জানা দরকার। জানা দরকার কুচবিহারীর কাছে রোজ বেলা তিনটের সময় কেন সে আসে। কি সম্পর্ক তার কুচবিহারীর সাথে। কুচবিহারীর সাথে লোকটা কি বিষয়ে আলাপ করে তা শোনার কৌতূহল হচ্ছে তার। কিন্তু কুয়াশার নির্দেশ সে যেন কুচবিহারীর বাড়ির ভিতর প্রবেশ না করে। ডি. কস্টা সিদ্ধান্ত নিল আজ সে বার্মীজ লোকটাকে অনুসরণ করবে।

কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার পর মুহূর্তেই দেখা গেল কুচবিহারীর বাড়ির গেট খুলে যাচ্ছে। গেটটা খোলা হতেই হুস্ করে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফোর্ড গাড়িটা। ডি. কস্টা কামরা থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়িটার দিকে ছুটল। ফোর্ড ততক্ষণ সবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার শেষ মাথায় মোড় নিয়ে। আজ এত তাড়াতাড়ি যে বার্মীজ লোকটা চলে যাবে তা ডি. কস্টা ভাবতেই পারেনি। অনুসরণ করার সাধ বুঝি অপূর্ণই থেকে যায়। কিন্তু সহজে হাল ছাড়বার বান্দা নয় সে। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল দ্রুত। হুস্ করে বেরিয়ে এল অস্টিন রাস্তায়। রাস্তার বাঁ দিক থেকে একটা ওপেল রেকর্ড আসছিল, সবেগে ডি. কস্টার অস্টিন ওপেলের হেডলাইটের পাশে, একেবারে কিনারায় গিয়ে ধাক্কা মারল। প্রচণ্ড শব্দ হলো। কিন্তু ব্রেক কষে গাড়ি

থামাবার কথা চিন্তাও করল না ডি. কস্টা। দুটো গাড়িরই শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে ওপেল। চালক গাড়ি থেকে নামতে নামতে গালাগালি দিচ্ছে অদৃশ্যমান অস্টিনের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু পিছন ফিরে একবার তাকালও না ডি. কস্টা।

মোড় নিতে গিয়ে আবার দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসল ডি. কস্টা। মোড়ের মাথায় লাল সিগন্যাল দেখেও গাড়ি থামায়নি সে। সামনে রাস্তার ঠিক মাঝখানে, একটা রিকশা দেখে সেটাকে কাটাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু রিকশার সামনের চাকার সাথে অস্টিনের মৃদু ছোঁয়া লেগে গেল। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে ধাবিত অস্টিনের ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল রিকশাটা। রিকশার দুই আরোহী রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি খেলেও একমুহূর্ত পরই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা দাড়ি নেড়ে খিস্তি শুরু করল। ডি. কস্টা ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখে মৃদু একটু হাসল শুধু।

মিনিট পাঁচেক ধরে রাস্তার পথিক, গাড়ির চালক, ট্রাফিক পুলিসদেরকে নাস্তানাবুদ করে ডি. কস্টা শেষ পর্যন্ত দেখা পেল বার্মীজ লোকটার ফোর্ডের। কিন্তু তখনও সেটা বহুদূরে। ডি. কস্টা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল আরও। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন, তারপর ষাটের ঘরে গিয়ে কাঁপতে লাগল স্পীড মিটারের কাঁটা। কাঁপছে ডি. কস্টার দুটো হাতও। সবচেয়ে বেশি কাঁপছে তার বুক।

রাস্তায় যানবাহনের অভাব নেই। যে-কোন মুহূর্তে আত্মঘাতি একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে। ষাট মাইল স্পীডে ধাবিত গাড়ির সাথে মুখোমুখি কোন বাস বা ট্রাকের যদি সংঘর্ষ হয়···। আর ভাবতে পারল না ডি. কস্টা। হঠাৎ হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার। জীবনে এত জোরে গাড়ি চালায়নি সে। মাথায় শয়তান ভর করেছিল বুঝি তাই স্পীড বাড়াতে বাড়াতে ষাটে পৌঁছে গেছে। গাড়ির দুপাশের বাড়ি-ঘর-দোকান-পাট তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে পিছনে।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল ডি. কস্টা।

স্পীড কমাবার সাহসও নেই এখন তার। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার চোখ মেলল সে। দেখল সামনেই বার্মীজ লোকটার ফোর্ড। ব্রেক করার কথা মনে হলো। এমন সময় টিং করে মিষ্টি একটা বেল বেজে উঠল।

চোখের পলকে ফোর্ডকে পাশ কাটিয়ে গেল অস্টিন। ডি. কস্টার হঠাৎ মনে পড়ল ফোর্ডকে অনুসরণ করার কথা তার। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে ফোর্ডই তাকে অনুসরণ করছে বলা যায়।

স্পীড কমাল এবার ডি. কস্টা। পকেট থেকে বের করল ক্ষুদ্র আকারের একটি মিনি ওয়্যারলেস সেট। সুইচ অন করতেই ভেসে এল বেতারে পরিষ্কার বাংলা কথাঃ 'আমাকে অনুসরণ করে কোন লাভ নেই, মি. স্যানন ডি. কস্টা!'

খুবই পরিচিত কণ্ঠস্বর। সুইচ অফ করে দিতে দিতে ব্রেক কষল ডি. কস্টা গাড়ির। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

গাড়িটা থামছে। ফোর্ড পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল এবার।

সাত

কলেজ বন্ধ সুলতার। সেজন্যে পড়াশোনাতেও মন বসছে না তার। খেয়েদেয়ে ঘুমাবার জন্যে শুয়েছিল সে। তন্দ্রা মত এসেওছিল। কিন্তু আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থায় সে একটা স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে দেখল উজান তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সুপুরুষ, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান উজান। স্বভাব-সুলভ মৃদু হাসিটি লেগেই আছে মুখে। চশমাটার কাঁচ ভেদ করে দেখা যাচ্ছে শান্ত সরল দুটো চোখ।

উজান চৌধুরীকে স্বপ্নে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল সুলতা খাটের উপর। হঠাৎ উজানকে স্বপ্নে দেখল কেন সে? জেগে জেগে উজানকে কল্পনা করা, কল্পনায় দেখা সে তো অন্য ব্যাপার। রোজই ওকে কল্পনায় দেখে সুলতা। কিন্তু স্বপ্নের ভিতর আজ এই প্রথম দেখল সে।

চঞ্চল হয়ে উঠল সুলতার মন। কি করছে এখন উজান? ওরও তো ভার্সিটি বন্ধ। নিশ্চয়ই বাড়িতে আছে। ফোন করে দেখলে কেমন হয়?

পা টিপে টিপে নিচে নেমে এল সুলতা তিনতলা থেকে। ড্রয়িংরুমে কেউ নেই দেখে ফোনের সামনে দাঁড়াল সে।

ডায়াল করতেই পাওয়া গেল উজানকে। সুলতার গলা চিনতে পেরেই সে বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য! আমিও যে তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। কেমন আছো, সুলতা? কি করছিলে?'

সুলতা সকৌতুকে বলল, 'তুমিও কি আমার মত স্বপ্ন দেখে ফোন করতে যাচ্ছিলে আমাকে?'

'তার মানে?'

সুলতা বলল, 'তোমাকে স্বপ্নে দেখে স্থির থাকতে পারছিলাম না। যাকগে, কি করছ?'

'কিছু না। পড়াতেও মন বসছে না। ভাবছিলাম...'

সুলতা চাপা গলায় বলল, 'চলে এসো না আমাদের বাড়িতে! সাবধানে। বাবা যেন টের না পান। পিছনের দরজা দিয়ে সোজা লোহার সিঁড়ি বেয়ে চলে এসো সেদিনের মত। আমি আমার কামরায় আছি। দরজা ভেজানো থাকবে। টোকা দেবার দরকার নেই। সোজা ঢুকে পড়বে। আসছ তো?'

'আসব? ধরা পড়ে যাব না তো?'

সুলতা বলল, 'কেন, ধরা পড়বে কেন? বাবা বাড়ির পিছন দিকে ভুলেও যান না।'

'চাকর বাকররা?'

'ওরাও যায় না ওদিকে। ওরা দেখলে ক্ষতিও নেই তেমন। আমার কথায় ওঠে-বসে ওরা। মানা করলে বাবাকে জানাবে না। দশ মিনিট সময় দিলাম, চলে এসো। আমের আচার খাওয়াব।'

'ঠিক আছে। আসছি। কিন্তু, সুলতা, তোমার আচারের লোভে যাচ্ছি বটে—তবে, কেন যেন বড় ভয় করছে আজ।'

'তোমার সব কিছুতেই শুধু ভয়। এত ভয় করলে চলবে কি করে বলো তো? বাবাকে প্রস্তাব দেবার সময়ও যদি বলো যে ভয় করছে তাহলে আমাদের বিয়েই হবে না। সুতরাং ভয়টাকে তাড়াতে চেষ্টা করো।'

'ঠিক হ্যায়, ভয়ের নিকুচি করেগা আভি সে!' বলে উঠল উজান রসিকতা করে। খিল খিল করে হেসে উঠেই থেমে গেল সুলতা। চকিতে দরজার দিকে তাকাল। ছিঃ, ছিঃ, একি করল সে! বাবা হয়তো শুনে ফেলেছেন তার হাসি। শুনে থাকলে কি ভাবছেন ভগবান জানেন।

ঠিক দশ মিনিট পরই সুলতাদের বাড়ির পিছনের দরজায় দেখা গেল উজান চৌধুরীকে। দরজা খোলাই ছিল। সুলতা ফোন করে উপরে উঠে যাবার আগে দরজাটা খুলে দিয়ে গিয়েছিল।

তিন তলায় নিজের রুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সুলতা দেখল উজান বাড়ির ভিতর ঢুকছে। মুখ তুলে উপর দিকে তাকাতেই সুলতাকে দেখতে পেল উজান। মৃদু মৃদু হাসছে সুলতা। মনে একটু সাহস পেল উজান। কেন যেন বড় ভয় করছে আজ তার। ছোট বাগানটা পেরিয়ে উঁচু বারান্দায় উঠল উজান। বারান্দার শেষ মাথায় লোহার সিঁড়ি। সুলতা এখন দেখতে পাচ্ছে না আর উজানকে।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে সুলতা ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়াল। কেন যেন তারও বুকটা কাঁপছে আজ মৃদু মৃদু। উজান ধরা পড়ে যাবে না তো? বাবা জানতে পারলে লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকবে না। মুখ দেখাবে কি করে সে বাবাকে?

ভুরু কুঁচকে ওঠে সুলতার। ব্যাপার কি? সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে কতক্ষণ লাগে? করছে কি উজান? চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সুলতা। বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে তার। আরও দু মিনিট কেটে যায়। চঞ্চল হয়ে ওঠে সুলতা। সন্তর্পণে দরজাটা খুলে বারান্দার দিকে তাকায়। কেউ নেই। তিন তলায় ওঠেনি উজান। আশ্চর্য! করছে কি উজান নিচে এখনও? হঠাৎ কথাটা মনে হলো, উজান ধরা পড়ে যায়নি তো বাবার হাতে? ভয়ে শুকিয়ে গেল সুলতার মুখ। সর্বনাশ! নিশ্চয়ই উজান ধরা পড়েছে।

সুলতার ইচ্ছা হলো এক ছুটে নিচে গিয়ে উজানকে উদ্ধার করে সে বাবার কাছ থেকে। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলবে, বাবা, উজানকে দোষ দিয়ো না। ওর কোন দোষ নেই। দোষ আমার! শাস্তি যা দেবার আমাকে দাও!—কিন্তু ইচ্ছা হলেও সুলতার পা উঠল না। দরজা ভিজিয়ে দিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল সে আবার। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তার। বাবা হয়তো এখুনি ডেকে পাঠাবে তাকে, অনুমান করল সে। জিজ্ঞেস করবে উজান কেন তার কাছে চুপি চুপি আসে। কি

উত্তর দেবে সে?

কিন্তু সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ আসছে না সুলতাকে ডাকতে। উজানও আসছে না। নিচে থেকে চিৎকারের শব্দ শোনা যাবে আশা করে কান পেতেও ব্যর্থ হলো সুলতা। বাবা নিশ্চয়ই গাল মন্দ করেছেন উজানকে। কিন্তু বাবার গলা উপর অবধি আসছে না।

রুমের ভিতর একা ছটফট করতে লাগল সুলতা। একবার দরজা খুলে বারান্দা দেখছে সে, আর একবার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির পেছনের বাগানটার দিকে তাকাচ্ছে। উজান উপরেও উঠে আসেনি। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও দেখেনি তাকে সুলতা। কেটে গেল দেখতে দেখতে পনেরো-বিশ মিনিট। এমন সময় বাড়ির সামনের দিক থেকে ভেসে এল গাড়ির হর্নের শব্দ।

নিজের রুম থেকে বেরিয়ে বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির অপর দিকে এসে সুলতা দেখল হনুমানজী বাড়ির গেট খুলে দিচ্ছে। গেট খোলা হতে বাড়ির ভিতর ঢুকল একটা গাড়ি। গাড়িটা দেখে সুলতার বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। চেনা গাড়ি। উজানের বাবার।

উজানের বাবা কেন এসেছেন এসময়? সুলতা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল বারান্দার রেলিং ধরে। তবে কি বাবা উজানকে ধরার পর ফোন করে ওর বাবাকে খবর দিয়ে আনালেন? গাড়ি বারান্দার দিকে চলে গেল সাদা ফোক্সওয়াগেন। দেখতে পাচ্ছে না এখন আর সুলতা।

মিনিট দুয়েক পরই সুলতা দেখল ওদের টয়োটা গাড়িটা গেট পেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির ভিতর কে কে রয়েছে দেখতে পেল না সুলতা। হনুমানজী বন্ধ করে দিল গেট।

আস্তে আস্তে নিচে নামল সুলতা। হলরুমে দেখা হলো হনুমানজীর সাথে। সুলতার প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, মিজান চৌধুরী এবং সুলতার বাবা এইমাত্র গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। উজান সম্পর্কিত কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারল না সে। উজানকে সে দেখেইনি বাড়িতে।

সুলতা নিজে খোঁজ করল উজানের। কিন্তু কোন রুমেই সে পেল না উজানকে। অথচ হনুমানজী ভগবানের নামে শপথ করে বারবার বলতে লাগল কুচবিহারী এবং মিজান চৌধুরী ছাড়া গাড়িতে আর কেউ চড়েনি।

সুলতা ঘটনার রহস্যটা কোনমতেই আবিষ্কার করতে পারল না। উজানকে সে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে কিন্তু বেরিয়ে যেতে দেখেনি। তবে কি উজান সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে?

উজান সামনের গেট দিয়ে, তার অগোচরে, চলে গেছে ধরে নিল সুলতা। কিন্তু মনটা তার সর্বক্ষণ খুঁত খুঁত করতে লাগল।

গাড়ি চালাচ্ছে কুচবিহারী স্বয়ং। পাশে বসে আছে ডা. মিজান। চেহারায় তার ফুটে

উঠেছে দুশ্চিন্তার ছাপ। বারবার কুচবিহারীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে সে. তার মুখের ভাব দেখে মনের খবর পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কুচবিহারীর অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ দেখে কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না সে। খানিক পর আবার সে প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না, বিহারী সাহেব। দিনের বেলা মন্দিরে যাচ্ছেন, কই, আগে তো কোনদিন দিনের বেলা···!'

ঘনঘন হাতঘড়ি দেখছে কুচবিহারী। গাড়ি চালাতে চালাতে সামনের দিকে তাকিয়ে ভারী, থমথমে গলায় সে বলল, 'সব বলব, ডাক্তার। ব্যস্ত হবেন না। বিশেষ দরকার পড়েছে বলেই আপনাকে আজ দিনের বেলা মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। তবে, ভয় পাবেন না। আপনার ভয়ের কিছু নেই।'

নিষেধ করলে কি হবে, ডা. মিজান ইতিমধ্যেই ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছে।

'পুলিস টের পেয়ে গেছে নাকি···?'

কুচবিহারী ডা. মিজানের কথা যেন শুনতেই পায়নি। যেমন গাড়ি চালাচ্ছিল তেমনি চালাতে লাগল সে।

বক্সনগরে পৌঁছে রাস্তার শেষ মাথায় টয়োটা দাঁড় করাল কুচবিহারী। অভ্যাসবশত ভিউ মিররে তাকাল একবার। তারপর তাকাল ডা. মিজানের দিকে।

ঢোক গিলল ডা. মিজান, 'কিছু বলবেন এবার?'

কুচবিহারী বলল, 'হ্যাঁ। মন দিয়ে শুনুন। যে-কাজ আমি করতে যাচ্ছি তাতে আপনার কোন বিপদের ভয় নেই। কিন্তু কাজটা করতে হলে আপনার সাহায্য আমার একান্ত দরকার।'

'কি করতে চান আপনি, বিহারী সাহেব?' ডা. মিজানের গলায় আতঙ্ক।

'ঘাবড়াবেন না। বলছি তো, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। যা করব তার সব দায়িত্ব আমার। আপনি শুধু আমাকে একটি ব্যাপারে সাহায্য করবেন।'

'কি ব্যাপারে···'

কুচবিহারী বলল, 'সে-কথা পরে জানাব। আপনি সাহায্য করতে রাজি কিনা বলুন।'

ডা. মিজান তাকিয়ে রইল কুচবিহারীর দিকে। খানিক পর সে বলল, 'জীবনে অনেক পাপ করেছি, বিহারী সাহেব। পাপের বোঝা আমি আর বাড়াতে চাই না। আমাকে আপনি মুক্তি দিন। এ কথা বহুদিন থেকেই বলছি আমি···।'

'মুক্তি দেব। কিন্তু তার আগে একটি কাজ করতে হবে আপনাকে। এটাই শেষ। আর আপনাকে কোনদিন ডাকব না।'

ডা. মিজানকে ইতস্তত করতে দেখা গেল।

কুচবিহারী বিরক্ত হয়ে উঠল, 'কি হলো, চুপ করে আছেন যে? রাজি?

ডা. মিজান বলল, 'কাজটা কি না জানলে···'

'সে কথা এখন বলা যাবে না।'

'তাহলে যখন বলবেন তখনই আমি জানাব আপনাকে সাহায্য করতে পারব কিনা,' বেশ জোরের সাথেই বলল ডাক্তার।

কুচবিহারীর ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল। পরমুহূর্তেই মিলিয়ে গেল সেটা। শার্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়া ছোট্ট একটা প্যাকেট বের করল সে। প্যাকেটটা খুলতেই আশ্চর্য একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল।

ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল ডা. মিজান, 'একি! কার আঙুল এটা!'

কুচবিহারী হাসছে, 'দেখুন না, কার-আঙুল আপনার তো চিনতে না পারার কথা নয়। আঙুলটার গায়ে এই আংটিটা আপনারই। তুলে নিয়ে দেখুন, চিনতে পারবেন।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে আঙুলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ডা. মিজানের, বেসুরো গলায় সে বলে উঠল, 'উজানের…!'

'ভয় নেই, মিজান সাহেব। ছেলে আপনার বেঁচেই আছে। একটা আঙুল কেটে নিলে কি আর কেউ মরে? যাকগে, শেষ পর্যন্ত তাহলে আঙুলটা চিনতে পেরেছেন। ভাল, খুব ভাল। তা, এবার বলুন রাজি তো? আমাকে সাহায্য করছেন নিশ্চয়ই?'

দিশেহারা হয়ে পড়েছে ডা. মিজান। ছেলের জন্যে আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার সর্বশরীর, 'বিহারী সাহেব, দোহাই আপনার, কোথায় রেখেছেন আমার উজানকে বলুন!'

ধমকে উঠল কুচবিহারী, 'নাটক করবেন না, ডাক্তার। নাটুকেপনা আমি পছন্দ করি না। বারবার বলছি, আমাকে সাহায্য করবেন কিনা বলুন। আমার কথা মত কাজ করলে আপনার বা আপনার ছেলের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমার কথা না শুনলে ছেলের মুখ এ জীবনে আর দেখতে পাবেন না। আপনার ছেলে বেঁচেই আছে। কিন্তু এরপর বেঁচে থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করে আপনার সিদ্ধান্তের উপর।'

'আমি রাজি, বিহারী সাহেব, আমি আপনার কথা মত কাজ করব। কিন্তু আমার ছেলের যেন… ।'

ডা. মিজান শেষ দিকের কথাগুলো বলতে পারল না, কান্না এসে তার গলা রুদ্ধ করে দিল।

চাপা গলায় হুঁঃ হুঁঃ করে হেসে উঠল কুচবিহারী। হাসি থামতে সে বলল, 'মেয়ে মানুষের মত করবেন না, ডাক্তার সাহেব। ভয়ের কিছু নেই আপনাদের। শুনুন, কয়েকটা কথা বলে নিই। মন্দিরে একজন লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'কে!' শঙ্কিত চোখে তাকাল ডা. মিজান।

কুচবিহারীর দু'চোখে ফুটে উঠল প্রতিহিংসার আগুন। সে বলল, 'আপনি তাকে চিনবেন না। চিনবার দরকারও নেই। যা বলছিলাম। আপনি এই গাড়িতে অপেক্ষা করুন। আমি একা যাব মন্দিরে। ঠিক পনেরো মিনিট পর আপনি এখান থেকে মন্দিরের দিকে পা বাড়াবেন। তার আগে নয়। বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

ডা. মিজান চৌধুরী মাথা নেড়ে বলল, 'পারছি। কিন্তু কে অপেক্ষা করছে…?'

'সে কথা জেনে আপনার কোন লাভ নেই। আর একটা কথা। আমি চলে গেলে পালাবার কথা ভাববেন না ভুলেও। পালিয়ে গেলে নিজের সর্বনাশ নিজে করবেন। জানেন তো, আমাদের ব্যবসার কাজে আপনিও সাহায্য করেছেন এতদিন। পুলিসকে যদি আমার কথা বলেন তাহলে আমিও আপনার কথা বলব। ফেঁসে যাবেন। কমপক্ষে চোদ্দ বছরের জেল হবে আপনার...।'

'না না! আমি পালাব না!'

কুচবিহারী বলল, 'না পালালেই ভাল। পালালে ছেলেটাকেও চিরকালের জন্যে হারাবেন। আচ্ছা চলি। ঠিক পনেরো মিনিট পর রওনা দেবেন এখান থেকে। গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল কুচবিহারী। তার হাতে একটা অ্যাটাচী কেস।

মন্দিরের সামনে এসে হাতঘড়ির কাঁটা দেখে কুচবিহারী একটু চিন্তিত হলো। চারটে বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে। দশ মিনিট দেরিই হয়েছে তার পৌঁছুতে। কিন্তু নওশের আবদুল্লা এখনও পৌঁছায়নি কেন বুঝতে পারল না সে।

নওশের আবদুল্লা পৌঁছুলে দোতলার বারান্দায় দেখা যেত তাকে। কিন্তু দোতলার বারান্দায় কেউ নেই। নওশেরের আবার হলো কি? ব্যাটা টের পেয়ে গেছে নাকি তার মনের কথা? তাই আসেনি?

মন্দিরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাল কুচবিহারী। না, কোথাও নেই নওশের। উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল সে। একটা কালো বিড়াল হঠাৎ লাফ দিয়ে নেমে গেল বারান্দা থেকে। চমকে উঠল কুচবিহারী। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিড়ালটা একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকিয়ে আছে তারই দিকে। কেন যেন গা'টা ছমছম করতে লাগল কুচবিহারীর। নওশের কি লুকিয়ে আছে কোথাও?

ধীর পায়ে খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে যায় কুচবিহারী। কেন যেন পা উঠতে চাইছে না।

খোলা দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে কালী মূর্তিটা। পরমুহূর্তে কুচবিহারী সাপ দেখার মত লাফিয়ে পিছিয়ে আসে সবেগে।

কালীমূর্তির পায়ের সামনে পড়ে রয়েছে নওশের আবদুল্লা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে কামরার মেঝে। নওশের তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। তার চোখ দুটো স্থির হয়ে গেছে চিরকালের জন্যে। মেঝের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। বেশ খানিক আগেই খুন হয়েছে নওশের আবদুল্লা।

আট

হনুমানজীর কাছ থেকে কথাগুলো শুনে সুলতা ধরে নিল যে উজান সামনের গেট দিয়ে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল বলে সে ক'মিনিট পরই ফোন করল উজানদের বাড়িতে। উজানের বোন উজালা ফোন ধরল। সুলতার সাড়া পেয়েই রসিকতা করল সে, 'কেমন আছেন, ভাবী?'

উজানের সাথে সুলতার মন দেয়া-নেয়ার ঘটনাটা জানে উজ্জালা প্রথম থেকেই। সকলের অগোচরে উজ্জালা সুলতাকে 'ভাবী' বলেই ডাকে ঠাট্টা করে। সুলতা লজ্জায় মরে যায়। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও উজ্জালাকে সে শাসন করতে পারেনি।

অন্য দিন হলে সুলতা কৃত্রিম গাম্ভীর্য দেখিয়ে উজ্জালাকে শাসন করার চেষ্টা করত। কিন্তু আজ সে শুকনো গলায় জানতে চাইল, 'উজ্জালা, তোমার দাদা কি বাড়িতে?'

'দাদা বাড়িতে?' অবাক কণ্ঠে আবার বলল উজ্জালা, 'অনেকক্ষণ হলো দাদা আপনাদের বাড়িতে গেছেন। অনেক আগেই তো পৌঁছে যাবার কথা!'

সুলতা কি বলবে ভেবে পেল না।

'ব্যাপার কি, ভাবী? ঝগড়া করে চলে এসেছে বুঝি দাদা?' উজ্জালার গলায় উৎকণ্ঠা।

সুলতা কি ভেবে মিথ্যে কথাই বলল, 'আরে না। তোমার দাদা আসেননি বলেই তোমাকে ফোন করছি। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বলছ অনেকক্ষণ আগে, গেল কোথায়?'

খানিকক্ষণ আলাপ করে উজান বাসায় ফিরলে সাথে সাথেই যেন ফোন করে সে নির্দেশ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিল সুলতা। সোজা উপরের কামরায় উঠে গেল সে। গোটা ব্যাপারটা ভাবতে লাগল নতুন করে আবার।

সন্ধ্যার সময় ফোন এল। ফোন করেছে উজ্জালা। সুলতা জানতে পারল উজান বাড়ি ফেরেনি। উজ্জালার প্রশ্নের উত্তরে সুলতা জানাল তাদের বাড়িতেও উজান আসেনি। দুজনেই বেশ চিন্তিত হয়ে উঠল। সুলতার দুশ্চিন্তা অবশ্য খুবই বেশি।

ক্রমে রাত হলো। রাত গভীর হলো। হনুমানজী খবর দিল সুলতাকে কুচবিহারী বাড়ি ফেরেননি তখনও। বাবার জন্যেও দুশ্চিন্তার সূচনা হলো সুলতার মনে। রাত বারোটার সময় সে আবার ফোন করল উজানদের বাড়িতে। উজ্জালা জানাল তার দাদা উজান এবং বাবা এখনও বাড়ি ফিরছেন না বলে তার আম্মা ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। সুলতা বলল, 'আমরাও খুবই চিন্তিত। তোমার দাদা বাড়ি ফেরা মাত্র আমাকে যেন ফোন করে। আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

কিন্তু সারারাত কেটে গেল। ফোন এল না।

কুচবিহারীও বাড়ি ফেরেননি।

সকালে আবার ফোন করল সুলতা। উজ্জালা জানাল তার বাবা, দাদা কেউই গতরাতে বাড়ি ফেরেননি। ইতিমধ্যে তারা থানায়, হাসপাতালে খোঁজ খবর নিয়েছে। কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সকাল ন'টায় সুলতা ফোন করল আজমল রব্বানীর বাড়িতে। কুচবিহারী বাড়ি ফেরেনি শুনে আজমল রব্বানী ভারি চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'এ কি বলছ, মা তুমি! তোমার বাবা তো রাতে বাইরে থাকার মত মানুষ নন। নিশ্চয়ই কোন বিপদে

পড়েছেন তিনি। তুমি চিন্তা কোরো না, মা। আমি এখুনি আসছি।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে আজমল রব্বানী তার যুবক ছেলে আকরমকে নিয়ে সুলতাদের বাড়িতে এসে পৌঁছুল। সুলতার চোখে পানি। আজমল রব্বানী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'দেখো দেখি আমার পাগলী মা'র কাণ্ড! আরে, মানুষের বিপদ-আপদ কি ঘটে না? এত অল্পে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন, মা? বিহারী সাহেব ছোট ছেলে নন যে হারিয়ে যাবেন। হয় তিনি কোন জরুরী কাজে আটকা পড়ে গেছেন, নয়তো ছোটখাটো কোন বিপদে পড়েছেন। খবর পেতে কতক্ষণই বা লাগবে? দাঁড়াও, আগে থানায় খবরটা পৌঁছে দিই। আকরম।'

আকরম সুলতার দিকে তাকিয়ে বসেছিল একটা সোফায়। বাবার দিকে তাকিয়ে বসেই রইল সে। আজমল রব্বানী তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'পুতুলের মত বসে আছ যে? সুলতার মন খারাপ, বুঝতে পারছ না? যাও, ওকে নিয়ে ওপরের ঘরে গিয়ে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করো।'

আজমল রব্বানী তাকাল এবার সুলতার দিকে, গলার স্বর কোমল করে বলল, 'যাও মা, আকমলের সাথে গল্প করোগে। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমার বাবার খবর পেয়ে যাব। তেমন যদি কিছু, আল্লা না করুন, না ঘটে থাকে তাহলে আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি নিজেই ফিরে আসবেন...।'

সুলতা বলল, 'বাবা গতকাল সাড়ে তিনটের দিকে বেরিয়েছেন। সঙ্গে বাবার একজন বন্ধুও ছিলেন।'

আজমল রব্বানী বলল, 'বন্ধু?'

সুলতা বলল, 'হ্যাঁ। ডা. মিজান চৌধুরী। মিজান সাহেব নিজের গাড়ি নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু বাবার গাড়ি নিয়ে ওঁরা দুজন বেরিয়ে যান। মিজান সাহেবের গাড়িটা আমাদের বাড়িতেই রয়ে গেছে।'

আজমল রব্বানী জানতে চাইল, 'তা মিজান সাহেবের বাড়ির ফোন...।'

সুলতা বলল, 'ফোন করেছিলাম আমি। মিজান সাহেবও গতরাতে বাড়ি ফেরেননি। তাঁর ছেলে উজান চৌধুরীও ফেরেননি বাড়িতে।'

চিন্তিত দেখাল আজমল রব্বানীকে।

আকরম মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুলতার দিকে। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'সুলতা, চলো আমরা উপরে যাই।'

সুলতা তাকাল আকরমের দিকে। কেন যেন গা-টা জ্বালা করে উঠল তার। আকরমকে দু'চোখে দেখতে পারে না সুলতা। চেহারা দেখেই কেন যেন সুলতার মনে হয় আকরমের চরিত্র ভাল না, প্রয়োজন হলে অনেক নিচে নামতে পারে এ লোক।

'যাও, মা, সুলতা। তোমরা গল্প-গুজব করোগে। আমি একবার থানা থেকে ঘুরে আসি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল সুলতা। হলরুমের দিকে পা বাড়াল সে। আকরম সানন্দে অনুসরণ করল সুলতাকে। পিছন থেকে নিজের ছেলে এবং সুলতার দিকে

তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল আজমল রব্বানী।

সি. আই. ডি. ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেনডেন্ট মি. সিম্পসন তাঁর চেম্বারে আলাপ করছিলেন দেশের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কামালের সাথে। এমন সময় ফোন এল থানা থেকে।

মি. সিম্পসনের বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী থানা কর্তৃপক্ষ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কেস সম্পর্কে তাঁকে অবহিত রাখে ইদানীং। থানায় কোন কেস এলেই মি. সিম্পসনকে ফোনে তা জানানো হয়। ফোনে কথা শেষ করে মি. সিম্পসন বললেন, 'এর আগে দু'জনের নিখোঁজ সংবাদ পেয়েছি। এখন আবার কোটিপতি ব্যবসায়ী মি. কুচবিহারীকে পাওয়া যাচ্ছে না, খবর পেলাম। কি যে শুরু হলো দেশটায়! নিজেই একবার যাই, দেখি দুটো ঘটনার সাথে কোন সম্পর্ক আছে কিনা। যাবে নাকি হে?'

'আমি?'

'হ্যাঁ। চলো না। কাজ আছে নাকি?'

'না, কাজ নেই। তবে গেলেই তো ফেঁসে যাব। সাহায্য করতে বলবেন।'

হেসে ফেললেন মি. সিম্পসন, 'আমাকে সাহায্য করতে চাও বলেই সময় বিশেষে তোমাদের সাহায্য চাই। কই, আর কারও কাছ থেকে তো চাই না? শহীদ আর তুমি ছাড়া কি আর কেউ নেই বাংলাদেশে? আছে। কিন্তু তোমাদের উপর আমার আস্থা আছে…।'

কামাল বলল, 'বেশ চলুন। তবে একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত আবার?'

কামাল বলল, 'জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ যা করবার আমিই করব।'

'তার মানে প্রথম থেকেই কেসটা নিজের হাতে তুলে নিতে চাও?'

কামাল বলল, 'হ্যাঁ। কারণ আমি বুঝতে পারছি এ কেসটা জটিল হতে বাধ্য। কোটিপতিরা হঠাৎ নিখোঁজ হয় না। যখন হয় তখন তার পিছনে অনেক রহস্য অনেক জটিলতা থাকে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'বেশ তো। তাই হবে। চলো।' উঠে দাঁড়াল ওরা।

সুলতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় কামাল বুঝতে পারল মেয়েটা সব কথা খুলে বলছে না। তার বলার এমন কোন একটা বিষয় আছে যা বলতে চায় সে। অথচ দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বলে ফেলতে পারছে না।

আজমল রব্বানী এবং আকরমের দিকে তাকিয়ে কামাল বলল, 'আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে পাশের কামরায় গিয়ে বসতে অনুরোধ করি।'

আজমল রব্বানী সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল বটে কিন্তু চোখে-মুখে অসন্তোষ ফুটে উঠল। সে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেও তার ছেলে আকরম যেমন ভুরু কুঁচকে বসে ছিল তেমনি বসেই রইল সোফায়। মি. সিম্পসন তার দিকে প্রশ্নবোধক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

কামাল রীতিমত বিরক্ত বোধ করছে। ছোকরা তার কথা শুনতে পায়নি নাকি?

আকরম তাকিয়ে আছে সুলতার দিকে।

খুক করে কাশল কামাল।

কিন্তু আকরম সুলতার মুখের দিক থেকে চোখ সরাল না। সুলতা অস্বস্তি বোধ করছে বোঝা গেল।

কামাল চুপ করে থাকতে পারল না আর, 'আপনাকেও আমি পাশের কামরায় যেতে বলেছি, মি. আকরম।'

কামালের দিকে তাকাল আকরম। রীতিমত বিরক্ত হয়েছে সে বোঝা গেল। বলল, 'দেখুন, আপনি ভুল করছেন। সুলতাকে আপনি আমার সামনেই যে-কোন প্রশ্ন করতে পারেন। ওর সাথে আমার অন্য রকম সম্পর্ক।'

কামালের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'অন্য রকম সম্পর্ক মানে?'

আকরম তাকাল সুলতার দিকে। সুলতা অস্বস্তি বোধ করছে। বেশ বিরক্ত হয়েছে সে। কিন্তু আকরম সুলতার বিরক্তির তোয়াক্কা না করে সগর্বে বলল, 'সুলতা আমার ভাবী-স্ত্রী। ওর সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে আছে…।'

'আকরম! এসব কি বলছ তুমি?' বিস্মিত গলায় বলে উঠল সুলতা।

কামাল একবার সুলতা একবার আকরমের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'মি. আকরম, আপনাদের মধ্যে ভবিষ্যতে কি সম্পর্ক হবে সে ব্যাপারে আমি আগ্রহী নই। আপনাকে একবার পাশের কামরায় যেতে হবে।'

বিরক্ত আকরম উঠে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

সুলতা পরিবেশটা স্বাভাবিক করার জন্যে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'ওদেরকে সরিয়ে দিলেন কেন বলুন তো? কি জিজ্ঞেস করবেন আমাকে?'

কামাল বলল, 'জিজ্ঞেস কিছু করব না। আমার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে যে আপনি আমাদেরকে একটা কথা বলতে চান, অথচ বলতে পারছেন না।'

সুলতা তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। খানিকক্ষণ পর সে একটু হাসল। বলল, 'আপনার অনুমান শক্তি অসাধারণ। সত্যি, একটা কথা বলব কি বলব না ভেবে পাচ্ছি না।'

'কোনও কথা চেপে রাখা উচিত নয়,' বললেন মি. সিম্পসন।

সুলতা বলল, 'কথাটা বলার আগে ছোট একটা ভূমিকা করে নিতে হয়। ডাক্তার মিজান চৌধুরী আমার বাবার বন্ধু…।'

কামাল বলল, 'তাই নাকি! আচ্ছা সুলতা দেবী, আপনি নিশ্চয়ই জানেন মি. মিজান চৌধুরী এবং তাঁর একমাত্র ছেলে মি. উজান চৌধুরীও গত রাতে বাড়ি ফিরে যাননি। মিসেস মিজান চৌধুরী আজ সকালে থানায় খবর দিয়েছেন।'

সুলতা বলল, 'জানি। ডা. মিজান চৌধুরীর ছেলে উজান চৌধুরীর সাথে আমার পরিচয় আছে। শুধু যে পরিচয়ই আছে তা নয়, ওর সাথে…!' ঠিক কিভাবে কথাটা বলবে ভেবে পেল না সুলতা।

মি. সিম্পসন হেসে ফেললেন। বললেন, 'বুঝেছি! লজ্জা কি, মিস সুলতা। বলে যান।'

সুলতা মৃদু হেসে বলল, 'গতকাল দুপুরে ওকে ফোন করেছিলাম। বলেছিলাম, আমাদের বাড়িতে এসো। এর আগেও ও এসেছে আমাদের বাড়িতে। কিন্তু গোপনে। বাবা জানতেন না। বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে আসত ও। গতকালও চুপি চুপি এই পথ দিয়ে ওকে আসতে বলেছিলাম।'

'এসেছিলেন তিনি?'

সুলতা বলল, 'এসেছিলেন। ওপরের রুম থেকে ওকে আমি বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেখি।'

চুপ করে রইল এরপর সুলতা।

কামাল বলল, 'তারপর?'

সুলতা ম্লান মুখে বলল, 'তারপর ওকে আর দেখিনি। ওপরে ওঠেনি ও। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বাবার হাতে ধরা পড়ে গেছে উজান। কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এভাবে অনেক সময় কেটে যায়। বিশ-পঁচিশ মিনিট পর বাড়ির সামনের গেট দিয়ে উজানের বাবাকে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেখি আমি। আরও বেশি ভয় পেয়ে যাই। এর পাঁচ-সাত মিনিট পরই আমার বাবা এবং উজানের বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ওঁরা চলে যাবার পর নিচে নেমে আমাদের বাড়ির দারোয়ান হনুমানজীকে জিজ্ঞেস করতে সে জানায় গাড়ি করে আমার বাবা এবং উজানের বাবা বাইরে গেছেন। উজানকে গাড়িতে উঠতে দেখেনি সে। এমনকি বাড়িতেও দেখেনি সে তাকে।'

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সুলতা আবার বলল, 'ব্যাপারটা বড় রহস্যময় ঠেকছে আমার কাছে। বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ঢুকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে সোজা আমার রুমে ঢোকার কথা উজানের। অথচ ওপরে ওঠেইনি সে। বাবার হাতে ধরা পড়লেও হনুমানজী জানতে পারত। বাবা নিশ্চয়ই তাকে জেরা করতেন। অন্তত উজানের গলা শুনতে পেত হনুমানজী।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হয়তো আপনার বাবা মি. উজানকে তিরস্কার করেছিলেন। হয়তো অপমানিত হয়ে তিনি সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। আপনি দেখেননি...।'

'তাই যদি হয় তাহলে উজানকে ফোন করে পাইনি কেন? বাড়ি ফিরে যায়নি কেন সে?'

কামাল বলল, 'ঠিক। অপমানিত হয়ে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল কোথায় সে? আপনার কি ধারণা, মিস সুলতা? মি. উজান কি আদৌ এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন?'

'তার মানে?' সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুলতা।

আর একটু পরিষ্কার করে বলল কামাল, 'বাড়িটা একবার ভাল করে সার্চ করা

দরকার।'

সুলতা ম্লান গলায় জানাল, 'সব জায়গায় খোঁজ করেছি আমি। সন্দেহটা আমার মনেও জেগেছিল। বাবা এমনিতে শান্তশিষ্ট মানুষ। কিন্তু রেগে গেলে অন্ধ হয়ে যান তিনি।'

ড্রয়িংরুমে বসে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ বেজে উঠল ফোনটা। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিল কামাল।

থানা থেকে ফোন এসেছে। কথা শেষ করে মি. সিম্পসনের দিকে ফিরে কামাল বলল, 'রমনা পার্কের ভিতর একটা লাশ পাওয়া গেছে। থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বস্তায় ভরা অবস্থায় পাওয়া গেছে লাশটা। ক্ষতবিক্ষত, চেনবার কোন উপায় নেই।'

'বাবা!' চাপা গলায় উচ্চারণ করেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুলতা।

কামাল বলল, 'মুষড়ে পড়বেন না, মিস সুলতা। না দেখে আগেই ধরে নেবেন না লাশটা আপনার বাবার। যে-কোন লোকের লাশ হতে পারে। উজান চৌধুরী বা তার ছেলেও নিখোঁজ এখন অবধি, কথাটা ভুলবেন না।'

মি. সিম্পসন উঠে দাঁড়ালেন।

পাশের কামরা থেকে এসে হাজির হলো আজমল রব্বানী। 'আপনাদের কথা কি শেষ হয়েছে, মি. কামাল আহমেদ?'

কামাল বলল, 'হয়েছে। তবে আপনাকে এবং সুলতাকে একবার যেতে হবে থানায়। একটা লাশ পাওয়া গেছে।'

'সেকি!' সুলতা কাঁদছে।

এমন সময় শরীফ চাকলাদার প্রবেশ করল ড্রয়িংরুমে, 'কুচবিহারীজীর এখনও কোন খবর পাওয়া যায়নি নাকি?'

মি. সিম্পসন এবং কামাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল। আজমল রব্বানী শরীফ চাকলাদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনিও আমাদের একজন বন্ধু।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মিস সুলতা, উঠুন।'

আজমল রব্বানী বলে উঠল, 'সুলতা আবার থানায় যাবে কেন? আমরাই তো...।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'না। ওকেও যেতে হবে। কামাল, চলো।'

আজমল রব্বানী আর কথা বাড়াল না।

থানায় এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হলো।

লাশটা যে কুচবিহারীর তা চেনবার কোন উপায় নেই। খুনীর প্রাণে যে দয়ামায়ার ছিটে ফোঁটাও নেই একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়। লাশের চোখ, নাক, ঠোঁট, গাল, কপাল, চিবুক, ভুরু কিছুই চেনবার উপায় নেই। ছোরা দিয়ে হাজারবার ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে মুখটা। কিন্তু লাশটা যে কুচবিহারীর তাতে কারও সন্দেহ রইল না। লাশটা দেখেই বাবা বলে আর্তচিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারাল সুলতা। জ্ঞান ফিরল দশ-পনেরো মিনিট পর। লাশটা সে চিনতে পেরেছে। এ তার

বাবারই লাশ।

আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদারও একবাক্যে জানাল এ লাশ তাদের বন্ধু কুচবিহারীরই। তার পরনের কাপড় চেনা গেল। চেনা গেল পায়ের জুতো। লাশের কব্জিতে ঘড়ি এবং আঙুলে আংটিও নিঃসন্দেহে কুচবিহারীর।

ময়না তদন্তের জন্যে লাশকাটা ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হলো লাশ। সুলতাকে নিয়ে বিদায় নিল আজমল রব্বানী এবং শরীফ চাকলাদার। বেলা এগারোটা বাজে তখন। তখনও মিজান চৌধুরী এবং তার ছেলে উজানের কোন সন্ধান করতে পারেনি পুলিস।

ওরা বিদায় নিয়ে চলে যেতে মি. সিম্পসন বললেন, 'কি রকম বুঝছ, কামাল?'

'কেসটা প্রথমে যত সহজ বলে মনে করেছিলাম তত সহজ নয়। আজমল রব্বানী আর তার ছেলে আকরমকে বেশ জটিল চরিত্রের লোক বলেই মনে হলো। ভাবছি, শহীদের সাথে দেখা করব একবার। ওকে ছাড়া চলবে না।'

এদিকে সুলতাদের বাড়িতে এসে আজমল রব্বানী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন সুলতাকে। সুলতা তার কামরায় উঠে এসেছে। বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে সে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আজমল রব্বানী।

রুমের ভিতর দুটো চেয়ারে বসে আছে শরীফ চাকলাদার এবং আকরম। আকরমকে অস্বাভাবিক চিন্তিত দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝেই গভীর চিন্তায় ডুবে যাচ্ছে সে।

আজমল রব্বানী সুলতাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'কেঁদো না, মা। দুনিয়ায় কেউ চিরকাল বেঁচে থাকে না। কারও মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়, কারও হয় অস্বাভাবিক ভাবে। তোমার বাবাকে কেউ খুন করেছে। কিন্তু তাই বলে একথা ভেবো না যে খুনীকে আমরা ছেড়ে দেব। আমরা বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না। খুনী ধরা পড়বেই, মা। ধরাও পড়বে, তার উপযুক্ত শাস্তিও হবে। তবে তাতে লাভ-ক্ষতি কোনটাই নেই, যিনি গেলেন তিনি কি আর ফিরে আসবেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আজমল রব্বানী। তারপর নতুন করে বলতে লাগল, 'যা ঘটে গেছে তা নিয়ে হা-হুতাশ করলে চলে না, মা। শক্ত হও। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করো। তোমার বাবার বয়স হয়েছিল, দু'দিন আগে বা পরে তাঁকে যেতেই হত। কিন্তু তোমার সামনে পড়ে রয়েছে গোটা জীবনটাই। তোমার কি হবে সেটাই এখন চিন্তার কথা। তবে সে চিন্তা আমার, তোমার নয়, মা। তোমার ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব এখন আমার কাঁধেই পড়েছে। ভেবেছিলাম তোমার সাথে আকরমের বিয়েটা সেরে ফেলব আগামী মাসেই—কিন্তু কে জানত এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাবে। যাকগে, শুভ কাজ সুদিনেই হবে। সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। মাস চার-পাঁচ কাটুক, তোমাদের দুজনকে ঘর-সংসার গড়ে দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হব। আমারও তো সময় হলো...।'

সুলতাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হলেও তার কানে আজমল রব্বানীর একটা

কথাও ঢুকছে না। বাবার শোকে পাগলিনী সে।

কিন্তু বাবার কথাগুলো শুনতে বড় ভাল লাগছে আকরমের। মিটিমিটি হাসছে সে আপন মনে। সে অবশ্য মাঝে-মধ্যে এখনও কি যেন গভীর ভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করছে। দুপুরের দিকে সুলতা একটু শান্ত হলো। আজমল রব্বানী প্রস্তাব দিল সুলতাকে তাদের বাড়িতে গিয়ে থাকার জন্যে। সুলতা রাজি হলো না। সংক্ষেপে সে জানাল, 'বাড়ি ছেড়ে এখন অন্য কোথাও থাকতে পারব না আমি, কাকা।'

আজমল রব্বানী বলল, 'তা ঠিকই বলেছ, মা। তবে তাই থাকো। কিন্তু তোমাকে একা ফেলে রেখে যাই বা কি করে। আকরমকে রেখে যাচ্ছি। ও তোমার দেখাশোনা করবে।'

সে ব্যবস্থাই হলো। সুলতা অবশ্য আপত্তি তুলেছিল মৃদু। কিন্তু তার আপত্তি কানে তোলেনি ওরা। আকরম খুব খুশিই হলো।

ফেরার পথে গাড়িতে আলাপ হলো। শরীফ চাকলাদার এই প্রথম মুখ খুলল অনেকক্ষণ পর, 'নওশেরের এই কাণ্ডের কারণ বোঝা যাচ্ছে না।'

'কিসের কারণ বোঝা যাচ্ছে না? তার কথা সে রেখেছে। খুন হয়নি কুচবিহারী?' আজমল রব্বানী বলল কথাটা।

শরীফ চাকলাদার বলল, 'আমি সে কথা বলিনি। কুচবিহারীর লাশ তো নিজেদের চোখেই দেখলাম। কথা রেখেছে নওশের। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। কুচবিহারীর মুখের চেহারা অমন বিকৃত করার কারণ কি তার?'

আজমল রব্বানী বিরক্তির সাথে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কি কারণ? এর পিছনে কারণের খোঁজ করার কোন মানে হয়? সবাই কি এক রকম, সবাই কি একই পদ্ধতিতে খুন করে? হয়তো নওশের খুন করার পর লাশের মুখ বিকৃত করে মজা পায়...'

শরীফ চাকলাদার বাধা দিয়ে বলল, 'আরও একটা ব্যাপার আছে।'

'কি?'

'গতকাল রাতের প্রথম দিকে বা বিকেলে খুন হয়েছে কুচবিহারী। পুলিসের তাই ধারণা। অথচ নওশের আমাদের সাথে এখনও দেখা করছে না কেন? কি করছে সে? গতরাতেই কি দেখা করা উচিত ছিল না তার আমাদের সাথে? টাকার কথা কি সে ভুলে গেছে? আড়াই লাখ টাকা পাবে সে আমাদের কাছ থেকে।'

'হুঁ। খুব চিন্তার কথাই দেখছি। তা আপনার কি ধারণা, নওশেরের দেখা না করার কারণ কি হতে পারে?'

শরীফ চাকলাদার চিন্তিত ভাবে বলল, 'কারণটা বুঝতে পারছি না বলেই তো ভাল ঠেকছে না ব্যাপারটা। কেন যেন মনে হচ্ছে, আমাদের সামনেও ওত পেতে আছে ভয়ঙ্কর বিপদ। রব্বানী সাহেব, খুব সাবধানে থাকবেন।'

কথাগুলো বলে আপন মনে হাসল শরীফ চাকলাদার। বড় রহস্যময় সে হাসি। আজমল রব্বানী চিন্তিত মনে গাড়ি চালাচ্ছিল সামনের দিকে তাকিয়ে। তাই হাসিটা দেখতে পেল না সে।

ভলিউম-১৪

কুয়াশা

৪০-৪১-৪২

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে-বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট-বড় সবাই এ বই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০